ক্যারেন আর্মস্ট্রং

ইসলাম

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ। শওকত হোসেন

আধুনিক বিশ্বে ইসলামের মত আর কোনও ধর্মকেই এত ভয় করা হয়নি, হয়নি ভুল বোঝাও। স্বৈরাচারী সরকার, নারী নির্যাতন, গৃহযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসকে উস্কানী দানকারী চরম এক ধর্ম বিশ্বাস হিসাবে পাশ্চাত্যের প্রচলিত ধারনাকেই আঁকড়ে থাকে তা। ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর ইসলাম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ববহ সংশোধন তুলে ধরেছে। ইসলাম সম্পর্কিত বহু বছরের ভাবনা ও লেখালেখির ফল দেখিয়ে দেয় যে আধুনিক মৌলবাদী ধারা যাই বোঝাক না কেন, বিশ্বের দ্রুত বিকাশমান এই ধর্মটি সত্যিই আরও বেশি সমৃদ্ধ এবং জটিল একটি ব্যাপার।

ইসলাম: আ শর্ট হিস্ট্রি (ইসলাম: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) শুরু হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে মদীনা হতে মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরিবারের অভিযাত্রা এবং পরবর্তী সময়ে প্রথম মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গ দিয়ে। শিয়া ও সুন্নী মুসলিমদের বিভেদের মূল; সুফি অতীন্দ্রিয়বাদের আবির্ভাব; উত্তর আফ্রিকা, লেভেন্টে এবং এশিয়ায় ইসলামের বিস্তার; মুসলিম বিশ্বের ওপর ক্রুসেডসমূহের বিধ্বংসী প্রভাব, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বিশ্বের বৃহৎ ও অনন্যসাধারণ শক্তি হিসাবে রাজকীয় ইসলামের বিকাশ এবং বিপ্লবী ইসলামের উদ্ভব ও প্রভাব তুলে ধরেছে এটি, শেষ হয়েছে বর্তমানকালের ইসলাম এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহের মূল্যায়নের মাধ্যমে।

যাঁরা মনে করেন যে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সংঘাতের দিকে ধাবিত দুটি সভ্যতা, এই অসাধারণ গ্রন্থের মাধ্যমে ক্যারেন আর্মস্ট্রং তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। ইসলাম কর্তৃত্ব, মহত্ব এবং অর্থনীতিরও একটি আদর্শ।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং : রোমান ক্যাথলিক হিসাবে সাত বছর অতিবাহিত করার পর ১৯৬৯ সালে বৃত্তি ত্যাগ করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হতে আরবীতে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং এক সরকারি বালিকা স্কুলে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি ফ্রিল্যান্স লেখক ও ব্রডকাস্টারে পরিণত হন। দীর্ঘদিন থেকেই যুক্তরাজ্যে ধর্মীয় বিষয়ে অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার তিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই মর্যাদা অর্জনের পথে। বর্তমানে তিনি লিও বায়েক কলেজে জুডাইজম বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন এবং রাব্বী ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সোস্যাল সায়েন্স-এরও সম্মানিত সদস্য। ১৯৯৯ সালে তিনি 'মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স' কাউন্সিল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে : থ্রু দ্য ন্যারো গেইট (১৯৮১), বিগিনিং দ্য ওআর্ল্ড (১৯৮৩), দ্য গসপেল অ্যাকর্ডিং টু উওম্যান (১৯৮৭), হলি ওআর : দ্য ক্রুসেডস্ অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন টুডে'স ওআর্ল্ড (১৯৯১), দ্য ইংলিশ মিস্টিকস্ অব দ্য ফোরটিন্থ সেঞ্চুরি (১৯৯১), আ হিস্ট্রি অব গড : দ্য ফোর থাউজ্যান্ড ইয়ার কোয়েস্ট অব জুডাইজম, ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড ইসলাম (১৯৯৩), জেরুজালেম : ওআন সিটি, থ্রি ফেইথস্ (১৯৯৬), ইন দ্য বিগিনিং : আ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অব জেনেসিস (১৯৯৬), মুহাম্মদ : মহানবীর জীবনী (২০০১), বুদ্ধা (২০০০), দ্য ব্যাটল ফর গড : আ হিস্ট্রি অব ফান্ডামেন্টালিজম (২০০০)।

অনুবাদক **শওকত হোসেন**-এর আদি নিবাস চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুর গ্রামে। বাবার বিচার বিভাগীয় চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। বই পড়ার নেশা পেয়েছেন বইপ্রেমী মায়ের কল্যাণে। বলা যায় আকস্মিকভাবেই রানওয়ে জিরো এইট-এর মাধ্যমে লেখালেখি শুরু। প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টারস করেছেন শওকত হোসেন, বর্তমানে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে কর্মরত।

ISLAM : A SHORT HISTORY

KAREN ARMSTRONG

ISBN-984-8088-70-9

ইসলাম: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ক্যারেন আর্মস্ট্রং
অনুবাদ: শওকত হোসেন

Islam: A Short History by Karen Armstrong
A Weidenfeld & Nicolson Book
Copyright © Karen Armstrong, 2000
Translated by Saokat Hossain

অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০০৪

প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৪

প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ : **সোহেল কম্পিউটার** ৫৬ বড় মগবাজার (কাজী হাউস), ঢাকা-১২১৭
কামাল প্রিন্টিং প্রেস : ১৫২ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : **বুক ক্লাব** ৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ ।

Website: www.sandeshgroup.com

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনও অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৭৫.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

নাভীন তাহ্‌রাত আলী
আদিয়াত আহমেদ
সুমাইয়া তাহ্‌সিন আলী
জিয়াদ আহমেদ
ফাইরুজ রাইদাহ্‌
আয়েশা তাসনিম আলী
উসায়েদ আহমেদ
উযায়ের রাজিন
আগামী প্রজন্ম

অনুবাদকের কথা

বিশ্বের নবীন এবং আধুনিকতম একেশ্বরবাদী ধর্ম ইসলামকে নিয়ে ক্যারেন আর্মস্ট্রং লিখেছেন *ইসলাম: আ শর্ট হিস্ট্রি* গ্রন্থটি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক এ গ্রন্থের মাধ্যমে। পয়গম্বর মুহাম্মদের (স:) মাধ্যমে প্রবর্তনের পর থেকে শুরু করে *রাশিদুনদের* আমল, একাধিক *ফিৎনাহ্‌র* বিবরণ, ইসলামে খেলাফতের নামে রাজতন্ত্রের আবির্ভাব, ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার, বিভাজন, পতন এবং তার পেছনে ক্রিয়াশীল কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন ক্যারেন আর্মস্ট্রং। বিভিন্ন সময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিলুপ্তির উপান্তে পৌঁছেও ইসলাম ধর্ম কোন বৈশিষ্ট্য বা সুপ্ত শক্তির কারণে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে বারবার তাও দেখিয়েছেন লেখক। দেখিয়েছেন কখনও ইসলামের নামে আবার কখনও আধুনিকতা আর সেক্যুলারিজমের দোহাই দিয়ে মুসলিম শাসকরা কীভাবে ইসলামের মৌল নীতি অর্থাৎ সমতার মূল্যবোধের লংঘন করেছেন, নির্যাতন চালানোর মাধ্যমে রুদ্ধ করেছেন ভিন্নমত। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতায় ইসলামকে কেন আপাতদৃষ্টিতে পশ্চাদবর্তী বলে মনে হচ্ছে বোঝার প্রয়াসে লেখক ব্যাখ্যা খাড়া করেছেন, সেই সঙ্গে তুলে ধরেছেন আগামীর উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে, যা ভাবনার খোরাক জোগায়, আশাবাদী করে তোলে। ইসলামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলন ও অতীন্দ্রিয়বাদী মতবাদ তুলে ধরে দেখিয়েছেন ধর্মটির অন্তর্নিহিত শক্তিকে। এ-বইটি পাঠ করে একজন সাধারণ আগ্রহী পাঠক যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি এখানে সন্নিবেশিত তথ্য দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষার্থীদেরও প্রয়োজন মেটাবে বলে বিশ্বাস করি।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ২০০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হবার পর বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ২০০২ সালেই দ্বিতীয় সংস্করণ বাজারে আসে। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেপ্টেম্বর ১১-এর সন্ত্রাসী হামলা বিশ্বে ইসলামকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সূচনা ঘটায়। দ্বিতীয় সংস্করণে ক্যারেন আর্মস্ট্রং একটি উপসংহার যোগ করে সেই হামলার প্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে মতামত রেখেছেন। পাঠকদের কথা চিন্তা করে 'উপসংহার'টি এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

মূলগ্রন্থে লেখক কুরানের বেশ কিছু আয়াত ব্যবহার করেছেন, অনুবাদের সুবিধা ও নির্ভুলতার স্বার্থে আমি শ্রদ্ধেয় সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কোরান শরীফ: সরল বঙ্গানুবাদ'-হতে উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেজন্যে জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

পাঠকগণ পয়গম্বর ও অন্য নবী-রাসুলগণের নামের পর যথাস্থানে (স:) (আ:) ইত্যাদি না থাকলেও পাঠ করবেন, এই অনুরোধ রইল।

পাঠকবৃন্দ যদি কোনও তথ্যগত ভুল খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বইটি পাঠকের এতটুকু প্রয়োজন মেটাতে পারলে অনুবাদক হিসাবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

ধন্যবাদ।

শওকত হোসেন
মালিবাগ, ঢাকা

এপ্রিল ২০০৪

সূচিপত্র

মানচিত্র সূচি # ১১
ভূমিকা # ১৩
ঘটনাক্রমপঞ্জী # ১৬

১. সূচনা

পয়গম্বর (৫৭০-৬৩২) # ৩৭
রাশিদুন (৬৩২-৬৬১) # ৫৪
প্রথম *ফিৎনাহ্* # ৬৩

২. বিকাশ

উমাঈয়াহ্ ও দ্বিতীয় *ফিৎনাহ্* # ৬৯
ধর্মীয় আন্দোলন # ৭৩
উমাঈয়াহ্দের শেষ বছরগুলো (৭০৫-৭৫০) # ৭৭
আব্বাসীয়যুগ: খেলাফতের সুবর্ণসময় (৭৫০-৯৩৫) # ৮১
গোপন ধর্মীয় আন্দোলন # ৯১

৩. তুঙ্গ অবস্থা

এক নতুন ব্যবস্থা (৯৩৫-১২৫৮) # ১০৩
ক্রুসেডসমূহ # ১১৪
সম্প্রসারণ # ১১৭
মঙ্গোল (১২২০-১৫০০) # ১১৯

৪. বিজয়ী ইসলাম

রাজকীয় ইসলাম (১৫০০-১৭০০) # ১৩৩
সাফাভীয় সাম্রাজ্য # ১৩৫
মোঘুল সাম্রাজ্য # ১৪১
অটোমান সাম্রাজ্য # ১৪৭

৫. প্রতিরুদ্ধ ইসলাম

পশ্চিমের আবির্ভাব (১৭৫০-২০০০) # ১৫৭
আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র কী? # ১৭০
মৌলবাদ # ১৭৭
সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলিম # ১৮৭
আগামীর সম্ভাবনা # ১৯০

পরিশিষ্ট

উপসংহার # ১৯৮
ইসলামের ইতিহাসে প্রধান ব্যক্তিবর্গ # ২০১
আরবী শব্দার্থ # ২১১
তথ্যসূত্র # ২১৫

মানচিত্র সূচি

মুহাম্মদের (স:) জগৎ: আরব ৬১০ খৃস্টাব্দ # ৪২
প্রাথমিক বিজয় # ৫৮
উমাঈয়াহ্‌দের অধীনে সম্প্রসারণ # ৭৮
আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিভাজন # ১০৪
সেলজুক সাম্রাজ্য # ১০৮
প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও আনাতোলিয়ায় ক্রুসেডার রাজ্যসমূহ ১১৩০ # ১১৪
মঙ্গোল বিশ্ব (হুলেগুর শাসনামল, ১২৫৫-৬৫) # ১২০
সাফাভীয় সাম্রাজ্য (১৫০০-১৭২২) # ১৩৬
মোঘুল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৭০৭) # ১৪২
অটোমান সাম্রাজ্য # ১৪৮

ভূমিকা

কোনও ধর্মীয় ঐতিহ্যের বাহ্যিক ইতিহাসকে যেন প্রায়শ:ই বিশ্বাসের মৌল উদ্দেশ্য হতে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান হচ্ছে অন্তরমূখী যাত্রা, এটা যত না রাজনৈতিক তারচেয়ে বেশী বরং মনস্তাত্ত্বিক নাটক। শাস্ত্র, মতবাদ, ধ্যানভিত্তিক অনুশীলন আর হৃদয় অনুসন্ধান এর বিচরণ ক্ষেত্র, চলমান ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বিরোধ নয়। আত্মার বাইরেও অবশ্যই ধর্মসমূহের অস্তিত্ব রয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয় এবং প্রায়শ এ কাজ তাঁরা উপভোগ করেন। তাঁরা পরম সত্যের একচেটিয়া অধিকারে চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার কথা ভেবে অন্য ধর্মবিশ্বাসসমূহের সদস্যদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হন; তাঁরা আবার কোনও বিশেষ ঐতিহ্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ায় বা হেটারোডক্স বিশ্বাস পোষণ করার কারণে সধর্মীদের উপরও চালান নিপীড়ন। প্রায়শই প্রিস্ট, র‍্যাবাই, ইমাম এবং শামানদের সাধারণ রাজনীতিকদের মত পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে দেখা যায়। কিন্তু এসব কিছুকেই সাধারণভাবে পবিত্র কোনও আদর্শের অপব্যবহার হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ক্ষমতার এসব দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়, বরং আত্মার জীবন হতে অশ্লীল বিচ্যুতি, যে জীবন উন্মত্ত জনতার ভীড় থেকে বহুদূর হতে নীরবে অদৃশ্যভাবে হস্তক্ষেপহীন পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষেই বহু ধর্মবিশ্বাসের মঙ্ক আর অতীন্দ্রিয়বাদীগণ জগৎ হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়, কারণ ইতিহাসের হট্টগোল আর সংঘাত প্রকৃত ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে মানানসই নয় বলেই মনে করা হয়।

হিন্দু ঐতিহ্যে ইতিহাসকে অপসৃয়মান, গুরুত্বহীন ও অসার বলে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকগণ বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্গত চিরন্তন বিধি-বিধান নিয়ে ভাবিত ছিলেন, সক্রিয় চিন্তাশীল ব্যক্তির যার প্রতি আগ্রহ থাকার কথা নয়। গসপেলসমূহে জেসাস প্রায়ই রীতির বাইরে গিয়ে অনুসারীদের বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন যে তাঁর রাজত্ব এ জগতের নয়, বরং কেবল বিশ্বাসীর অন্তরেই তার দেখা পাওয়া সম্ভব। এই রাজত্ব ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোল তুলে আবির্ভূত হবার নয়, বরং নীরবে অলক্ষ্যে সর্ষে বীজের অঙ্কুরোদগমের মত বিকশিত হবে। আধুনিক পাশ্চাত্যে আমরা ধর্মকে রাজনীতি হতে পৃথক করার ব্যবস্থা নিয়েছি, এই সেক্যুলারাইজেশনের আদি প্রবক্তা ছিলেন আলোকনযুগের (Enlightenment)

'ফিলোসফেস' (*Philosophes*) গণ। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর দুর্নীতি হতে ধর্মকে রক্ষা করার একটা কৌশল ছিল সেটা, ধর্মকে আরও নির্মল করে তোলারও প্রয়াস ছিল।

কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যত আধ্যাত্মিক হয়ে থাকুক না কেন, ধর্মীয় ব্যক্তিদের এই পার্থিব জগতেই ঈশ্বর বা পবিত্রের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে হয়। প্রায়ই তাঁরা মনে করেন আপন আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার একটা দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের। যদিও নিজেদের তাঁরা বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, তবু ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁরা তাঁদের সময়েরই নারী এবং পুরুষ; এবং মনেস্টারির বাইরের ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের প্রভাবিত করে, যদিও সেটা তাঁরা পরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন না। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক মন্দাভাব এবং তাঁদের জাতীয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তাঁদের বিচ্ছিন্ন জীবনে হানা দেবে এবং ধর্মীয় দর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রকৃতপক্ষেই ইতিহাসের করুণ ঘটনাবলী প্রায়শই মানুষকে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে বাধ্য করে থাকে; দৈব, খেয়ালি আর হতাশাব্যঞ্জক ঘটনাপ্রবাহের পুনরাবৃত্তি বলে প্রতিভাত বিষয়াবলীর একটা পরম অর্থ অনুসন্ধানই থাকে তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং ইতিহাস ও ধর্মের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বুদ্ধ যেমন মন্তব্য করেছেন, অস্তিত্বের প্রকৃতি জটিল বলে আমাদের বিশ্বাসই আমাদেরকে একটা বিকল্প সন্ধানে বাধ্য করে যা আমাদের হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

ধর্মীয় জীবনের মৌলিক প্যারাডকস সম্ভবত এই যে, এটা আমাদের জাগতিক জীবনের অতীত অস্তিত্বের এক মহা দুর্জ্ঞেয়ের সন্ধান করে, কিন্তু মানব জীবন এই দুর্জ্ঞেয় সত্তাকে কেবল পার্থিব বাস্তব ঘটনার মাঝেই অনুভব করতে সক্ষম। মানুষ পাথর, পাহাড়, মন্দির-ভবন, বিধি-বিধান, লিখিত বিবরণ কিংবা ভিন্ন নারী আর পুরুষের মাঝে ঐশ্বরিক অনুভূতি লাভ করেছে। আমরা কখনওই প্রত্যক্ষভাবে দুর্জ্ঞেয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি; আমাদের পরম আনন্দ সবসময়ই "জাগতিক," মর্ত্যেরই কোনও ব্যক্তিতে বা কোনও বস্তুতে আসীন। ধর্মীয় ব্যক্তিগণের পবিত্রকে দেখার জন্য সম্ভাবনাহীন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে লিপ্ত হবার যোগ্যতা থাকে। তাঁদের নিজস্ব সৃজনশীল কল্পনাশক্তির প্রয়োগ ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে। জাঁ পল-সার্ত্রে কল্পনাশক্তিকে অস্তিত্ব নেই এমন কিছুর চিন্তা করার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। মানবজাতি ধর্মীয় প্রাণী, কারণ তারা কল্পনানির্ভর; তাদের গঠন এমন যে তারা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আর একধরনের আনন্দ অনুসন্ধানে বাধ্য হয় যা কিনা তাদের মাঝে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার অনুভূতি জাগায়। প্রত্যেক ঐতিহ্য বিশ্বাসীদের পার্থিব এমন কোনও প্রতীকের প্রতি মনোযোগ স্থাপন করার উৎসাহ জোগায় যা কেবল বিশেষভাবে এর নিজস্ব, এবং যা তাদের ঐ প্রতীকের মাঝেই ঈশ্বরকে দেখার শিক্ষা দেয়।

ইসলাম ধর্মে মুসলিমরা ইতিহাসে ঈশ্বরের সন্ধান করেছে। তাদের পবিত্র ঐশীগ্রন্থ, কুরান, তাদের এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব দিয়েছে। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল একটা ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করা যেখানে এর সকল সদস্য, এমনকি

সবচেয়ে দুর্বল এবং নাজুকজনটিও, সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী হবে। এমন এক সমাজ নির্মাণের অভিজ্ঞতা এবং সেই সমাজে বসবাস তাদের ঈশ্বরের অনুভূতি যোগাবে, কারণ সেক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করবে। একজন মুসলিমকে ইতিহাসের দায় মুক্তি ঘটাতে হয় এর অর্থ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী আধ্যাত্মিকতা হতে বিচ্যুত তো নয়ই বরং খোদ ধর্মেরই বিষয়। মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক কল্যাণের অপরীসীম গুরুত্ব ছিল। যেকোনও ধর্মীয় আদর্শের মত ইতিহাসের নানা বিচ্যুতি আর করুণ প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন ছিল প্রায় দুরূহ, কিন্তু প্রতিটি ব্যর্থতার পরেই মুসলিমদের আবার উঠে দাঁড়িয়ে নতুন প্রয়াসে লিপ্ত হতে হয়েছে।

মুসলিমরা অন্যদের মত করেই তাদের নিজস্ব আচার, অতীন্দ্রিয়বাদ, দর্শন, মতবাদ (Doctrine), পবিত্র লিপি, আইন আর উপাসনালয় গড়ে তুলেছে। কিন্তু এসব ধর্মীয় প্রয়াসের সবগুলোরই উদ্ভব ঘটেছে ইসলামী সমাজের চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রায়শঃ যন্ত্রণাময় চিন্তাভাবনা হতে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি কুরানের আদর্শ মোতাবেক পরিচালিত না হয়, যদি তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিষ্ঠুর কিংবা শোষক হন, কিংবা যদি তাদের সমাজ আপাতঃ ধর্মহীন শত্রু দ্বারা অপদস্থ হয়, একজন মুসলিম ভাবতে পারে যে জীবনের পরম লক্ষ্য এবং মূল্যে তার বিশ্বাস বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। ইসলামী ইতিহাসকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে হবে তাকে, তা নাহলে গোটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই ব্যর্থ হয়ে যাবে, জীবন হারিয়ে ফেলবে তার অর্থ। সুতরাং রাজনীতি, ক্রিশ্চানরা যেমন বলে, সেক্রামেন্ট, এটা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে মুসলিমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে যা পার্থিব জগতে ঈশ্বরকে কার্যকরভাবে ক্রিয়াশীল হতে সক্ষম করে তোলে। পরিণামে, মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক প্রয়াস আর দুঃখ-দুর্দশা- রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা, গৃহবিবাদ, আগ্রাসন এবং শাসক গোষ্ঠীর উত্থান ও পতন- অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় অনুসন্ধান হতে বিচ্ছিন্ন কোনও বিষয় নয়, বরং ইসলামী দর্শনের মূল উপাদান (essence)। একজন মুসলিম তার আপন সময়কালের চলতি ঘটনাপ্রবাহ এবং অতীত ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করবে, যেমন করে একজন ক্রিশ্চান কোনও আইকন নিয়ে ভাববে, স্বর্গীয় গোপন সত্তাকে আবিষ্কার করার জন্যে সৃজনশীল কল্পনা ব্যবহার করার মাধ্যমে। সুতরাং মুসলিম জনগণের বাহ্যিক ইতিহাসের বিবরণ স্রেফ গৌণ আগ্রহের বিষয় হতে পারে না, কেননা ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইতিহাসের পবিত্রায়ন।

ঘটনাক্রমপঞ্জী

৬১০ মক্কায় পয়গম্বর মুহাম্মদ(সঃ) কুরানের প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং এর দু'বছর পর ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

৬১৬ মক্কার শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে মুহাম্মদের(সঃ) নবদীক্ষিতদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে; নিপীড়ন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে এবং মুহাম্মদের(সঃ) মক্কায় অবস্থান ক্রমবর্ধমান হারে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

৬২০ ইয়াসরিবের (পরবর্তীকালে মদীনা নামে পরিচিত) বসতি হতে আগত আরবগণ মুহাম্মদের(সঃ) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁকে তাদের সমাজে নেতৃত্ব দানের আমন্ত্রণ জানায়।

৬২২ আনুমানিক সত্তরটি মুসলিম পরিবারসহ পয়গম্বর মক্কা হতে মদীনায় *হিজরা* বা অভিবাসন করেন এবং মক্কার শাসক গোষ্ঠী প্রতিশোধ নেয়ার শপথ গ্রহণ করে। *হিজরার* মাধ্যমে মুসলিম বছর গণনার সূচনা ঘটে।

৬২৪ বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা মক্কার উপর এক নাটকীয় পরাজয় চাপিয়ে দেয়।

৬২৫ মদীনার বাইরে উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা মক্কা-বাহিনীর কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

মক্কার সঙ্গে সহযোগিতা করায় ইহুদি গোত্র কায়নুকাহ্ এবং নাদিরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করা হয়।

৬২৭ পরিখার যুদ্ধে মুসলিমরা অনায়াসে মক্কা-বাহিনীকে পরাস্ত করে। এর পরপরই সংঘটিত হয় ইহুদি গোত্র কুরাইযাহ্র বিনাশ, এ গোত্রটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সমর্থন দিয়েছিল।

৬২৮ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী হুদাইবিয়াহ্ নামক স্থানে হুদাইবিয়াহ্র-সন্ধির মাধ্যমে মুহাম্মদের(সঃ) দুঃসাহসী শান্তি উদ্যোগ ফলপ্রসু হয়। এই সময় তাঁকে আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয় এবং বহু আরবীয় গোত্র তাঁর কনফেডারেসিতে যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৬৩০ মক্কাবাসীরা হুদাইবিয়াহর-সন্ধি লঙ্ঘন করে। মুসলিম এবং মিত্রদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন মুহাম্মদ(সঃ)। পরাজয় টের পেয়ে মক্কা স্বেচ্ছায় মুহাম্মদের(সঃ) জন্যে পথ খুলে দেয় এবং তিনি বিনা রক্তপাতে ও কাউকে ধর্মান্তরিতকরণে বাধ্য না করেই নগরী অধিকার করে নেন।

৬৩২ পয়গম্বর মুহাম্মদের(সঃ) পরলোকগমন।
আবু বকর তাঁর *খলিফাহ্* (প্রতিনিধি) নির্বাচিত হন।

৬৩২-৩৪ আবু বকরের খেলাফত এবং কনফেডারেসি থেকে বেরিয়ে যাওয়া গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে *রিদ্দাহ (riddah)*র যুদ্ধ। আবু বকর বিদ্রোহ দমনে সফল হন এবং আরবের সকল গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

৬৩৪-৪৪ উমর ইবন আল-খাত্তাবের খেলাফত।
মুসলিম বাহিনী ইরাক, সিরিয়া এবং মিশর আক্রমণ করে।

৬৩৮ মুসলিমরা জেরুজালেম অধিকার করে। এই নগরী মক্কা ও মদীনার পর ইসলামী-বিশ্বের তৃতীয় পবিত্র-নগরীতে পরিণত হয়।

৬৪১ মুসলিমরা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, তারা পারসিয়ান সম্রাজ্যকে পরাস্ত করে এবং লোকবল অর্জিত হওয়ার পর এর অঞ্চলসমূহ অধিকার করে।
মুসলিম-বাহিনীর অবস্থানের জন্য কুফাহ, বসরাহ এবং ফুস্টাটে গ্যারিসন-শহর নির্মিত হয়; মুসলিম-বাহিনী প্রজা-সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করত।

৬৪৪ জনৈক পারসিয়ান যুদ্ধবন্দীর হাতে খলিফাহ্ উমর নিহত হন।
উসমান ইবন-আফফান তৃতীয় খলিফাহ্ নির্বাচিত হন।

৬৪৪-৫০ মুসলিমরা সাইপ্রাস, ত্রিপোলি, উত্তর আফ্রিকা দখল করে এবং ইরান, আফগানিস্তান এবং সিন্ধ-এ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৬৫৬ জনৈক অসন্তুষ্ট মুসলিম সৈনিকের হাতে খলিফাহ উসমান প্রাণ হারান; এই সৈনিক আলী ইবন আবি তালিবকে খলিফাহ্ ঘোষণা করে, কিন্তু সকলে আলীর শাসন মেনে নেয়নি।

৬৫৬-৬০ প্রথম *ফিৎনাহ্*। গৃহযুদ্ধ আসন্ন।

৬৫৬ উটের যুদ্ধ। উসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করায় পয়গম্বরের স্ত্রী আয়েশা, তালহা এবং যুবায়ের আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। আলীর বাহিনীর কাছে পরাস্ত হন তাঁরা।
সিরিয়ায় বিরোধীপক্ষের নেতৃত্ব দান করেন উসমানের আত্মীয় মুয়াবিয়াহ্ ইবন আবি সুফিয়ান।

৬৫৭ সিফফিনে দু'পক্ষের মাঝে এক আপোস রফার প্রয়াস নেয়া হয়; সালিশের রায় আলীর বিপক্ষে গেলে মুয়াবিয়াহ্ তাঁকে পদচ্যুত করে জেরুজালেমে খেলাফত দাবী করেন।
খারেজিরা আলীর পক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়।

৬৬১ জনৈক *খারেজি* চরমপন্থীর হাতে নিহত হন আলী।
আলীর সমর্থকরা তাঁর পুত্র হাসানকে পরবর্তী খলিফাহ্ হিসাবে ঘোষণা করে, কিন্তু হাসান মুয়াবিয়াহ্র সঙ্গে সমঝোতা করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

৬৬১-৮০ প্রথম মুয়াবিয়াহ্‌র খেলাফত। ইনি উমাইয়াহ্ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং মদীনা হতে দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

৬৬৯ মদীনায় হাসান ইবন আলীর পরলোকগমন।

৬৮০ পিতা মুয়াবিয়াহ্‌র মৃত্যুর পর প্রথম ইয়াযিদ দ্বিতীয় উমাইয়াহ খলিফাহ্ হন।

৬৮০-৯২ দ্বিতীয় *ফিৎনাহ্*। আবার গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা।

৬৮০ নিজেদের শিয়াহ্-ই-আলী বলে আখ্যাদানকারী কুফাহ্‌বাসী মুসলিমরা আলী ইবন আবি-তালিবের দ্বিতীয় পুত্র হুসেইনকে খলিফাহ্ ঘোষণা করে। ক্ষুদ্র এক বাহিনী নিয়ে কুফাহ্‌র উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন হুসেইন এবং কারবালা-প্রান্তরে ইয়াযিদ বাহিনীর হাতে নিহত হন।

আরবে আবদাল্লাহ ইবন আল-যুবায়ের ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

৬৮৩-প্রথম ইয়াযিদের মৃত্যু।

তাঁর শিশু-পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়াহ্‌র মৃত্যু।

খেলাফাতের উমাইয়াহ্ দাবীদার প্রথম মারওয়ানের সিংহাসন আরোহণ.

সিরিয়রা তাঁকে সমর্থন দেয়।

৬৮৪-উমাইয়াহ্‌দের বিরুদ্ধে *খারেজি* বিদ্রোহীরা মধ্য আরবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে।

ইরাক ও ইরানে *খারেজি*-বিদ্রোহ।

কুফাহ্‌য় শিয়া অভ্যুত্থান।

৬৮৫-৭০৫ আব্দ আল-মালিকের খেলাফত, যিনি উমাইয়াহ্ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

৬৯১ উমাইয়াহ-বাহিনী *খারেজি* ও শিয়া বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে।

জেরুজালেমে ডোম অভ দ্য রক সমাপ্ত হয়।

৬৯২ উমাইয়াহ্-বাহিনী ইবন আল-যুবায়েরকে পরাজিত ও হত্যা করে।

ফিৎনাহ্-যুদ্ধ সমূহের ফলে বসরাহ্, মদীনা এবং কুফাহ্‌য় এক ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে; বিভিন্ন মতবাদ-এর অনুসারীরা রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি জীবনে কুয়ারাহ'র অধিকতর কঠোর প্রয়োগের প্রচারণা চালায়।

৭০৫-১৭ আল-ওয়ালিদের খেলাফত।

মুসলিম বাহিনীর উত্তর আফ্রিকা অধিকার অব্যাহত থাকে।

স্পেনে বস্তুত প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭১৭-২০ দ্বিতীয় উমরের খেলাফত। ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ প্রদানকারী প্রথম খলিফাহ্ ইনি ধর্মীয় আন্দোলনের কোনও কোনও আদর্শের বাস্তবায়নের প্রয়াস পান

৭২০-২৪ অসচ্চরিত্র দ্বিতীয় ইয়াযিদের খেলাফত। উমাইয়াহ্ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক শিয়া ও *খারেজি* বিক্ষোভ।

৭২৪-৪৩ প্রথম হিশামের খেলাফত। ধর্মপ্রাণ কিন্তু অধিকতর স্বৈরাচারী শাসক যিনি অধিকতর ধার্মিক মুসলিমদের সংক্ষুব্ধ করে তোলেন।

৭২৮ *হাদিস* বিশেষজ্ঞ, ধর্মীয় সংস্কারক এবং সাধু হাসান আল-বাসরির পরলোকগমন।

৭৩২ পয়টিয়ার্সের যুদ্ধ। চার্লস মার্টেল স্প্যানিশ মুসলিমদের একটা ছোট আক্রমণকারী দলকে পরাজিত করেন।

আবু হানিফাহ্ *ফিকহ্* গবেষণার সূত্রপাত করেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক প্রথম পয়গম্বর মুহাম্মদের(সঃ) উল্লেখযোগ্য জীবনী রচনা করেন।

৭৪৩-৪৪ শিয়াহ্ পতাকার অধীনে যুদ্ধ করার মাধ্যমে আব্বাসীয় উপদল ইরানে উমাইয়াহ্দের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায় শুরু করে।

৭৪৩ দ্বিতীয় ওয়ালিদের খেলাফত।

৭৪৪-৪৯ দ্বিতীয় মারওয়ান কর্তৃক খেলাফত অধিকার। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উমাইয়াহ্-প্রাধান্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পান তিনি। তাঁর সিরিয় বাহিনী শিয়া বিদ্রোহীদের আংশিকভাবে দমন করে, কিন্তু :

৭৪৯-আব্বাসীয়রা কুফাহ্ দখল করে এবং উমাইয়াহ্দের উৎখাত করে।

৭৫০-৫৪ প্রথম আব্বাসীয় খলিফাহ্, খলিফাহ্ আবু আল-আব্বাস আল-সাফফাহ্ উমাইয়াহ্ পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করেন।

চরম রাজতন্ত্রের লক্ষণ, ইসলামে যা অভিনব।

৭৫৫-৭৫ আবু জাফর আল-মনসুরের খেলাফত। প্রধান শিয়া ব্যক্তিত্বদের হত্যা করেন তিনি।

৭৫৬ আব্বাসীয় খেলাফত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্পেন জনৈক উমাইয়াহ্ শরণার্থীর নেতৃত্বে স্বাধীন রাজত্বের পত্তন করে।

৭৬২ বাগদাদের পত্তন, যা নতুন আব্বাসীয় রাজধানীতে পরিণত হয়।

৭৬৫ শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিক-এর পরলোকগমন, যিনি তাঁর অনুসারীদের নীতিগতভাবে রাজনীতি পরিত্যাগের আহবান জানিয়েছিলেন।

৭৬৯ ইসলামের আইনের প্রধান মতবাদসমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবু হানিফাহ্র পরলোকগমন।

৭৭৫-৮৫ আল-মাহদীর খেলাফত। তিনি *ফিকহ্*'র বিকাশকে উৎসাহিত করেন, ধর্মীয় আন্দোলনের পবিত্রতাকে স্বীকৃতি দেন, যা ক্রমান্বয়ে আব্বাসীয় বংশের একচ্ছত্র আধিপত্যের সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

৭৮৬-৮০৯ হারুন আল-রশিদের খেলাফত। আব্বাসীয়দের ক্ষমতার স্বর্ণযুগ। বাগদাদ ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ। বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও পণ্ডিতজনদের পৃষ্ঠপোষকতাদানের পাশাপাশি খলিফাহ্ *ফিকহ্* গবেষণা এবং *আল-হাদিসের* সংকলনেরও উৎসাহ জোগান যা ইসলামী আইন (*শরিয়াহ্*)-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে।

৭৯৫ জুরিসপ্রুডেন্সের মালিকি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মালিক ইবন আনাসের পরলোকগমন।

৮০১ প্রথম মহান নারী অতীন্দ্রিয়বাদী রাবিয়াহ্‌র পরলোকগমন।

৮০৯-১৩ হারুন আল-রশিদের দুই পুত্র আল-মামুন ও আল-আমিনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ। আল-মামুন তাঁর ভাইকে পরাস্ত করেন।

৮১৩-৩৩ আল-মামুনের খেলাফত।

৮১৪-১৫ বসরাহ্‌য় শিয়া বিদ্রোহ।

খুরাসানে *খারেজি* বিদ্রোহ।

বুদ্ধিজীবী, শিল্পকলা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক খলিফাহ্‌ মুতাযিলাহ্‌র যুক্তি ভিত্তিক থিয়োলজির প্রতি ঝুঁকে পড়েন, এর আগে যা সহানুভূতি বঞ্চিত ছিল। কোনও কোনও বিরোধী ধর্মীয় গ্রুপকে শান্ত করার মাধ্যমে টানাপড়েন হ্রাসের প্রয়াস পান খলিফাহ্‌।

৮১৭ আল-মামুন অষ্টম শিয়া ইমাম আল-রিদাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

৮১৮ আল-রিদা নিহত হন, সম্ভবত খুন।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এক ইনকুইজিশন (*মিহনাহ্‌*) মুতাযিলাহ্‌ দর্শনকে অধিকতর জনপ্রিয় *আহল আল-হাদিসের* স্থলাভিসিক্ত করার প্রয়াস পায়। বিশ্বাসের জন্য এর অনুসারীদের কারারুদ্ধ করা হয়।

৮৩৩ *আহল-আল-হাদিসের* একজন বীর, জুরিসপ্রুডেন্সের হানবালি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ ইবন হানবালের পরলোকগমন।

৮৩৩-৪২ আল-মুতাসিমের খেলাফত। খলিফাহ্‌ টার্কিশ ক্রীতদাস সৈনিকদের দ্বারা ব্যক্তিগত বাহিনী গড়ে তোলেন এবং সামারায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

৭৪২-৪৭ আল-ওয়াসিকের খেলাফত।

৮৪৭-৬১ আল-মুতাওয়াক্কিলের খেলাফত।

৮৪৮ দশম শিয়া ইমাম আলী আল-হাদি সামারায় আসকারি দুর্গে বন্দী হন।

৮৬১-৬২ আল-মুনতাসিরের খেলাফত।

৮৬২-৬৬ আল-মুসতাইনের খেলাফত।

৮৬৬-৬৯ আল-মুতায-এর খেলাফত।

৮৬৮ দশম শিয়া ইমাম-এর পরলোকগমন। তাঁর পুত্র হাসান আল-আসকারির সামারায় বন্দী জীবন অব্যাহত।

৮৬৯-৭০ আল-মুহ্‌তাদির খেলাফত।

৮৭০ অন্যতম প্রথম মুসলিম ফায়লাসুফ ইয়াকিব ইবন ইসহাক আল-কিন্দির পরলোকগমন।

৮৭০-৭২ আল-মুতামিদের খেলাফত।

৮৭৪ সামারায় বন্দী অবস্থায় একাদশ ইমাম হাসান আল-আসকারির মৃত্যু। তাঁর পুত্র আবু আল-কাসিম মুহাম্মদ আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করেছেন বলে কথিত আছে। তিনি গুপ্ত ইমাম (Hidden Imam) হিসাবে পরিচিত।

অন্যতম প্রাক "মাতাল সুফি" (Drunken Sufi) অতীন্দ্রিয়বাদী আবু ইয়াযিদ আল-বিস্তামির পরলোকগমন।

৮৯২-৯০২ আল-মুতাদিদের খেলাফত।

৯০২-৮ আল-মুকতাফির খেলাফত।

৯০৮-৩২ আল-মুকতাদিরের খেলাফত।

৯০৯ টিউনিসিয়ার ইফরিকিয়াহ্য় শিয়া ফাতিমীয়দের ক্ষমতা দখল।

৯১০ অন্যতম প্রথম "সোবার সুফি" (Sober Sufi) বাগদাদের জুনাঈদের পরলোকগমন।

৯২২ "মাতাল-সুফি" আল-হাল্লাজ বা উল-কারডার নামে পরিচিত হুসেইন আল-মনসুরকে ব্লাসফেমির দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৯২৩ বাগদাদে ঐতিহাসিক আবু জাফর আল-তাবারির পরলোকগমন।

৯৩২-৩৪ আল-ক্বাহিরের খেলাফত।

৯৩৪-৪০ আল-রাদির খেলাফত।

৯৩৪ এক অলৌকিক বলয়ে গুপ্ত ইমামের "ঊর্ধ্বারোহণের" (Occultation) ঘোষণা।

৯৩৫-দার্শনিক হাসান আল-আশারির পরলোকগমন।

এই পর্যায় থেকে খলিফাহ্গণের হাতে আর কার্যকর ক্ষমতা থাকেনি, বরং তাঁরা স্রেফ প্রতীকী কর্তৃত্বের অধিকারী হন। প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় স্থানীয় শাসকদের হাতে যারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। তাদের অধিকাংশই আব্বাসীয় খলিফাহ্দের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন। দশম শতকের এইসব শাসকের অধিকাংশই ছিলেন শিয়া-পন্থী।

সামানিয়

৮৭৪-৯৯৯ বুরাসান, রাঈ, কিরমান ও ট্রানসোক্সেনিয়ায় সুন্নী ইরানি রাজবংশ সামানিয় শাসন, এর রাজধানী ছিল বুখারায়। সমরকন্দও এক পারস্য সাহিত্যিক রেনেসাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ৯৯০তে সামানিয়রা ওক্সাসের পুবে খারাখানিয় টুর্কদের কাছে ক্ষমতা হারাতে শুরু করে আর পশ্চিমে:

আল-আন্দালুসের স্প্যানিশ রাজ্য

৯১২-৬১ একচ্ছত্র শাসক খলিফাহ্ তৃতীয় আব্দ আল-রাহ্মানের শাসন।

৯৬৯-১০২৭ জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান কর্ডোভা।

১০১০ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দুর্বল হয়ে আসে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এমিরেট স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

১০৬৪ কবি, উজির এবং থিয়োলজিয়ান ইবন হাযমের পরলোকগমন।

১০৮৫ রিকনকুইস্টায় ক্রিশ্চান বাহিনীর কাছে টলেডোর পতন।

হামদানিয়

৯২৯-১০০৩ আরবীয় গোত্র হামদানিয়রা আলেপ্পো ও মোসুল শাসন করে। রাজ-দরবার পণ্ডিত, ঐতিহ্যাসিক, কবি এবং ফায়লাসুফদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে।

৯৮৩ আলেপ্পোয় ফায়লাসুফ এবং রাজকীয় বাদক আবু নাসর আল-ফারাবির পরলোকগমন।

বাঈয়ী

৯৩০-১০৩০ ৯৩০-এর দশকে দ্বাদশবাদী (Twelver) শিয়া এবং ইরানের দেঈলামের পর্বতবাসী বাঈয়ীরা পশ্চিম ইরানে ক্ষমতা অধিকার করে নিতে শুরু করে।

৯৪৫ বাঈয়ীরা বাগদাদ, দক্ষিণ ইরাক এবং ওমানে ক্ষমতা দখল করে।
শিরাজের কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ম্লান হতে বসে বাগদাদ। শিরাজ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

৯৮৩ বাঈয়ী একক বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তারা রাঈতে গাযনাহ্‌র মাহমুদের (১০৩০) এবং পশ্চিম ইরানের মালভূমি অঞ্চলের গাযনাভিয়দের কাছে পরাস্ত হয়।

ইকশিয়

৯৩৫-৬৯ তুর্ক মুহাম্মদ ইবন তুঘ প্রতিষ্ঠিত ইকশিয়রা মিশর, সিরিয়া ও হিজাজ শাসন করে।

শিয়া ফাতিমীয়

৯৬৯-১১৭১ (৯০৯-এ টিউনিসিয়ায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত) ফাতিমীয়রা উত্তর আফ্রিকা, মিশর এবং সিরিয়ার কিছু অংশ শাসন করে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে।

৯৮৩ ফাতিমীয়রা কায়রোয় তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে, যা শিয়া বিদ্যা চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে তারা আল-আযহার *মাদ্রাসা* নির্মাণ করে।

৯৭৬-১১১৮ গাযনাভিয়

৯৯৯-১০৩০ গাযনাহ্‌র মাহমুদ উত্তর ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইরানে সামানিয়দের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন। অসাধারণ রাজদরবার।

১০৩৭ হামাদানে মহান ফায়লাসুফ ইবন সিনার (পাশ্চাত্যে আভিসেনা) পরলোকগমন।

৯৯০-১১১৮ সেলজুক সাম্রাজ্য

৯৯০ দশক মধ্য এশিয়া থেকে আগত সেলজুক টার্কিশ পরিবারের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে তারা তাদের মরুচারী বাহিনীর অশ্বদল নিয়ে ট্রানসোক্সেনিয়া ও খয়ারাযম-এ প্রবেশ করে।

১০৩০ খুরাসনে সেলজুক।

১০৪০ গায্‌নাভিয়দের কাছ থেকে তারা পশ্চিম ইরান দখল করে নেয় এবং আযারবাইজানে প্রবেশ করে।

১০৫৫ আব্বাসীয় খলিফাহ্‌দের প্রতিনিধি (লেফটেন্যান্ট) হিসাবে সুলতান তোগরিল-বেগ বাগদাদ হতে সেলজুক সাম্রাজ্য শাসন করেন।

১০৬৩-৭৩ সুলতান আর্প আরস্লানের শাসনকাল।

১০৬৫-৬৭ বাগদাদে নিয়ামিয়াহ্ *মদ্রাসার* প্রতিষ্ঠা।

১০৭৩-৯২ উজির নিযামুলমুলককে নিয়ে মালিক শাহ্‌র সাম্রাজ্য শাসন।
সিরিয়া ও আনাতোলিয়ায় টার্কিশ বাহিনীর প্রবেশ।

১০৭১ মনযিকুর্টের যুদ্ধে সেলজুক বাহিনী বাইযানটাইনদের পরাজিত করে, আনাতোলিয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, পৌঁছে যায় এজিয়ান সাগর পর্যন্ত (১০৮০)।
সিরিয়ায় ফাতিমীয় ও স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে সেলজুকদের লড়াই।

১০৯৪ নিজ রাজ্যে সেলজুক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমের ক্রিশ্চান রাজ্যসমূহের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন বাইযানটাইন সম্রাট প্রথম আলেক্সিয়াস কমনেনাস।

১০৯৫ পোপ দ্বিতীয় আরবান প্রথম ক্রুসেডের আহ্‌বান জানান।

১০৯৯ ক্রুসেডারদের জেরুজালেম অধিকার।
ক্রুসেডারগণ প্যালেস্টাইন, আনাতোলিয়া এবং সিরিয়ায় চারটি ক্রুসেডার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

১০৯০ দশক ইসমায়েলীরা সেলজুক এবং সুন্নী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় টার্কিশ রাজবংশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে।

১১১১ বাগদাদে থিয়োলজিয়ান এবং আইনবিদ আল-গায্‌যালির পরলোকগমন।

১১১৮ সেলজুক রাজ্যের স্বাধীন প্রদেশে (Priacipalities) বিভাজন।

১১১৮-১২৫৪ আব্বাসীয় খেলাফতের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে ছোট-ছোট রাজ বংশগুলো স্বাধীনভাবে পরিচালিত হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ওগুলো প্রতিবেশী অধিকতর শক্তিশালী রাজবংশের কাছে নতি স্বীকার করছিল।

১১২৭-৭৩ জনৈক সেলজুক কমান্ডার প্রতিষ্ঠিত যাঙ্গীয় রাজবংশ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাতের লক্ষ্যে সিরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সমূহ হল :

১১৩০-১২৬৯ এক সুন্নী রাজবংশ আল মোহাদীয়রা আল-গাযযালির নীতি অনুযায়ী উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে সংস্কারের প্রয়াস পায়।

১১৫০-১২২০ উত্তর পশ্চিম ট্রানসোক্সোনিয়ার খরাযমশাহরা ইরানের অবশিষ্ট ক্ষুদে সেলজুক রাজবংশগুলোকে পরাস্ত করে।

১১৭১-১২৫০ কুর্দিশ জেনারেল সালাদিন প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবীয় রাজবংশ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যাঙ্গীয় অভিযান অব্যাহত রাখে। মিশরস্থ ফাতিমীয় খেলাফতকে পরাস্ত করে এবং একে সুন্নী ইসলামের অধীনে আনে।

১১৮০-১২২৫ বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাহ্ আল-নাসির অধিকতর কার্যকর শাসনের ভিত্তি হিসাবে ইসলামী *ফাতুয়াহ্ (Fatuwwah)* গোষ্ঠীকে ব্যবহারের প্রয়াস পান।

১১৮৭ হাতিনের যুদ্ধে সালাদিন ক্রুসেডারদের পরাজিত করেন এবং জেরুজালেমে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

১১৯১ সুফি অতীন্দ্রিয়বাদী এবং দার্শনিক ইয়াহিয়া সুহ্‌রাওয়ার্দির পরলোকগমন, সম্ভবতঃ আলেপ্পোতে ধর্মদ্রোহের অপরাধে আইয়ুবীয়দের হাতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি।

১১৯৩ ইরানি গুঈদ রাজবংশ দিল্লী অধিকার করে ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

১১৯৮ কর্ডোভায় ফায়লাসুফ ইবন রুশদ (পাশ্চাত্যে আভেরোয়েস নামে পরিচিত)-এর পরলোকগমন।

১১৯৯-১২২০ খরাযমশাহ্ আলা আল-দিন মাহ্‌মুদ এক বিশাল ইরানি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

১২০৫-৮৭ এক তার্কিশ ক্রীতদাস পরিবার ভারতে গুঈদদের পরাস্ত করার মাধ্যমে দিল্লীতে সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে এবং গোটা গাঙ্গেয় উপত্যকায় শাসন কায়েম করে। কিন্তু অচিরেই এইসব ক্ষুদে রাজবংশগুলোকে মঙ্গোলদের হুমকির মুখে পড়তে হয়।

১২২০-৩১ প্রথম মঙ্গোল হানা: নগর সমূহের ব্যাপক ধ্বংস।

১২২৪-১৩৯১ গোল্ডেন হোর্ড মোঙ্গলরা (Golden Horde Mongols) কাসপিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা শাসন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

১২২৫ আলমোহাদীয়রা স্পেন ত্যাগ করে, যেখানে মুসলিম ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে গ্রানাডার ক্ষুদে রাজ্যের কাছে পরাভূত হয়েছিল।

১২২৭ মঙ্গোল নেতা জেঙ্গিস খানের মৃত্যু।

১২২৭-১৩৫৮ চ্যাগাতাই মঙ্গোল খান ট্রানসোক্সেনিয়া শাসন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

১২২৮-১৫৫১ টিউনিসিয়ায় হাফসিয় রাজবংশ আলমোহাদীয়দের স্থান গ্রহণ করে।

১২৪০ সূফি দার্শনিক মুঈদ আদ-দিন ইবন আল-আরাবির পরলোকগমন।

১২৫০ দাস-বাহিনী মামলুকরা আইয়ুবীয়দের উৎখাত করে মিশর ও সিরিয়ায় একক শাসক পরিবার প্রতিষ্ঠা করে।

১২৫৬-১৩৩৫ মঙ্গোল ইল-খানস ইরাক ও ইরান শাসন করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১২৫৮ তাঁরা বাগদাদ ধ্বংস করেন।

১২৬০ মামলুক সুলতান বায়বারস আইন জালুতের যুদ্ধে মঙ্গল ইল-খানদের পরাজিত করেন এবং সিরিয় উপকূলের অবশিষ্ট শত্রুঘাঁটিগুলোর পতন ঘটিয়ে চলেন।

১২৭৩ আনাতোলিয়ায় ঘূর্ণায়মান দরবেশ (Whirling Dervishes) দলের প্রতিষ্ঠাতা জালাল আল-দিন রুমির পরলোকগমন।

১২৮৮ বাইযানটাইন সীমান্তের একজন *গাজী* উসমান আনাতোলিয়ায় অটোমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩২৬-৫৯ উসমানের পুত্র ওরখান একটি স্বাধীন অটোমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, এর রাজধানী ছিল ব্রুসায়; তিনি পতনোন্মুখ বাইযানটাইন সাম্রাজ্যের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন।

১৩২৮ দামাস্কাসে সংস্কারক আহ্‌মাদ ইবন তাঈমিয়াহ্‌র পরলোকগমন।

১৩৩৪-৫৩ গ্রানাডার রাজা ইউসুফ আলহাম্বরা নির্মাণ কাজ শুরু করেন, যা সমাপ্ত করেন তাঁর পুত্র।

১৩৬৯-১৪০৫ টিমুর লেঙ্ক (টামুরলেইন) সমরকন্দে চ্যাগাতাঈ মঙ্গল ক্ষমতা পুর্নরুজ্জীবিত করেন আর মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা অধিকার করে নেন এবং আনাতোলিয়া ও দিল্লি দখল করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১৩৮৯ কসোভোর রণক্ষেত্রে সারবিয়ানদের পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে অটোমানরা বলকানদের দমন করে। তারা আনাতোলিয়ায় ক্ষমতা বিস্তারে অগ্রসর হয়, কিন্তু ১৪০২-এ টিমুর লেঙ্ক কর্তৃক উৎখাত হয়।

১৪০৩-২১ টিমুরের মৃত্যুর পর প্রথম মেহ্‌মেদ অটোমান রাষ্ট্রের পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

১৪০৬ ফায়লাসুফ ও ঐতিহাসিক ইবন খালদুনের পরলোকগমন।

১৪২১-৫১ প্রথম মুরাদ হাঙ্গেরি ও পশ্চিমের বিরুদ্ধে অটোমান ক্ষমতার প্রমাণ রাখেন।

১৪৫৩ দ্বিতীয় মেহ্‌মেদ "দ্য কনকুয়েরার" কনসট্যানটিনোপল জয় করেন, এরপর যার নাম হয় ইসতাম্বুল; তিনি একে অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী পরিণত করেন।

১৪৯২ ক্যাথলিক রাজ্যপতি ফার্দিনান্ড ও ইসাবেলা কর্তৃক মুসলিম রাজ্য গ্রানাডা অধিকৃত হয়।

১৫০২-২৪ সাফাভিয় সূফি গোষ্ঠীর প্রধান ইসমায়েল ইরান জয় করার পর এখানে সাফাভিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশবাদী শিয়া মতবাদ এখন ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম; নিজ রাজ্যে ইসমায়েল কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে সুন্নী ইসলামকে দমন প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অটোমান সাম্রাজ্যে শিয়াদের ওপর নির্যাতন সূচিত হয়।

১৫১০ সুন্নী উযবেকদের খুরাশান থেকে বিতাড়িত করে ইসমায়েল সেখানে শিয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫১৩ পর্তুগিজ বণিকরা চীন পৌছায়।

১৫১৪ চ্যালডিরানের যুদ্ধে শাহ ইসমায়েলের সাফাভিয় বাহিনীকে পরাস্ত করেন সুলতান প্রথম সেলিম, ফলে সাফাভিয় বাহিনীর অটোমান অঞ্চলে পশ্চিমমুখী অভিযাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৫১৭ মামলুকদের কাছ থেকে মিশর ও সিরিয়া ছিনিয়ে নেয় অটোমানরা।

১৫২০-৬৬ পাশ্চাত্যে "দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট" হিসাবে পরিচিত সোলেইমান অটোমান সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটান এবং এর নিজস্ব আলাদা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলেন।

১৫২২ অটোমান কর্তৃক রোডস অধিকার।

১৫২৪-৭৬ ইরানের দ্বিতীয় সাফাভিয় শাহ প্রথম তাহ্মাসপ্ সেখানে শিয়া প্রাধান্য সংহত করেন। তাঁর দরবার শিল্পকলার কেন্দ্রে পরিণত হয়, চিত্রকর্মের জন্য যা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

১৫২৬ বাবুর ভারতে মোঘুল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫২৯ অটোমানরা ভিয়েনা অবরোধ করে।

১৫৪২ পর্তুগিজরা প্রথম ইউরোপীয় বাণিজ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

১৫৪৩ অটোমানরা হাঙেরি জয় করে।

১৫৫২-৫৬ রাশানরা ভলগা নদী তীরবর্তী প্রাচীন মঙ্গোল খানাট কাযান অস্ত্রাখান অধিকার করে নেয়।

১৫৬০-১৬০৫ আকবর মোঘুল ভারতের সম্রাট। সাম্রাজ্য চরম শিখরে পৌছে। আকবর হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা উৎসাহিত করেন এবং দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল অধিকার করেন। এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর নেতৃত্ব দেন তিনি। ভারত মহাসাগরে অটোমান ও পর্তুগিজরা নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

১৫৭০ অটোমান কর্তৃক সাইপ্রাস অধিকার।

১৫৭৮ অটোমান রাজকীয় স্থপতি সিনান পাশার মৃত্যু।

১৫৮০ দশক ভারতে পর্তুগিজদের ক্ষমতা ক্ষয়।

১৫৮৮-১৬২৯ শাহ প্রথম আব্বাস ইরানে সাফাভিয় সাম্রাজ্যের শাসক, ইসফাহানে এক জাঁকাল দরবার নির্মাণ করেন তিনি। আযারবাইযান ও ইরাক থেকে অটোমানদের উৎখাত করেন।

১৫৯০ ভারতে ডাচদের বাণিজ্য শুরু।

১৬০১ ডাচরা পর্তুগিজ ঘাঁটিগুলো অধিকার শুরু করে।

১৬০২ সুফি ঐতিহাসিক আবদুলফযল আল্লামির পরলোকগমন।

১৬২৫ সংস্কারক আহ্‌মাদ শিরহিন্দির পরলোকগমন।

১৬২৭-৫৮ শাহ্ জিহান মোঘুল সাম্রাজ্যের সম্রাট, সাম্রাজ্য এর পরিণতির শিখরে পৌছে। তাজমহল নির্মাণ করেন।

১৬৩১ ইসফাহানে শিয়া দার্শনিক মির দিমাদের পরলোকগমন।

১৬৪০ ইরানি দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয়বাদী মোল্লা সদরার পরলোকগমন।

১৬৫৬ অটোমান উজিরগণ অটোমান সাম্রাজ্যের পতন রোধ করেন।

১৬৫৮-১৭০৭ শেষ প্রধান মোঘুল সম্রাট আউরেঙ্গজেব ভারতে ইসলামীকরণের প্রয়াস পান, কিন্তু হিন্দু ও শিখদের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী বৈরিতা উৎসাহিত করেন।

১৬৬৯ অটোমান কর্তৃক ভেনিস হতে ক্রিট অধিকার।

১৬৮১ অটোমান কর্তৃক রাশিয়ার কাছে কিয়েভ পরিত্যাগ।

১৬৮৩ ভিয়েনায় দ্বিতীয় হামলায় ব্যর্থ হয় অটোমানরা, তবে সাফাভিয়দের কাছ থেকে ইরাক পুনরুদ্ধারে সফল হয় তারা।

১৬৯৯ কার্লোউইকয্ চুক্তির ফলে অটোমান হাঙেরি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়, প্রথম বড় ধরনের অটোমান পশ্চাদাপসরণ।

১৭০০ ইরানের প্রভাবশালী শিয়া *আলিম* মুহাম্মদ বাকির মজলিসির পরলোকগমন।

১৭০৭-১২ মোঘুল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো হারায়।

১৭১৫ অস্ট্রিয়ান ও প্রুশিয়ান রাজ্যসমূহের উদ্ভব।

১৭১৮-৩০ সুলতান তৃতীয় আহ্‌মাদ প্রথমবারের মত অটোমান সাম্রাজ্যে পাশ্চাত্যমুখী সংস্কার প্রয়াস পান, কিন্তু জানিসারিদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সংস্কার প্রয়াস সমাপ্ত হয়।

১৭২২ আফগান বিদ্রোহীরা ইসফাহানে আক্রমণ চালিয়ে অভিজাত গোষ্ঠীকে হত্যা করে।

১৭২৬ নাদির শাহ্ সাময়িকভাবে ইরানি শিয়া সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৩৯ নাদির শাহ্ দিল্লী অধিকার করে ভারতে কার্যত মোঘুল শাসনের অবসান ঘটান। হিন্দু, শিখ এবং আফগানদের মাঝে ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইরানকে সুন্নী ইসলামের পথে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন নাদির শাহ্। ফলে, নেতৃস্থানীয় ইরানি *মুজতাহিদরা* ইরান ত্যাগ করে অটোমান ইরাকে আশ্রয় নেন এবং সেখানে শাহ্‌দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক ক্ষমতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৪৮ আততায়ীর হাতে নাদির শাহ্‌র মৃত্যু। অরাজকতার একটা পর্ব নেমে আসে, এই সময়ে উসূলি আদর্শের অনুসারী ইরানিরা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, এতে করে মানুষ আইন-শৃঙ্খলার একটা উৎসের সন্ধান লাভ করে।

১৭৬২ ভারতে সুফি সংস্কারক শাহ্ ওয়ালি-উল্লাহ্‌র পরলোকগমন।

১৭৬৩ বিচ্ছিন্ন ভারতীয় রাজ্যসমূহে ব্রিটিশরা নিয়ন্ত্রণ বিস্তার ঘটায়।

১৭৭৪ রাশানদের হাতে অটোমানদের চূড়ান্ত পরাজয়। ক্রিমিয়া হাতছাড়া হয়ে যায় এবং অটোমান এলাকায় অর্থোডক্স ক্রিশ্চানদের "প্রটেক্টর" হয়ে ওঠেন জার।

১৭৭৯ ইরানে কাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন আকা মুহাম্মদ খান, যা শতাব্দীর শেষ নাগাদ শক্তিশালী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

১৭৮৯ ফরাসি বিপ্লব।

১৭৮৯-১৮০৭ তৃতীয় সেলিম অটোমান সাম্রাজ্যে নতুন করে পাশ্চাত্যমুখী সংস্কারের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং ইউরোপীয় রাজধানীসমূহে প্রথম অটোমান দূতাবাস স্থাপন করেন।

১৭৯২ জঙ্গী আরবীয় সংস্কারক মুহাম্মদ ইবন আব্দ আল-ওয়াহ্হাবের পরলোকগমন।

১৭৯৩ প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারি দলের ভারত আগমন।

১৭৯৭-১৮১৮ ফতহ্ আলি শাহ্ ইরানের শাসক। সেখানে ব্রিটিশ ও রাশান প্রভাবের সূচনা।

১৭৯৮-১৮০১ নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর অধিকার।

১৮০৩-১৩ ওয়াহ্বিরা আরবীয় হিজায অধিকার করে একে অটোমান নিয়ন্ত্রণ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

১৮০৫-৪৮ মুহাম্মদ আলী মিশরকে আধুনিক রূপ দেয়ার প্রয়াস পান।

১৮০৮-৩৯ সুলতান দ্বিতীয় মাহ্মুদ অটোমান সাম্রাজ্যে আধুনিকীকরণের "টানযিমাত" সংস্কার সূচিত করেন।

১৮১৪ গুলিস্তান চুক্তি: ককেশান এলাকা রাশিয়ার অধীনে যায়।

১৮১৫ অটোমান নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সারবিয়ান বিদ্রোহ।

১৮২১ অটোমানদের বিরুদ্ধে গ্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৮৩০ ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া দখল।

১৮৩১ মুহাম্মদ আলী অটোমান সিরিয়া দখল করেন এবং আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন, অটোমান সাম্রাজ্যের পরিধির ভেতরেই কার্যত স্বাধীন *ইমপেরিয়াম ইন ইমপেরিয়ো* প্রতিষ্ঠা করেন। অটোমান সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে ইউরোপীয় শক্তিগুলো হস্তক্ষেপ করে এবং মুহাম্মদ আলীকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাহারে (১৮৪১) বাধ্য করে।

১৮৩৬ নব্য-সুফি সংস্কারক আহ্মাদ ইবন ইদরিসের পরলোকগমন।

১৮৩৯ ব্রিটিশরা অ্যাডেন অধিকার করে।

১৮৩৯-৬১ অটোমান সাম্রাজ্যের পতন রোধকল্পে সুলতান আবদুলহামিদ অধিকতর আধুনিকতামুখী সংস্কারের সূচনা করেন।

১৮৪৩-৪৯ ব্রিটিশদের সিন্ধু উপত্যকা অধিকার।

১৮৫৪-৫৬ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, অটোমান সাম্রাজ্যে সংখ্যালঘু ক্রিশ্চানদের নিরাপত্তা নিয়ে ইউরোপীয়দের বিরোধের মাধ্যমে যার সূচনা।

মিশরের গভর্নর সাইদ পাশা ফ্রেঞ্চদের সুয়েয খাল মঞ্জুর করেন। মিশর কর্তৃক প্রথমবারের মত বিদেশী ঋণ গ্রহণের জন্যে চুক্তি সম্পাদন।

১৮৫৭-৫৮ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিদ্রোহ। ব্রিটিশদের হাতে শেষ মোঘল সম্রাটের পতন। স্যার সাইদ আহ্‌মাদ খান পাশ্চাত্য ধারায় ইসলামের সংস্কার ও ব্রিটিশ সংস্কৃতি গ্রহণের পক্ষে মত প্রচার করেন।

১৮৬০-৬১ লেবাননে দ্রুয্ বিদ্রোহীদের পরিচালিত ম্যাসাকারের পর ফ্রেঞ্চরা দাবী করে যে এটা ফ্রেঞ্চ গভর্নরের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত হবে।

১৮৬১-৭৬ সুলতান আবদুলআযিয অটোমান সাম্রাজ্যের সংস্কার অব্যাহত রাখেন, কিন্তু বিপুল বিদেশী ঋণ গ্রহণ করার ফলে সাম্রাজ্য দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং অটোমান অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ইউরোপীয় সরকারগুলোর হাতে চলে যায়।

১৮৬৩-৭৯ মিশরের গভর্নর ইসমায়েল পাশা ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেন, কিন্তু বিদেশী ঋণের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন যার ফলে দেউলিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করতে হয় সুয়েয খাল। মিশরের অর্থনীতির ওপর ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭১-৭৯ ইরানি সংস্কারক আল-আফঘানি মিশরে অবস্থান করে মুহাম্মদ আবদুসহ মিশরীয় সংস্কারবাদীদের একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ইসলামের পুনর্জাগরণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ইউরোপের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য খর্ব করা।

১৮৭২-১৮৭৬ এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ইরানে ব্রিটিশ ও রাশানদের বৈরিতা বৃদ্ধি। অটোমান সুলতান আবদুলআযিয উৎখাত হন। দ্বিতীয় আবদুলহামিদ প্রথম অটোমান সংবিধান ঘোষণা করতে বাধ্য হন, যা অবশ্য পরে সুলতান স্থগিত ঘোষণা করেন। শিক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অটোমান সংস্কার।

১৮৭৯ ইসমায়েল পাশার উৎখাত।

১৮৮১ ফ্রান্স কর্তৃক টিউনিসিয়া দখল।

১৮৮১-৮২ সংবিধানপন্থী ও সংস্কারবাদীদের সঙ্গে স্থানীয় মিশরীয় অফিসারদের এক বিদ্রোহের মাধ্যমে খেদিভ তাওফিকের ওপর তাদের নিজস্ব সরকারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এক গণঅভ্যুত্থানের ফলে গভর্নর হিসেবে লর্ড ক্রোমারের নেতৃত্ব ব্রিটিশ দখলদারিত্বের সূচনা ঘটে।

গোপন সংস্থাসমূহ সিরিয়ার স্বাধীনতার প্রচারণা চালায়।

১৮৮৯ ব্রিটিশদের সুদান দখল।

১৮৯২ ইরানে তামাক-সঙ্কট। জনৈক নেতৃস্থানীয় *মুজতাহিদের* দেয়া *ফতওয়াহ্*'র কারণে শাহ্ ব্রিটিশদের দেয়া তামাক সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহারে বাধ্য হন।

১৮৯৪ অটোমানদের বিরুদ্ধাচরণকারী ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ আর্মেনিয়ান বিপ্লবীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।

১৮৯৬ আল-আফঘানির জনৈক অনুসারীর হাতে ইরানের নাসিরুদ্দীন শাহ্ নিহত হন।

১৮৯৭ বেযেল প্রথমবারের মত যায়নিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠান। সম্মেলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অটোমান প্রদেশ প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।
আল-আফঘানির পরলোকগমন।

১৯০১ ইরানে তেল আবিষ্কার এবং ব্রিটিশদের বিশেষ সুবিধা দান।

১৯০৩-১১ ব্রিটিশ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের পর ভারতে হিন্দু ও মুসলিমদের বিভক্ত করতে চায় তারা, এই আশঙ্কায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (১৯০৬)।

১৯০৫ মিশরীয় সংস্কারক মুহাম্মদ আবদুর পরলোকগমন।

১৯০৬ ইরানে সংবিধানপন্থীদের বিপ্লবে শাহ্ একটি সংবিধান ঘোষণা এবং একটি মজলিস প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হন কিন্তু এক অ্যাংলো-রাশান চুক্তি এবং শাহ্ কর্তৃক রুশ-সমর্থিত একটা পাল্টা অভ্যুত্থানে সংবিধান বাতিল হয়ে যায়।

১৯০৮ তুর্কী তরুণদের অভ্যুত্থান সুলতানকে সংবিধান পুনর্বহালে বাধ্য করে।

১৯১৪-১৮ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ।
ব্রিটেন মিশরকে প্রটেক্টরেট ঘোষণা করে; ব্রিটিশ ও রাশান বাহিনী মিশর দখল করে নেয়।

১৯১৬-২১ ব্রিটিশদের মদদে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ।

১৯১৭ বেলফর ঘোষণায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সমর্থন প্রদান।

১৯১৯-২১ তার্কির স্বাধীনতা যুদ্ধ। আতাতুর্ক ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে ঠেকিয়ে স্বাধীন তুর্কী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি চরম সেক্যুলারকরণ ও আধুনিকীকরণের নীতিমালা গ্রহণ করেন (১৯২৪-২৮)।

১৯২০ সাইকস-পিকোট চুক্তি প্রকাশ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চদের মাঝে ভাগাভাগি হয়, যারা ম্যান্ডেট ও প্রটেক্টরেটসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, যদিও যুদ্ধের পর আরবদের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

১৯২০-২২ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে দুটি অসহযোগ আন্দোলনে সংগঠিত করেন গান্ধী।

১৯২১ ইরানে রেযা খান একটি সফল ক্যু দে'তায় নেতৃত্ব দেন এবং পাহ্লভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইরানে এক নিষ্ঠুর আধুনিকীকরণ ও সেক্যুলারকরণের নীতি গ্রহণ করেন তিনি।

১৯২২ মিশর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং সুদানের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে রয়ে যায়। ১৯২৩ ও ১৯৩০ এর মাঝে জনপ্রিয় ওয়ফদ পার্টি তিনটি নির্বাচনে ব্যাপক জয়লাভ করে, কিন্তু প্রতিবারই তারা ব্রিটিশ কিংবা রাজা কর্তৃক পদত্যাগে বাধ্য হয়।

১৯৩২ সউদি আরবের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৫ মিশরে সালাফিয়াহ্ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুসলিম সংস্কারক ও সাংবাদিক রশিদ রিদার পরলোকগমন।

১৯৩৮ ভারতীয় কবি-দার্শনিক মুহাম্মদ ইকবালের পরলোকগমন।

১৯৩৯-৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটিশরা রেযা শাহ্‌কে উৎখাত করে। পুত্র মুহাম্মদ রেযা (১৯৪৪) তাঁর উত্তরাধিকারী হন।

১৯৪০ দশক মুসলিম ব্রাদারহুড মিশরের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৪৫ টার্কির জাতিসংঘে যোগদান, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত (১৯৪৭)। আরব লীগের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৬ পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে মুসলিম লীগের প্রচারণার প্রেক্ষাপটে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯৪৭ মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি। ভারত বিভাগের ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রাণহানি।

১৯৪৮ প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসান ও জাতিসংঘের এক ঘোষণাবলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সৃষ্টি। নয়া ইহুদি রাষ্ট্রে আক্রমণ পরিচালনাকারী পাঁচটি আরব সেনাবাহিনীকে ইসরায়েল পরাস্ত করে। এই বৈরিতার সময় প্রায় ৭,৫০,০০০ প্যালেস্টাইনি দেশত্যাগ করে, পরে আর তারা স্বদেশে ফেরার অনুমতি পায়নি।

১৯৫১-৫৩ মুহাম্মদ মুসাদ্দিক এবং ন্যাশনাল ফ্রন্ট পার্টি ইরানি তেল জাতীয়করণ করে। রাজতন্ত্র বিরোধী এক বিক্ষোভের পর ইরান ছেড়ে পালিয়ে যান শাহ্, কিন্তু CIA ও ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত অভ্যুত্থানে আবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। ইউরোপীয় তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

১৯৫২ মিশরে জামাল আবদ আল-নাসেরের নেতৃত্বে স্বাধীন অফিসারদের বিদ্রোহে রাজা ফারুক ক্ষমতাচ্যুত হন। আল-নাসের মুসলিম ব্রাদারহুডকে দমন করেন এবং হাজার হাজার ব্রাদারকে নির্যাতন শিবিরে পাঠান।

১৯৫৪ আলজেরিয়ায় ফ্রেঞ্চ উপনিবেশবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সেক্যুলারিস্ট ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (FLN) নেতৃত্বে অভ্যুত্থান।

১৯৫৬ পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান অনুমোদন।
জামাল আবদ আল-নাসের সুয়েয খাল জাতীয়করণ করেন।

১৯৫৭ আমেরিকান CIA এবং ইসরায়েলি MOSSAD-এর সহায়তায় ইরানের শাহ্ রেযা মুহাম্মদ পাহ্‌লভী গুপ্ত পুলিশ বাহিনী SAVAK প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৮-৬৯ পাকিস্তানে জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের সেক্যুলারিস্ট সরকার।

১৯৬১ ইরানের শাহ্ মুহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভী আধুনিকীকরণের 'শ্বেত বিপ্লবে'র ঘোষণা দেন, যা ধর্মকে আরও প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দেয় এবং ইরানি সমাজে বিভেদকে আরও প্রবল করে তোলে।

১৯৬৩ আলজেরিয়ায় N.L.F সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আয়াতোল্লাহ রুহুল্লাহ্ খোমিনি পাহলভী শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান। গোটা ইরানে বিক্ষোভে অনুপ্রেরণা যোগান। পরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন তিনি এবং শেষে ইরাকে নির্বাসিত হন।

১৯৬৬ আল-নাসের মিশরের নেতৃস্থানীয় মৌলবাদী চিন্তাবিদ সাইয়ীদ কুতব-এর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন।

১৯৬৭ ইসরায়েল ও প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর মধ্যে 'ছয়দিনের যুদ্ধ'। ইসরায়েলি বিজয় এবং আরবদের চরম পরাজয় গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এক ধর্মীয় পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করে, কেননা পুরনো সেক্যুলারিস্ট নীতিমালা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৭০ আল-নাসেরের পরলোকগমন; আনোয়ার আল-সাদাত তাঁর স্থলাভিষিক্ত, যিনি মিশরীয় ইসলামপন্থীদের সমর্থন লাভের জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেন।

১৯৭১ শেখ আহ্মাদ ইয়াসিন কল্যাণমূলক সংগঠন মুজামাহ (কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠা করেন এবং PLO-র সেক্যুলার জাতীয়বাদের বিরোধিতা করে প্যালেস্টাইনের একটি ইসলামী পরিচয়ের অনুসন্ধান করেন; মুজামাহ ইসরায়েলের সমর্থন লাভ করে।

১৯৭১-৭৭ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আলী ভূট্টো বামপন্থী-সেক্যুলারিস্ট সরকারের নেতৃত্ব দেন, এই সরকার ইসলামপন্থীদের ছাড় দিলেও তা যথেষ্ট ছিল না।

১৯৭৩ ইয়োম কিপ্পুর দিবসে মিশর ও সিরিয়া ইসরায়েলে আক্রমণ চালায় এবং রণক্ষেত্রে এমন আকর্ষণীয় শক্তি প্রদর্শন করে যে আল-সাদাত ইসরায়েলের সঙ্গে দুঃসাহসী শান্তি উদ্যোগ গ্রহণের মত অবস্থানে পৌছেন এবং ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৭৭-৮৮ ধর্মপ্রাণ মুসলিম জিয়া আল-হক পাকিস্তানে এক সফল অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন এবং অধিকতর ইসলামী সরকার গঠন করেন, অবশ্য প্রকৃত রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করেন।

১৯৭৮-৭৯ ইরানি বিপ্লব। আয়াতোল্লাহ্ খোমিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ ফাকিহ্ হন (১৯৭৯-৮৯)।

১৯৭৯ পাকিস্তানী মৌলবাদী চিন্তাবিদ আবু আলা মউদুদীর পরলোকগমন। কয়েক শত সুন্নী মৌলবাদী সৌদি আরবে মক্কার কাবাহ্ দখল করে এবং তাদের নেতাকে মাহ্দী ঘোষণা করে; রাষ্ট্র বিদ্রোহ দমন করে।

১৯৭৯-৮১ তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে আমেরিকান জিম্মিদের বন্দী করা হয়।

১৯৮১ মুসলিম চরমপন্থীদের হাতে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার আল-সাদাত নিহত। এরা মিশরীয় জনগণের প্রতি সাদাতের অন্যায় আচরণ ও ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের নিন্দা করেছে।

১৯৮৭ *ইনতিফাদাহ্*, পশ্চিম তীর ও গাযা স্ট্রিপের ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনি গণঅভ্যুত্থান। HAMAS, মুজামাহর একটি উপদল এবার PLO-র পাশাপাশি ইসরায়েলের বিরোধিতা শুরু করে।

১৯৮৯ *দ্য স্যাটানিক ভার্সেস* উপন্যাসে পয়গম্বর মুহাম্মদের(সঃ) ব্লাসফেমাস বিবরণ তুলে ধরার অভিযোগে আয়াতোল্লাহ্ খোমিনি ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে একটি *ফাতওয়াহ্* জারি করেন। এক মাস পরে ইসলামী কনফারেন্সের উনপঞ্চাশটি সদস্য দেশের মধ্যে আটচল্লিশটি দেশ এই *ফাতওয়াহ্*কে অনৈসলামিক বলে নিন্দা জানায়।

আয়াতোল্লাহ খোমিনির পরলোকগমনের পর আয়াতোল্লাহ্ খামেনি ইরানের সর্বোচ্চ ফাকিহ হন এবং উদারপন্থী হোজ্জাত ওল-ইসলাম রাফসানজানি হন প্রেসিডেন্ট।

১৯৯০ আলজেরিয়ার স্থানীয় নির্বাচনে সেক্যুলারিস্ট FLN-এর বিরুদ্ধে ইসলামীক স্যালভেশন ফ্রন্ট (FIS) বিপুল বিজয় অর্জন করে। ১৯৯২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও ফ্রন্ট বিজয়ী হবে বলে মনে হয়।

একজন সেক্যুলারিস্ট নেতা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইন, কুয়েতে আক্রমণ চালান: প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর পশ্চিমা ও মধ্যপ্রাচ্যীয় মিত্রদেশগুলো ইরাকের বিরুদ্ধে অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম (Oparation Desert Storm) পরিচালনা করে (১৯৯১)।

১৯৯২ আলজেরিয়ায় FIS-এর ক্ষমতারোহণ ঠেকানোর জন্য সেনাবাহিনী এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং আন্দোলন দমন করে। ফলে অধিকতর চরমপন্থী সদস্যরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

অযোধ্যায় হিন্দু BJP-র সদস্যরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে।

১৯৯২-৯৯ সারবিয়ান ও ক্রোয়েশিয়ান জাতীয়তাবাদীরা কৌশলে বসনিয়া ও কসোভোর মুসলিম অধিবাসীদের হত্যা ও দেশত্যাগে বাধ্য করে।

১৯৯৩ ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে অসলো চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৯৪ জনৈক ইহুদি চরমপন্থী কর্তৃক হেবরন মসজিদে উনত্রিশজন মুসলিমের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে HAMAS-এর আত্মঘাতী বোমাবাজরা ইসরায়েলে ইহুদি নাগরিকদের ওপর আক্রমণ চালায়।

অসলো চুক্তি স্বাক্ষরের কারণে জনৈক ইহুদি চরমপন্থীর হাতে প্রেসিডেন্ট ইটযহাক রাবিনের মৃত্যু।

আফগানিস্তানে তালিবান মৌলবাদীদের ক্ষমতারোহণ।

১৯৯৭ এক ভূমিধ্বস বিজয়ের ভেতর দিয়ে উদারপন্থী ধর্মনেতা হোজ্জাত ওল-ইসলাম সাইয়ীদ খাতামি ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

১৯৯৮ সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে খোমিনির দেয়া *ফতওয়াহ্*র সঙ্গে তার সরকারের সম্পর্ক নেই বলে প্রেসিডেন্ট খাতামির ঘোষণা।

২০০১ সেপ্টেম্বর ১১। ওসামা বিন লাদেনের গ্রুপ আল-ক্বায়েদার সদস্য উনিশজন মুসলিম চরমপন্থী আমেরিকান যাত্রাবাহী বিমান হাইজ্যাক করে এবং ওঅর্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপর হামলে পড়ে।

অক্টোবর ৭। প্রতিশোধ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে তালিবান ও আল-ক্বায়েদার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সূচনা করে।

১
সূচনা

পয়গম্বর (৫৭০-৬৩২)

খ্রিস্টিয় ৬১০ সালের রমযান মাসে আরবের একজন বণিক এমন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা বিশ্বের ইতিহাস বদলে দিয়েছে। প্রতি বছর এসময়ে মুহাম্মদ ইবন আবদাল্লাহ্ সাধারণত আরবীয় হিজাযের মক্কার ঠিক বাইরে হিরা পর্বতের একটি গুহায় ধ্যানে বসতেন। সেখানে প্রার্থনা করতে তিনি, উপবাস পালন করতেন এবং দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্য দিতেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী আরবীয় সমাজের এক সঙ্কট নিয়ে উদ্বেগে ভুগছিলেন তিনি। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে তাঁর গোত্র কুরাইশ আশপাশের দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে ধনী হয়ে উঠেছিল। মক্কা এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল বটে, কিন্তু অর্থ-বিত্তের জন্যে আগ্রাসী প্রতিযোগিতার কারণে বেশ কিছু গোত্রীয় মূল্যবোধ হারিয়ে গিয়েছিল। যাযাবর জীবন যাত্রার রেওয়াজ অনুযায়ী গোত্রের অসহায়-দুর্বল সদস্যদের প্রতি নজর দেয়ার পরিবর্তে কুরাইশরা এখন গোত্রের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র গ্রুপিং বা ক্ল্যানের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অর্থ উপার্জনে আরও বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েছে। মক্কা এবং গোটা পেনিনসূলা জুড়ে আধ্যাত্মিক অস্থিরতাও বিরাজ করছিল। আরবদের জানা ছিল যে বাইযানটাইন ও পারসিয়ান সাম্রাজ্যগুলোয় অনুশীলিত জুডাইজম ও ক্রিশ্চানিটি তাদের নিজস্ব পৌত্তলিক ঐতিহ্যের তুলনায় ঢের বেশী উন্নততর। কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে তাদের দেব-নিচয়ের পরম ঈশ্বর (High God) আল-লাহ্ (যাঁর নামের অর্থ স্রেফ "ঈশ্বর")-ই ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের উপাস্য দেবতা, কিন্তু তিনি আরবদের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় কোনও পয়গম্বর এবং ঐশীগ্রন্থ প্রেরণ করেননি। প্রকৃতপক্ষেই, যেসব ইহুদি ও ক্রিশ্চানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হত তারা আরবরা ঐশী পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে গেছে বলে বিদ্রূপ করত। সমগ্র আরব বিশ্বে গোত্রগুলো হিংসা ও প্রতিহিংসার এক ভয়ঙ্কর চক্রে পড়ে ঘুরপাক খেয়ে মরছিল। আরবের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মাঝে ধারণা জন্মেছিল যে আরবরা বিস্মৃত জাতি, সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক উপেক্ষিত। কিন্তু ১৭ রমযানের রাতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, যখন মুহাম্মদ(স:) ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেকে এক ভয়ঙ্কর সত্তার আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করেন; এই সত্তা তাঁকে প্রবলভাবে আলিঙ্গন করে যতক্ষণ না তিনি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা আরবের এক নতুন ঐশীগ্রন্থের প্রথম বাণীসমূহ উচ্চারিত হতে শুনলেন।

প্রথম দু'বছর আপন অভিজ্ঞতার ব্যাপারে নীরবতা বজায় রাখেন মুহাম্মদ(স:)। নতুন নতুন প্রত্যাদেশ পেয়েছেন তিনি, কিন্তু সেগুলো কেবল স্ত্রী খাদিজা এবং খাদিজার চাচাত ভাই ক্রিশ্চান ওয়ারাকা ইবন নওফলের কাছে প্রকাশ করেছেন। দু'জনই একথা মেনে নিয়েছিলেন যে প্রত্যাদেশগুলো ঈশ্বরের কাছ থেকেই আগত, কিন্তু কেবল ৬১২-তেই মুহাম্মদ(স:) নিজেকে প্রচারণা চালানোর মত যথেষ্ট শক্তিশালী বোধ করেন এবং আস্তে আস্তে অনুসারী লাভ করেন: তাঁর তরুণ চাচাত ভাই আলী ইবন আবি তালিব, বন্ধু আবু বকর এবং তরুণ ব্যবসায়ী উসমান ইবন আফফান, যিনি ক্ষমতাশালী উমাইয়াহ্ পরিবারের সদস্য ছিলেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সদস্যসহ নব ধর্মদীক্ষিতদের অধিকাংশই ছিল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ক্লানের সদস্য; অন্যরা মক্কার নতুন বৈষম্য নিয়ে অসুখী ছিল, আরব চেতনার সঙ্গে তাকে মানানসই মনে হয়নি তাদের কাছে। মুহাম্মদের(স:) বাণী ছিল সাধারণ। আরবদের তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন কোনও মতবাদ (doctrine) শিক্ষা দেননি: সংখ্যাপরিষ্ঠ কুরাইশ ইতিমধ্যে বিশ্বাস করছিল যে আল্লাহ্ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং শেষ বিচারের দিনে মানব জাতির বিচার করবেন, যেমনটি ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা বিশ্বাস করত। একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন বলে ভাবেননি মুহাম্মদ(স:), বরং তিনি কেবল আরবদের কাছে একমাত্র ঈশ্বরের প্রাচীন বিশ্বাসই আবার ফিরিয়ে আনছেন, যাদের এতদিন কোনও পয়গম্বর ছিল না। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পদ গড়ে তোলা ঠিক নয় বরং সম্পদ বন্টন করাই মঙ্গল আর এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা উচিত যেখানে অসহায় ও দুর্বলেরা সম্মানের সঙ্গে বিবেচিত হবে। কুরাইশরা যদি তাদের পথ ঠিক না করে তাহলে তাদের সমাজ ধসে পড়বে (যেমন অতীতে অন্যান্য অন্যায় আচরণ ভিত্তিক সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে), কেননা তারা অস্তিত্বের মৌলনীতিমালা লঙ্ঘন করছে।

এটাই *কুরান* (আবৃত্তি) নামে অ্যাখ্যায়িত নতুন ঐশী গ্রন্থের মূল শিক্ষা, *কুরান* নাম হওয়ার কারণ স্বয়ং মুহাম্মদ(স:) সহ অধিকাংশ বিশ্বাসী নিরক্ষর ছিলেন বলে এর অধ্যায় (*সুরা*) সমূহের প্রকাশ্য আবৃত্তি শুনে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মুহাম্মদের(স:) কাছে কুরান পঙক্তির পর পঙক্তি, সুরার পর সুরা এইভাবে পরবর্তী একুশ বছর ধরে, কখনও কোনও সঙ্কটের সমাধান হিসাবে আবার কখনও বিশ্বাসীদের ছোট গোষ্ঠীর মাঝে উদ্ভূত কোনও জিজ্ঞাসার জবাব স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যাদেশ সমূহ মুহাম্মদের(স:) জন্য কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল, যিনি বলেছেন: "আমি কখনও এমন কোনও প্রত্যাদেশ লাভ করিনি যখন আমার আত্মাকে ছিনিয়ে নেয়ার মত অনুভূতি জাগেনি।"[১] প্রথম দিকে প্রভাব এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে তাঁর গোটা শরীর থরথর করে কাঁপত: এমনকি প্রবল ঠাণ্ডার দিনেও ঘাম্ভেন দরদর করে, প্রবল তার অনুভব করতেন তিনি অথবা অদ্ভুত শব্দ বা কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। একেবারে সেক্যুলার পরিভাষায় আমরা বলতে পারি মুহাম্মদ(স:) তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক গভীর স্তরে তাঁর জাতির সামনে বিরাজিত

সমস্যাবলী উপলব্ধি করেছেন, এবং ঘটনাপ্রবাহ "শ্রবণ করার" সময় অন্তরের অন্তস্তলে গভীর ও কষ্টকরভাবে ডুব দিতে বাধ্য হয়েছেন যাতে কেবল রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আলোকময় সমাধান লাভ করা যায়। তিনি এক নতুন সাহিত্য ধরন এবং আরবীয় গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের একটি মাস্টারপিসও নির্মাণ করছিলেন। প্রথম দিকের বিশ্বাসীদের অনেকেই কুরানের অসাধারণ সৌন্দর্যের কারণেই ধর্মান্তরিত হয়েছিল, যা তাদের গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অনুরণিত হয়েছে, মহৎ শিল্পকর্মের আকারে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ব ধারণাকে ভেদ করে গেছে এবং তাদের সমগ্র জীবনধারাকে বদলে দেয়ার জন্য যুক্তির চেয়ে গভীর কোনও স্তরে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এসব ধর্মান্তরকরণের ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয়টি হচ্ছে উমর ইবন আল-খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ, যিনি প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, প্রবলভাবে মুহাম্মদের(সঃ) বাণীর বিরোধিতা করতেন, নতুন গোত্রটিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আরবীয় কাব্য-সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞও ছিলেন তিনি, এবং প্রথম বারের মত কুরানের বাণী শোনামাত্র এর অসাধারণ অলঙ্কারময় ভাষায় মুগ্ধ হয়ে যান। যেমন তিনি বলেছেন, ভাষা এর বাণী সম্পর্কে তাঁর সব সংস্কার ভেদ করে গেছে: "যখন আমি কুরান শুনলাম, আমার হৃদয় কোমল হয়ে গেল, আমি কাঁদলাম আর ইসলাম আমার মাঝে প্রবেশ করল।"[২]

নতুন গোত্রটি শেষ পর্যন্ত *ইসলাম* (আত্মসমর্পণ) নামে অভিহিত হয়; একজন *মুসলিম* সেই নারী বা পুরুষ যে তার সমগ্র সত্তা আল্লাহ্ এবং তাঁর ইচ্ছা যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত সাম্য আর সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করবে, তার প্রতি সমর্পণ করেছে। এটা একটি ভঙ্গি বা আচরিক প্রার্থনার (*সালাত*) ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়, মুসলিমদের প্রতিদিন তিনবার যা পালন করতে হত। (পরবর্তীকালে এই প্রার্থনা দিনে পাঁচ বারে বৃদ্ধি পায়)। প্রাচীন গোত্রীয় নীতি বা মূল্যবোধ ছিল সমতাভিত্তিক; আরবরা রাজতন্ত্রের ধারণা সমর্থন করত না এবং ক্রীতদাসের মত মাটিতে মাথা ঠোকার ব্যাপারটি তাদের কাছে ঘৃণিত ছিল। কিন্তু প্রার্থনার ভঙ্গি নির্ধারণ করা হয়েছিল মক্কায় দ্রুত বেড়ে ওঠা কঠিন ঔদ্ধত্য আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুভূতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে। মুসলিমদের দেহের ভঙ্গিমা তাদের পুন:শিক্ষা দান করবে, তাদের অহঙ্কার আর স্বার্থপরতা ভুলে যাবার শিক্ষা দেবে এবং স্মরণ করিয়ে দেবে যে ঈশ্বরের সামনে তারা কিছুই নয়। কুরানের কঠোর শিক্ষা পালন করার জন্যে মুসলিমদের তাদের আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ দান (*যাকাত*) হিসাবে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করতে হত। দরিদ্রদের বঞ্চনার কথা উপলব্ধি করার জন্য, যারা পছন্দ মত খেতে বা পান করতে পারে না। রমযান মাসে উপবাসও পালন করতে হত।

সুতরাং সামাজিক ন্যায়বিচারই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। মুসলিমদের প্রধান কর্তব্য হিসাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে: এমন একটি সমাজ (*উম্মাহ্*) গড়ে

তুলতে হবে বাস্তব সহমর্মিতাই যার প্রধান বৈশিষ্ট্য, যেখানে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন রয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে যেকোনও মতবাদ ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে এটা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মতাত্ত্বিক আঁচ-অনুমান সম্পর্কে কুরানের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যাকে *যান্নাহ্* বলে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ, কারও পক্ষেই ধারণা করা অসম্ভব এমন অলৌকিক বিষয়ে স্বকপোলকল্পিত ধারণা প্রদান। এধরনের বিমূর্ত ডগমা নিয়ে তর্ক করা অর্থহীন বলে মনে করা হয়; বরং ঈশ্বর মানুষের জন্য যেমন জীবন-ধারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেভাবে জীবনধারণ করার প্রয়াস (*জিহাদ*) চালানো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। *উম্মাহ্‌র* রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ মুসলিমদের জন্য পবিত্র মূল্যবহ। যদি *উম্মাহ্* সমৃদ্ধি লাভ করে তাহলে সেটা মুসলিমরা যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করছে তারই লক্ষণ; এবং একটি প্রকৃত *ইসলামী* সমাজে বসবাসের অভিজ্ঞতা, যা ঈশ্বরের কাছে সর্বাঙ্গীনভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, মুসলিমদের পবিত্র দুর্জ্ঞেয়ের অনুভূতি যোগাবে। পরিণামে তারা *উম্মাহ্‌র* যেকোনও দুভার্গ্য বা অপমানে প্রবলভাবে তাড়িত হবে যেমন ক্রিশ্চানরা কাউকে অপমানকরভাবে বাইবেল মাড়িয়ে যেতে দেখলে কিংবা শেষ ভোজের ছবি ছিড়তে দেখলে তাড়িত হয়।

এই সামাজিক উদ্বেগ বরাবরই মহান বিশ্ব ধর্মসমূহের আবশ্যকীয় অংশ ছিল যা ঐতিহাসিকরা যাকে অ্যাক্সিয়াল যুগ (Axial Age c.৭০০ বিসিই থেকে ২০০ বিসিই) বলেছেন সেই সময় বিকাশ লাভ করেছিল, যখন আমাদের পরিচিত সভ্যতা কনফেশনাল ধর্মবিশ্বাস সমূহের পাশাপাশি গড়ে উঠছিল, মানবজাতিকে যা অব্যাহতভাবে উন্নত করে তুলেছে: চীনের তাওবাদ এবং কনফুসিয়ানিজম; ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ধর্মমত ও বুদ্ধধর্ম; মধ্যপ্রাচ্যে একেশ্বরবাদ; এবং ইউরোপে যুক্তিবাদ। এইসব বিশ্বাস প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদের সংস্কার সাধন করেছে, যা কিনা অধিকতর বৃহৎ এবং আরও জটিল সমাজে এই সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে সমর্থন জোগাতে সক্ষম বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার পর আর পর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছিল না। বৃহত্তর রাজ্যসমূহের মানুষ আরও প্রশস্ত দিগন্তের সন্ধান লাভ করেছিল এবং স্থানীয় কান্টসমূহ যথার্থতা হারাচ্ছিল: ক্রমবর্ধমানহারে অ্যাক্সিয়াল যুগের ধর্মবিশ্বাসগুলো একক উপাস্য বা দুর্জ্ঞেয়ের সর্বোচ্চ প্রতীকের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটি বিশ্বাসই যার যার সমাজে বিরাজিত মৌল অবিচার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল। প্রাক-আধুনিক সকল সভ্যতাই অর্থনৈতিকভাবে উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল: সুতরাং কৃষকদের শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হত তাদের যারা আবার তাদের উন্নত সংস্কৃতির অংশীদার হতে পারত না, যা ছিল কেবল অভিজাতদের জন্যে। এর মোকাবিলা করার জন্য নতুন ধর্মবিশ্বাসসমূহ সহমর্মিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। আরব সভ্য জগতের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। এর অবাধ্য জলবায়ুর অর্থ ছিল, আরবরা অনাহারের উপান্তে বসবাস করছে; তাদের এমন কোনও উপায় আছে বলে মনে হয়নি যে তাদের পক্ষে কৃষি ভিত্তিক উদ্বৃত্ত অর্জন করে

স্যাসানিয় পারসিয়া বা বাইযানটিয়ামের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। কিন্তু কুরাইশরা বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলার পর তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে শুরু করেছিল। অনেকেই তখনও প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু মাত্র একজন ঈশ্বরের উপাসনা করার ক্রমবর্ধমান একটা প্রবণতারও বর্ধিষ্ণু অস্বস্তিও ছিল। আরবরা এখন তাদের নিজস্ব অ্যাক্সিয়াল-যুগ ধর্ম বিশ্বাসের জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু তার মানে ঐতিহ্যের পাইকারী প্রত্যাখ্যান ছিল না। অ্যাক্সিয়াল যুগের পয়গম্বর এবং সংস্কারকগণ তাদের অঞ্চলের প্রাচীন পৌত্তলিক আচারের উপর নির্ভর করেছেন এবং মুহাম্মদ(স:)ও তাই করবেন। অবশ্য তিনি মানাত, আল-লাত এবং আল-উযযাহ্'র মত জনপ্রিয় আরবীয় দেবীদের কাল্ট উপেক্ষা করার দাবী জানিয়েছেন, কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনার কথা বলেছেন। প্যাগান দেবতাদের কুরানে দুর্বল গোত্র প্রধানদের মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে যারা তাদের জাতির জন্য দায় বিশেষ, কারণ তারা তাদের পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা দিতে অক্ষম। কুরান একেশ্বরবাদের পক্ষে কোনও দার্শনিক যুক্তি তুলে ধরেনি: এর আহবান বাস্তববাদী এবং সেকারণে বাস্তববাদী আরবদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। কুরান দাবী করেছে, প্রাচীন ধর্ম আর কাজ কারছে না।[৩] আধ্যাত্মিক অস্থিরতা, পৌন:পুনিক ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অবিচার আরব ঐতিহ্য আর গোত্রীয় মূল্যবোধের লঙ্ঘন করে চলছে। মাত্র একজন ঈশ্বর এবং ন্যায় বিচার ও সাম্যতার ভিত্তিতে পরিচালিত ঐকবদ্ধ উম্মাহ্‌র মাঝেই সমাধান নিহিত।

একেবারে নতুন শোনালেও, কুরান জোর দিয়ে বলেছে এর বাণী সর্বজনবিদিত সত্যের "স্মারক" মাত্র।[৪] এটাই আদি ধর্মবিশ্বাস যা অতীতের পয়গম্বরগণ গোটা মানবজাতির কাছে প্রচার করে গেছেন। মানব জাতির যেভাবে চলা উচিত ঈশ্বর সে সম্পর্কে তাকে অজ্ঞ রাখেন না: পৃথিবীর সকল জাতির নিকট তিনি বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। ইসলামী বিবরণসমূহ পরবর্তীকালে এধরনের ১,২৪,০০০ পয়গম্বর আগমন করেছিলেন বলে উল্লেখ করে, অসীমতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত এটি একটি প্রতীকী সংখ্যা। প্রত্যেকেই তাদের জাতির জন্য ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাজাত গ্রন্থ পৌছে দিয়েছেন: সেগুলো ঈশ্বরের ধর্মের সত্যকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকতে পারে, কিন্তু অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মূলবাণী বরাবর একই ছিল। অবশেষে এবার ঈশ্বর কুরাইশদের কাছে একজন পয়গম্বর এবং একটি ঐশীগ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। কুরান বারবার উল্লেখ করেছে যে, মুহাম্মদ(স:) পুরনো ধর্মসমূহকে রদ করার জন্য আসেননি, তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করতে বা নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতেও নয়। তাঁর বাণী অব্রাহাম, মোজেস, ডেভিড, সলোমন কিংবা জেসাসের বাণীর অনুরূপ।[৫] কুরান কেবল আরবদের পরিচিত পয়গম্বরদের নামই উল্লেখ করেছে, কিন্তু বর্তমানে মুসলিম পণ্ডিতগণ যুক্তি দেখান যে মুহাম্মদ(স:) যদি বৌদ্ধ বা হিন্দু, অস্ট্রেলীয় আদিবাসী বা আদি আমেরিকানদের কথা জানতেন, কুরান তাদের সাধুদেরও স্বীকার করত, কারণ সঠিক পথে পরিচালিত সকল ধর্মবিশ্বাস যা

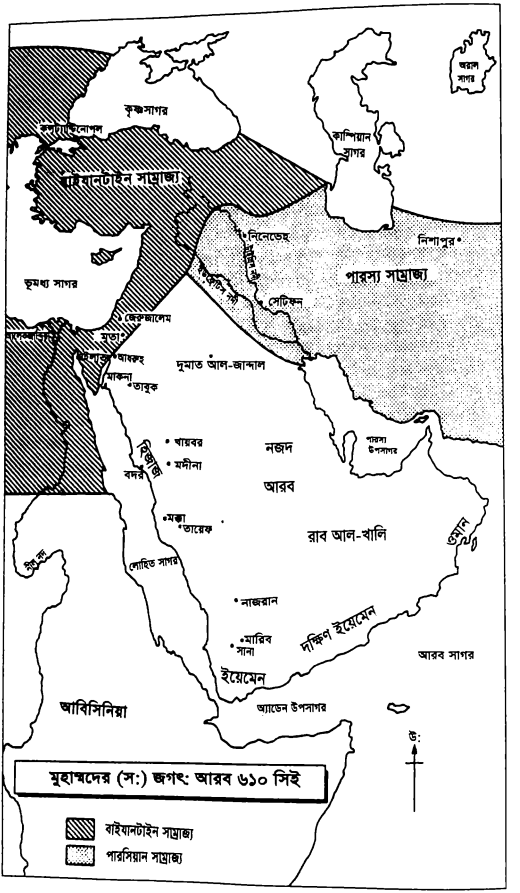

মুহাম্মদের (স:) জগৎ: আরব ৬১০ সিই

পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত, যা মানবসৃষ্ট দেবতাকে উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ন্যায়বিচার ও সাম্যের কথা বলে তা একই স্বর্গীয় উৎস থেকে আগত। এই কারণে মুহাম্মদ(স:) ইহুদি বা ক্রিশ্চানদের তারা নির্দিষ্টভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করলে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাননি; কেননা তারা পূর্ণাঙ্গ বৈধ নিজস্ব প্রত্যাদেশ লাভ করেছিল। কুরান জোরের সঙ্গে বলেছে যে, "ধর্মের ব্যাপারে কোনও জোরজবরদস্তি নেই,"[৬] এবং মুসলিমদের ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে নির্দেশ দিয়েছে, কুরান যাদের *আহল্ আল-কিতাব* বলে আখ্যা দিয়েছে। সাধারণভাবে "ঐশী গ্রন্থধারী জাতি" হিসাবে এই শব্দবন্ধটি অনুদিত হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকতর সঠিকভাবে যা "পূর্বের প্রত্যাদেশেপ্রাপ্ত জাতি" বোঝায়:

> তোমরা কিতাবীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করবে তাদের সাথে নয়। আর বলো, "আমাদের ওপর ও তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই, আর তাঁরই কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।"[৭]

কেবল আমাদের অধিকতর আধুনিক সংস্কৃতির পক্ষেই মৌলিকত্বের কদর এবং ঐতিহ্যকে পাইকারিভাবে পরিত্যাগ করা সম্ভব। প্রাক-আধুনিক সমাজে ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুহাম্মদ(স:) অতীতের সঙ্গে প্রবল বিচ্ছেদ বা অন্য বিশ্বাসের সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করেননি। নতুন ঐশীগ্রন্থকে তিনি আরবের আধ্যাত্মিক দৃশ্যপটে স্থাপন করতে চেয়েছেন।

একারণেই মুসলিমরা মক্কার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চৌকো-আকৃতির উপাসনাগৃহ কাবাহ্য় প্রথাগত আচার অব্যাহত রেখেছিল, যা আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাসনা কেন্দ্র ছিল। এমনকি মুহাম্মদের(স:) সময়কালেও একেবারে প্রাচীন ছিল উপাসনা গৃহটি, এর সঙ্গে সম্পর্কিত কাল্টের মূল তাৎপর্য হারিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির আড়ালে, কিন্তু প্রতিবছর সমগ্র পেনিনসুলা থেকে হজ্জ তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে আগত আরবদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল এটি। তারা পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করে উপাসনাগৃহকে ঘিরে সাতবার প্রদক্ষিণ করত; কাবাহ্র দেয়ালে গাঁথা কৃষ্ণ-পাথর চুম্বন করত, যা সম্ভবত: পৃথিবীর বুকে এসে পড়া উল্কাপিণ্ড ছিল, স্বর্গীয় জগতের সঙ্গে উপাসনাগৃহের অবস্থানের সংযোগ স্থাপন করেছিল। এসব আচার (*উমরাহ্* নামে পরিচিত) যে কোনও সময় পালন করা যেত; কিন্তু হজ্জ তীর্থযাত্রার সময়েও তীর্থযাত্রীরা কাবাহ্র পার্শ্ববর্তী আল-সাফা পাহাড় থেকে উপত্যকার উপর দিয়ে আল-মারওয়াহ্ অবধি দৌড়াত, সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করত তারা। এরপর তারা মক্কার উপকণ্ঠে এসে আরাফাতের ময়দানে সারারাত জাগ্রত অবস্থায় পাহারায় থাকত, সদলবলে তারা মুযদালিফাহ্ উপত্যকায় ছুটে গিয়ে মিনার একটা পাথরকে

লক্ষ্য করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করত, মাথা মুণ্ডন করত এবং তীর্থযাত্রার শেষ দিন ঈদ-আল-আযহায় পশু উৎসর্গ করত।

সমাজবদ্ধতার আদর্শ ছিল কাবাহ্‌র কান্টের মূল বিষয়। মক্কা এবং এর আশপাশের সকল এলাকায় সব সময়ের জন্যে সবরকম সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল। কুরাইশদের বাণিজ্যিক সাফল্যের পেছনে এটা ছিল একটা প্রধান উপাদান, কেননা এতে করে প্রতিহিংসামূলক বৈরিতার প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সক্ষম হত আরবরা। হজ্জের সময় তীর্থযাত্রীদের অস্ত্রবহন, বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া, কোনও পশু, এমনকি কীট-পতঙ্গ হত্যা বা বাঁকা কথা বলার উপরও নিষেধাজ্ঞা থাকত। এসবই *উম্যাহ্‌র* জন্যে মুহাম্মদের(সঃ) আদর্শের পক্ষে অনুকূল ছিল। তিনি স্বয়ং উপাসনাগৃহের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন, প্রায়ই *উমরাহ্* পালন করতেন তিনি এবং কাবাহ্‌র পাশে কুরান আবৃত্তি করতেন। আনুষ্ঠানিকভাবে উপাসনাগৃহটি এক নাবাতিয় দেবী হুবালের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। কাবাহ্‌র চারপাশে ৩৬০টি প্রতিমা সাজানো ছিল, সম্ভবত বছরের দিনগুলোর স্মারক ছিল ওগুলো। কিন্তু মুহাম্মদের(সঃ) কাল আসতে আসতে ধারণা জন্মে যে কাবাহ্‌গৃহকে পরমঈশ্বর আল্লাহ্‌র উপাসনালয় হিসাবে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে আর ব্যাপক বিস্তারি বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ্‌ই পৌত্তলিকদের পাশাপাশি হজ্জ পালনে আগত বাইযানটাইন সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণকারী একেশ্বরবাদী গোত্রসমূহের উপাস্য। কিন্তু এসব কারণেই মিশনের গোড়ার দিকে মুহাম্মদ(সঃ) তখনও মুসলিমদের *আহল্ আল-কিতাব*-এর পবিত্র নগরী জেরুজালেমের দিকে ফিরে *সালাত* প্রার্থনায় যোগ দিতে বলেছেন, কাবাহ্‌র সঙ্গে পৌত্তলিকদের সম্পর্ক থাকায় উপাসনাগৃহটিকে পেছনে রেখে দাঁড়াত তারা। এ থেকে তাঁর আরবদের একেশ্বরবাদী পরিবারে নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়।

ছোট আকারের অনুসারী লাভ করেন মুহাম্মদ(সঃ) এবং এক পর্যায়ে মোটামুটি সত্তরটি পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম দিকে মক্কার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা মুসলিমদের উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু ৬১৬ নাগাদ তারা মুহাম্মদের(সঃ) উপর চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা অভিযোগ তোলে যে মুহাম্মদ(সঃ) তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করছেন এবং তিনি নিঃসন্দেহে একজন প্রতারক, যিনি পয়গম্বরের ভান করছেন মাত্র। তারা বিশেষ করে শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে কুরানের বিবরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, একে তারা আদিম এবং যুক্তিবর্জিত বলে নাকচ করে দিয়েছিল। আরবরা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসী ছিল না এবং এধরনের "রূপকথা"য় আমলই দিতে চাইত না। কিন্তু তারা এটা দেখে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল যে কুরানে এই জুডো-ক্রিশ্চান বিশ্বাসটি তাদের গলাকাটা পুঁজিবাদের আঁতে ঘা দিয়ে বসেছে। শেষ বিচারের দিন, আরবদের সতর্ক দেয়া হয়েছে, তাদের গোত্রের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য কোনও কাজে আসবে না: প্রত্যেককে তার নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে যাচাই করা হবে: কেন তারা দরিদ্রের সেবা করেনি? কেন তারা সম্পদ বণ্টনের বদলে তা

পুঞ্জীভূত করেছে? যেসব কুরাইশ নতুন মক্কায় সমৃদ্ধি অর্জন করছিল এধরনের কথাবার্তা তাদের ভাল লাগার কথা নয়, ফলে বিরোধী শক্তি জোরাল হয়ে উঠল আবু আল-হাকাম (কুরানে যাকে আবু জাহ্‌ল, "মিথ্যার পিতা" বলা রয়েছে), অসাধারণ তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি আবু সুফিয়ান, যিনি একসময় মুহাম্মদের(সঃ) ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন এবং নিবেদিতপ্রাণ পৌত্তলিক সুহায়েল ইবন আমর এর নেতৃত্বে। এঁরা সবাই তাঁদের পূর্বপুরুষের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগের ধারণায় অস্বস্তিতে ভুগছিলেন, প্রত্যেকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী আত্মীয়-স্বজন ছিল: এবং সবার আশঙ্কা ছিল যে মুহাম্মদ(সঃ) বুঝি মক্কার নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়ার পরিকল্পনা করছেন। কুরান জোর দিয়ে বলেছে যে মুহাম্মদের(সঃ) কোনও রাজনৈতিক ভূমিকা নেই, বরং তিনি একজন *নাজির*, "সতর্ককারী"[৯] মাত্র, কিন্তু যে ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নির্দেশ লাভের দাবী করছেন, তিনি কতক্ষণ তাদের মত সাধারণ মরণশীলদের শাসন মেনে চলবেন?

দ্রুত অবনতি ঘটে সম্পর্কের। আবু জাহ্‌ল মুহাম্মদের(সঃ) ক্ল্যানের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করেন, মুসলিমদের সঙ্গে কুরাইশদের ব্যবসা বা বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি। এর মানে ছিল কেউই তাদের কাছে খাদ্য বিক্রি করতে পারবে না। দু'বছর স্থায়ী ছিল অবরোধ, এবং খাদ্যাভাবই হয়ত মুহাম্মদের(সঃ) প্রাণপ্রিয় স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল আর এর ফলে নির্ঘাৎ কয়েকজন মুসলিম আর্থিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। ইসলাম গ্রহণকারী ক্রীতদাসরা বিশেষভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল, বেঁধে কড়া রোদে ফেলে রাখা হত তাদের। সবচেয়ে মারাত্মক, ৬১৯-এ অবরোধ উঠে যাওয়ার পর মুহাম্মদের(সঃ) চাচা এবং আশ্রয়দাতা (*ওয়ালি*) আবু তালিব মারা যান। মুহাম্মদ(সঃ) এতীম ছিলেন, শৈশবেই তাঁর পিতা-মাতা পরলোকগমন করেছিলেন। আরবের কঠোর প্রতিহিংসা-মতবাদ অনুযায়ী হত্যার বদলা নেয়ার মত আশ্রয়দাতা না থাকলে যে কাউকে শাস্তির ভয় ছাড়াই হত্যা করা যেত। মক্কার কোনও চীফটেইনকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পেতে কঠিন সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল মুহাম্মদকে(সঃ)। মক্কায় *উম্মাহ্‌র* অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ছিল, একটা নতুন সমাধান খুঁজে বের করা হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য।

সুতরাং মুহাম্মদ(সঃ) মক্কার আনুমানিক ২৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত কৃষিভিত্তিক বসতি ইয়াসরিব থেকে আগত গোত্রপ্রধানদের বক্তব্য শুনতে প্রস্তুত হলেন। বেশ কয়েকটি গোত্র যাযাবর জীবন ত্যাগ করে বসতি গড়েছিল সেখানে, কিন্তু মরুপ্রান্তরের কয়েক শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের পর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। গোটা বসতি একের পর এক ভয়ঙ্কর বিবাদে জড়িয়ে পড়ছিল। এসব গোত্রের কোনও কোনওটি জুডাইজমে দীক্ষা নিয়েছিল কিংবা ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিল। সুতরাং, ইয়াসবিরের জনগণ একেশ্বরবাদী ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিল, তারা প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিল না: এছাড়া, একটা নতুন সমাধান পেতে মরিয়া হয়ে ছিল তারা যাতে তাদের জাতি একটি মাত্র গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে

একসঙ্গে বাস করতে পারে। ৬২০ এর *হজ্জের* সময় ইয়াসরিব থেকে আগত প্রতিনিধিদল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং মুসলিমদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়: উভয়পক্ষ শপথ নেয় যে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা করবে। পরবর্তীকালে, ৬২২-এ মুসলিম পরিবারগুলো একে একে পালিয়ে ইয়াসরিবে অভিবাসন (*হিজরা*) করে। নতুন আশ্রয়দাতা সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করায় মুহাম্মদ(সঃ) প্রাণ হারাতে হারাতে আবু বকরকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

হিজরা থেকে মুসলিমদের বর্ষ গণনা শুরু হয়েছে, কারণ এই পর্যায়ে এসে মুহাম্মদ(সঃ) কুরানের আদর্শ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হন এবং ইসলাম ইতিহাসের একটা উপাদানে পরিণত হয়। এটা ছিল এক বিপ্লবী পদক্ষেপ। *হিজরা* কেবল ঠিকানা পরিবর্তন ছিল না। প্রাক-ইসলামী আরবে গোত্রের পবিত্র মূল্য ছিল। রক্ত-সম্পর্কিতদের ত্যাগ করে অন্য গোত্রে যোগদানের কথা ছিল অশ্রুতপূর্ব; এটা আবশ্যকীয়ভাবেই ব্লাসফেমাস কর্মকাণ্ড এবং কুরাইশরা এই পক্ষত্যাগ ক্ষমা করতে পারেনি। তারা ইয়াসরিবের *উম্মাহ*কে নিশ্চিহ্ন করার শপথ নেয়। মুহাম্মদ(সঃ) রক্ত নয় বরং আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া গোত্রীয় দলের প্রধান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আরবীয় সমাজে যা ছিল এক বিস্ময়কর উদ্ভাবন। কুরানের ধর্ম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা হয়নি, কিন্তু মুসলিম, পৌত্তলিক এবং ইহুদিদের সকলে একমাত্র *উম্মাহ*র সদস্য ছিল, পরস্পরকে আক্রমণ করতে পারত না তারা, পরস্পরকে আশ্রয় দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। এই অসাধারণ নতুন "অতিগোত্রে"র (Supertribe) সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং যদিও গোড়ার দিকে এটা টিকে থাকবে বলে মনে করেনি কেউ, কিন্তু এটা একটা অনুপ্রেরণা বলে প্রমাণিত হয়েছে যা *হিজরার* দশ বছর পর, ৬৩২-এ পয়গম্বরের পরলোকগমনের আগে আরবে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল।

ইয়াসরিব মদীনা (নগরী) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, কারণ এটা প্রকৃত মুসলিম সমাজের আদর্শ রূপ ধারন করে। মদীনায় পৌছার পর মুহাম্মদের(সঃ) প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল একটা সাধারণ *মসজিদ* (আক্ষরিক অর্থে সেজদার স্থান) নির্মাণ করা। একটা কর্কশ ভবন ছিল এটা যা প্রাথমিক ইসলামী আদর্শের কৃচ্ছ্রতা প্রকাশ করে। গাছের কাণ্ডের ওপর বসানো হয়েছিল ছাদ, একটা পাথর খণ্ড *কিবলাহ* (প্রার্থনার দিক) নির্দেশ করত এবং ধর্ম প্রচারের জন্য একটা গাছের গুড়িতে দাঁড়াতেন পয়গম্বর। ভবিষ্যতের সকল মসজিদ যতদূর সম্ভব এই মডেল অনুসারে নির্মিত হয়েছে। একটা উঠানও ছিল, যেখানে মুসলিমরা *উম্মাহ*র সকল সমস্যা–সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক, ধর্মীয়– নিয়ে আলোচনায় মিলিত হত। উঠানের সীমান্তে ছোট ছোট কুটিরে বাস করতেন মুহাম্মদ(সঃ) এবং তাঁর স্ত্রীগণ। ক্রিশ্চান চার্চের বিপরীতে, যা জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এবং যা কেবল উপাসানার জন্যই নির্বেদিত, মসজিদে কোনও কিছুই নিষিদ্ধ ছিল না। কুরানের দর্শনে পবিত্র-অপবিত্র, ধর্মীয়-রাজনৈতিক, যৌনতা-উপাসনার মাঝে

কোনও বিভাজন নেই। সমগ্র জীবনই মূলত: পবিত্র এবং স্বর্গের চৌহদ্দির মধ্যে আনতে হয়েছিল তাকে। লক্ষ্য ছিল *তাওহীদ* (একক করা), গোটা জীবনকে একটি একীভূত গোষ্ঠীতে পরিণত করা, যা মুসলিমদের একত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের সংবাদ দেবে।

মুহাম্মদের(স:) অসংখ্য স্ত্রী পাশ্চাত্যে যথেষ্ট বিকৃত কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু পয়গম্বর ইন্দ্রিয় সুখে নিমজ্জিত ছিলেন কল্পনা করা ভুল হবে, যেমনটি পরবর্তী কালের কিছু ইসলামী শাসক হয়েছিলেন। মক্কায় একগামী ছিলেন মুহাম্মদ(স:), কেবল খাদিজাকে বিয়ে করেছিলেন, যদিও বহুগামিতা আরবে খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। খাদিজা বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁকে অন্তত ছ'টি সন্তান উপহার দিয়েছেন তিনি, যাদের মধ্যে মাত্র চারজন কন্যা জীবিত ছিলেন। মদীনায় মুহাম্মদ(স:) একজন মহান *সায়ীদ* (প্রধান)-এ পরিণত হন, তাঁর একটা বিশাল হারেম থাকবে বলে প্রত্যাশিত ছিল সবার, কিন্তু এসব বিয়ের অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত। নিজস্ব অভিগোত্র গঠন করার সময় তিনি তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন, যাতে তাদের আরও কাছাকাছি আনা যায়। তাঁর প্রিয়তমা নতুন স্ত্রী আয়েশা ছিলেন আবু বকরের মেয়ে; তিনি উমর ইবন আল-খাত্তাবের মেয়ে হাফসাকেও বিয়ে করেছিলেন। নিজের দুই মেয়েকে তিনি উসমান ইবন আফফান এবং আলী ইবন আবি তালিবের সঙ্গে বিয়ে দেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রীদের বেশীরভাগই ছিলেন বয়স্কা নারী, যাদের আশ্রয়দাতা ছিল না বা যা সেইসব গোত্রের প্রধানদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন যে গোত্রগুলো উম্মাহ্‌র মিত্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের কেউই পয়গম্বরের কোনও সন্তান ধারন করেননি।[১০] তাঁর স্ত্রীগণ মাঝে মাঝে আনন্দের চেয়ে বরং সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। একবার যখন তাঁরা এক হামলার পর লুণ্ঠিত মাল বন্টন নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন, পয়গম্বর তাঁদের সবাইকে ত্যাগ করার হুমকি দিয়েছিলেন, যদি না তাঁরা কঠোরভাবে ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনযাপন করেন।[১১] কিন্তু তারপরেও একথা সত্যি যে মুহাম্মদ(স:) ছিলেন সেইসব বিরল মানুষদের একজন যাঁরা প্রকৃতই নারীসঙ্গ উপভোগ করেন। তাঁর পুরুষ সহচরদের কেউ কেউ স্ত্রীদের প্রতি তাঁর কোমল আচরণ আর যেভাবে তাঁরা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাল্টা জবাব দিতেন, দেখে বিস্মিত হয়েছেন। মুহাম্মদ(স:) সুবিবেচকের মত তাঁদের কাজ-কর্মে সাহায্য করতেন, নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন তিনি এবং স্ত্রীদের সঙ্গ খুঁজে বেড়াতেন। প্রায়ই স্ত্রীদের কাউকে না কাউকে নিয়ে অভিযানে বের বের হতেন তিনি, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তাঁদের পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। একবার তাঁর সবচেয়ে বুদ্ধিমতী স্ত্রী উম্ম সালামাহ্ এক বিদ্রোহ ঠেকাতে সাহায্য করেছিলেন।

নারী মুক্তির প্রয়াস ছিল পয়গম্বরের হৃদয়ের অংশ। পাশ্চাত্যের নারীদের বহু শতাব্দী আগেই কুরান মহিলাদের সম্পদের উত্তরাধিকার এবং স্বামী বিচ্ছেদের

ক্ষমতা দিয়েছে। কুরান পয়গম্বরের স্ত্রীগণের নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতা ও পর্দার কথা বলেছে, কিন্তু কুরানে এমন কিছু নেই যা সকল নারীর জন্য পর্দার আবশ্যকতা বা তাদের বাড়ির আলাদা অংশে বিচ্ছিন্ন রাখার কথা বলে। পয়গম্বরের পরলোকগমনের প্রায় তিন কি চার প্রজন্ম পরবর্তী সময়ে এই রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলিমরা সেই সময় বাইযানটিয়ামের গ্রিক ক্রিশ্চানদের অনুকরণ করছিল, যারা তাদের মহিলাদের এভাবে দীর্ঘ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখত; তারা তাদের ক্রিশ্চান নারী বিদ্বেষও খানিকটা আয়ত্ত করেছিল। কুরান নারী-পুরুষকে ঈশ্বরের সামনে অংশীদার বানিয়েছে, যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য একই রকম।[১২] কুরান বহুগামিতাকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এসেছে এমন এক সময়ে যখন মুসলিমরা মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারাচ্ছিল এবং যার ফলে নারীরা আশ্রয়হীনা হয়ে পড়েছিল; পুরুষদের চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়, যদি তারা সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারে এবং কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখায়।[১৩] মদীনায় প্রথম উম্মাহ্‌র নারী সদস্যারা প্রকাশ্য জীবনে পুরোপুরি অংশ নিয়েছে এবং কেউ কেউ আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রণক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধও করেছে। তারা ইসলামকে নিপীড়নমূলক ধর্ম বলে মনে করেছিল বলে মনে হয় না। যদিও পরবর্তীকালে, ক্রিশ্চান ধর্মের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে, পুরুষরা ধর্মবিশ্বাসকে ছিনতাই করে এবং একে বিরাজিত পুরোহিত তন্ত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

মদীনার প্রাথমিক বছরগুলোতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে। মুহাম্মদ(সঃ) ইহুদি গোত্রগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সম্ভাবনায় দারুণ উত্তেজিত ছিলেন এবং এমনকি, *হিজরার* অব্যবহিত আগে কিছু কিছু রেওয়াজ (যেমন শুক্রবার অপরাহ্নে সমবেত প্রার্থনা, এসময় ইহুদিরা সাবাথের প্রস্তুতি গ্রহণ করত এবং ইহুদি প্রায়শ্চিত্ত দিবসে উপবাস পালন করত) যোগ করেন যাতে ইসলামকে আরও বেশী জুডাইজমের সঙ্গে মেলানো যায়। মদীনার ইহুদিরা যখন তাঁকে সত্য পয়গম্বর হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল, জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। ইহুদিদের কাছে পয়গম্বরত্বের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং মুহাম্মদকে(সঃ) স্বীকার করে নিতে না চাওয়াটা তাদের পক্ষে বিস্ময়কর ছিল না। তবে মদীনাবাসী ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ কুরানের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে যা দেখায় যে ব্যাপারটি মুহাম্মদকে(সঃ) উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল। নোয়াহ্ ও মোজেসের মত পয়গম্বরদের কাহিনী বাইবেলের তুলনায় ভিন্নভাবে কুরানে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব বিবরণ যখন মসজিদে আবৃত্তি করা হত তখন ইহুদিরা বিদ্রূপ করত। ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে প্রধান তিনটি গোত্র মুহাম্মদের(সঃ) উত্থানে বিক্ষুব্ধ ছিল, বসতিতে তাঁর আগমনের আগে একটা শক্তিশালী জোট গড়ে তুলেছিল তারা, এখন তারা নিজেদের অপদস্থ ভেবে মুহাম্মদকে(সঃ) অপসারণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ল্যানগুলোর কোনও কোনও ইহুদি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, তারা ইহুদি ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে মুহাম্মদের(স:) জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তোলে। বুক অভ জেনেসিসে অব্রাহামের দুই পুত্র: ইসহাক ও ইশমায়েল (আরবীতে যাঁর নাম ইসমায়েল হয়েছে), উপপত্নী হ্যাগারের (হাজেরা) সন্তান ছিলেন জানতে পেরে দারুণ খুশি হয়েছিলেন তিনি। হ্যাগার এবং ইসমায়েলকে বিরান প্রান্তরে নির্বাসন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন অব্রাহাম, কিন্তু ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসমায়েলও এক মহান জাতি-আরবদের পিতা হবেন।[১৪] স্থানীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী সবাই জানত যে হ্যাগার এবং ইসমায়েল মক্কায় বসতি করেছিলেন আর অব্রাহাম সেখানে তাদের দেখতে এসেছেন এবং অব্রাহাম ও ইসমায়েল মিলিতভাবে কাবাহ্ (যা আদিতে অ্যাডাম নির্মাণ করেছিলেন–কিন্তু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল) নির্মাণ করেন।[১৫] মুহাম্মদের(স:) কাছে একাহিনী অসাধারণ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে আরবরা আসলে স্বর্গীয় পরিকল্পনা হতে বাদ পড়েনি এবং কাবাহ্র শ্রদ্ধা করার মত একেশ্বরবাদী পরিচয় রয়েছে।

৬২৪ সাল নাগাদ এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে মদীনার সংখ্যা গরিষ্ঠ ইহুদি কখনওই পয়গম্বরের সঙ্গে সমন্বয়ে আসবে না। মুহাম্মদও(স:) একথা জানতে পেরে হতাশ হয়েছিলেন যে ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের (যাদের তিনি একই ধর্ম বিশ্বাসের ধারক ধরে নিয়েছিলেন) মাঝে আসলে তীব্র ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে, যদিও তাঁর এমন ধারণা জন্মেছিল বলে মনে হয় যে, সকল *আহল আল-কিতাব* এই অমর্যাদাকর বিভেদ স্বীকার করে না। জানুয়ারি ৬২৪-এ তিনি এমন এক সিদ্ধান্ত নেন যা ছিল তাঁর অন্যতম সৃজনশীল কর্ম। *সালাত* প্রার্থনার সময় গোটা জমায়েতকে তিনি উল্টোদিকে ঘোরার আদেশ দেন, ফলে জেরুজালেমের পরিবর্তে মক্কার দিকে ফিরে প্রার্থনা করে তারা। তাঁর *কিবলাহ্র* এই পরিবর্তন ছিল স্বাধীনতা ঘোষণা। জেরুজালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে কাবাহ্র দিকে, যার সঙ্গে জুডাইজম বা ক্রিশ্চানটির কোনওই সম্পর্ক ছিল না, ঘোরার মাধ্যমে মুসলিমরা নীরবে দেখিয়ে দিয়েছিল যে তারা অব্রাহামের খাঁটি এবং আদি একেশ্বরবাদের দিকে ফিরে যাচ্ছে, যিনি তোরাহ্ কিংবা গসপেলের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগেই জীবনযাপন করে গেছেন, ঈশ্বরের ধর্ম বিভিন্ন বিবদমান গোত্রে ভাগ হওয়ার আগের সময় সেটা।[১৬] মুসলিমরা একমাত্র ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত হবে: স্বয়ং ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কোনও মানব সৃষ্ট ব্যবস্থা বা কোনও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করা বহুঈশ্বরবাদীতা:

> অবশ্য যারা ধর্ম সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নয়... বলো, "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে পরিচালিত করেছেন সরল পথে, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মে– একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের সমাজে, আর সে তো অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" বলো, "আমার

নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।"[১৭]

কিবলাহ্র পরিবর্তন আরব মুসলিমদের, বিশেষ করে অভিবাসী, যারা মক্কা থেকে মদীনায় *হিজরা* করেছিল, তাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে। মুসলিমরা আর অসহায়ের মত ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের পেছনে ঘুরবে না, যারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে বিদ্রূপ করে; বরং ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার জন্যে নিজস্ব পথ বেছে নেবে।

দ্বিতীয় প্রধান ঘটনাটি ঘটে *কিবলাহ্* পরিবর্তনের অল্প কিছুদিন পরেই। মুহাম্মদ(স:) এবং মক্কা থেকে আগত অভিবাসীদের মদীনায় জীবিকা নির্বাহের কোনও উপায় ছিল না; কৃষিকাজ করার মত পর্যাপ্ত জমি ছিল না তাদের জন্য; তাছাড়া তারা ছিল বণিক ও ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী নয়। *আনসার* (সাহায্যকারী) হিসাবে পরিচিত মদিনাবাসীদের পক্ষে তাদের বিনে পয়সায় বহন করে চলা সম্ভব ছিল না, ফলে অভিবাসীরা *ঘাযু* বা হানা'র আশ্রয় গ্রহণ করে, যা ছিল আরবের জাতীয় ক্রীড়ার মত, আবার একই সঙ্গে সেটা ছিল অপর্যাপ্ত সম্পদের দেশে সম্পদ পুনঃবন্টনের কর্কশ এবং প্রচলিত উপায়। হানা পরিচালনাকারী দল প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও গোত্রের ক্যারাভান বা দলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে মালামাল ও গবাদি পশু ছিনিয়ে নিত, তবে খেয়াল রাখত যেন কেউ প্রাণ না হারায়, কেননা সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ উৎসাহিত হতে পারে। মিত্র বা "ক্লায়েন্ট"-এ (অধিকতর শক্তিশালী গোত্রগুলোর নিরাপত্তাকাঙ্ক্ষী দুর্বলতর গোত্র) পরিণত গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা নিষিদ্ধ ছিল। কুরাইশদের হাতে নির্যাতিত এবং দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া অভিবাসীরা ধনী মক্কান ক্যারাভান সমূহের ওপর *ঘাযু* পরিচালনা শুরু করে, যার ফলে অর্থের সমাগম ঘটে তাদের, কিন্তু আপন গোত্রের বিরুদ্ধে *ঘাযু* পরিচালনা ছিল অতীতের মারাত্মক লঙ্ঘন। হানা পরিচালনাকারী দলগুলো কিছু প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেছিল, কিন্তু মার্চ ৬২৪-এ মুহাম্মদ(স:) সেবছরের একটা বিরাট মক্কান ক্যারাভানকে কব্জা করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে উপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই দুঃসহসের খবর পেয়ে কুরাইশরা ক্যারাভান রক্ষা করার জন্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায়ও বদর কূপের কাছে মুসলিমরা কুরাইশদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। যদিও মক্কাবাসীরা সংখ্যার দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল, তারা বেপরোয়া সাহসিকতা দেখিয়ে প্রাচীন আরবীয় কায়দায় যুদ্ধ করে প্রত্যেক সর্দার তার নিজস্ব দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। কিন্তু মুহাম্মদের(স:)-এর বাহিনীকে সযত্নে প্রস্তুত করা হয় এবং তারা তাঁর একক নির্দেশের অধীনে লড়াই করে। এই কায়দাটি বেদুইন গোত্রগুলোকে অভিভূত করে, তাদের কেউ কেউ শক্তিশালী কুরাইশদের নতি স্বীকারের দৃশ্য উপভোগও করেছে।

এরপর *উম্মাহ্র* জন্যে কঠিন সময় নেমে আসে। মদীনায় কিছু সংখ্যক পৌত্তলিকের সঙ্গে বৈরিতা মেনে নিয়ে চলতে হচ্ছিল মুহাম্মদ(স:)কে, এরা নবাগত

মুসলিমদের ক্ষমতায় অসন্তুষ্ট ছিল এবং বসতি থেকে তাদের উৎখাতে বদ্ধপরিকর ছিল। মক্কার সঙ্গেও যুঝতে হচ্ছিল তাঁকে, আবু সুফিয়ান সেখান থেকে তখন যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, তিনি মদীনায় বাসরত মুসলিমদের বিরুদ্ধে দুদুটো আক্রমণ শানিয়েছিলেন। উম্যাহ্‌কে কেবল যুদ্ধ পরাজিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সমগ্র মুসলিম গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছেন তিনি। মরুভূমির কঠিন নীতিমালা অনুযায়ী যুদ্ধে মাঝামাঝি বলে কোনও সমাধান ছিল না: সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিজয়ী গোত্র প্রধান শত্রুপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন বলেই ধরে নেয়া হয়; সুতরাং, উম্যাহ্‌ পুরোপুরি অস্তিত্ব হারানোর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। ৬২৫-এ উহুদের যুদ্ধে মক্কা উম্যাহ্‌র উপর মারাত্মক পরাজয় চাপিয়ে দেয়, কিন্তু এর দুবছর পর মুসলিমরা মক্কাবাসীদের পরিখার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। পরিখার যুদ্ধ নাম হবার কারণ মুহাম্মদ(স:) মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করে বসতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কুরাইশরা তখনও যুদ্ধকে বরং বীরত্বব্যাঞ্জক খেলা হিসাবেই বিবেচনা করত, এধরনের অসমর্থনযোগ্য কৌশলের কথা তাদের কাছে অশ্রুতপূর্ব ছিল, ফলে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল তারা এবং তাদের অশ্বারোহী বাহিনী অকেজো হয়ে পড়ে। সংখ্যার দিক থেকে শক্তিশালী কুরাইশদের বিরুদ্ধে (মক্কাবাসীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার আর মুসলিমরা ছিল তিন হাজার) মুহাম্মদের(স:) দ্বিতীয় বিজয় ছিল বাঁক পরিবর্তনকারী ঘটনা। যাযাবর গোত্রগুলোর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুহাম্মদ(স:)ই আগামীর নেতা, আর কুরাইশদের মনে হয়েছে বিগত যৌবন। তারা যেসব দেবতার নামে যুদ্ধ করছিল তারা আর তাদের পক্ষে কাজ করছিল না। বহু সংখ্যক গোত্রই উম্যাহ্‌র সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে, এবং মুহাম্মদ(স:) একটি গোত্রীয় শক্তিশালী কনফেডারেসি গড়ে তুলতে শুরু করেন, যার সদস্যরা পরস্পরের ওপর আক্রমণ না চালানো এবং পরস্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছিল। মক্কাবাসীদেরও কেউ কেউ পক্ষ ত্যাগ করে মদীনায় হিজরা শুরু করে; অবশেষে পাঁচ বছরের ভয়ঙ্কর বিপদ-সঙ্কুল সময় পেরিয়ে মুহাম্মদ(স:) আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে উম্যাহ্‌ টিকে থাকবে।

মদীনায় এই মুসলিম সাফল্যের প্রধান বলী ছিল তিন ইহুদি গোত্র কায়নুকাহ্‌, নাদির এবং কুরাঈযাহ্‌, যারা মুহাম্মদকে(স:) ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং স্বাধীনভাবে মক্কার সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলেছিল। শক্তিশালী সেনাদল ছিল তাদের এবং নিঃসন্দেহে মুসলিমদের জন্যে হুমকি স্বরূপ ছিল তারা, কেননা তাদের আবাসিক এলাকার অবস্থান এমন ছিল যে তাদের পক্ষে অনায়াসে আক্রমণকারী মক্কা-বাহিনীর সঙ্গে যোগদান বা পেছন থেকে উম্যাহ্‌কে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। ৬২৫-এ কায়নুকাহ্‌ যখন মুহাম্মদের(স:) বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ বিদ্রোহ পরিচালনা করে, আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী তাদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। নাদির গোত্রকে আক্রান্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন মুহাম্মদ(স:), বিশেষ চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন তাদের সঙ্গে, কিন্তু যখন জানতে পেলেন যে তারাও তাঁকে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করছে,

নির্বাসিত করলেন তাদের। সেখানে তারা নিকটবর্তী খায়বরের ইহুদি বসতির সঙ্গে যোগ দেয় এবং উত্তরাঞ্চলীয় আরব গোত্রগুলোর মাঝে আবু সুফিয়ানের সমর্থন সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। মদীনার বাইরে নাদির আরও বেশী বিপজ্জনক বলে প্রতিভাত হয়, তো পরিশার যুদ্ধে, ইহুদি গোত্র কুরাঈযাহ্ যখন, মুসলিমরা একটা সময়ে পরাজিত হতে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল, মক্কার পক্ষ অবলম্বন করল, মুহাম্মদ(স:) একটুও দয়া দেখাননি। কুরাইযাহ্র সাতশত পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং গোত্রের নারী-শিশুদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়।

কুরাঈয়াহ্র হত্যাকাণ্ড একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কিন্তু তাকে আমাদের বর্তমান সময়ের মানদণ্ডে বিচার করতে যাওয়া ভুল হবে। অত্যন্ত আদিম সমাজ ছিল এটা: মুসলিমরা সবে অস্তিত্বের বিনাশ থেকে রক্ষা পেয়েছে, মুহাম্মদ(স:) যদি কুরাঈয়াহ্কে স্রেফ নির্বাসিত করতেন, তারা খায়বরের ইহুদি প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী করে তুলত, উম্মাহ্র ওপর আরও একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দিত। সপ্তম শতকের আরবে কুরাঈযাহ্র মত বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কোনও গোত্রপতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন, এটা ছিল অপ্রত্যাশিত। হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি খায়বরে এক ভায়াল বার্তা পৌছে দিয়েছিল এবং মদীনায় পৌত্তলিক প্রতিপক্ষকে ক্ষান্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে, কেননা পৌত্তলিক নেতারা বিদ্রোহী ইহুদিদের মিত্র ছিল। জীবন বাঁচানোর যুদ্ধ ছিল এটা, সবারই জানা ছিল যে ঝুঁকি অত্যন্ত ব্যাপক। সংগ্রামের ব্যাপারটি সামগ্রিকভাবে ইহুদিদের প্রতি কোনওরকম বৈরিতার ইঙ্গিত দেয় না, কেবল তিনটি বিদ্রোহী গোত্রের সঙ্গে শত্রুতা বুঝিয়েছে। কুরান ইহুদি পয়গম্বরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ অব্যাহত রাখে এবং ঐশীগ্রন্থধারী জাতিসমূহের প্রতি সম্মান জানানোর তাগিদ দিয়েছে। ছোট ছোট ইহুদি গোত্রগুলো মদীনায় বসবাস অব্যাহত রাখে এবং পরবর্তীকালে ক্রিশ্চানদের মত ইহুদিরাও ইসলামী সাম্রাজ্য সমূহে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে। অ্যান্টি-সেমিটিজম একটা ক্রিশ্চান অভিশাপ। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল সৃষ্টি এবং পরবর্তী সময়ে আরব প্যালেস্টাইন হাতছাড়া হওয়ার পরেই কেবল মুসলিম বিশ্বে ইহুদি বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে মুসলিমরা ইউরোপ থেকে ইহুদি মিথ আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল, *প্রটোকলস অভ দ্য এল্ডার্স অভ যায়ন (Protocal of the Elders of Zion)*-এর মত ভীষণ অ্যান্টি-সেমিটিক রচনার আরবী অনুবাদও করেছে, কারণ তাদের এমন কোনও নিজস্ব ট্র্যাডিশন ছিল না। ইহুদি জাতির প্রতি এই নতুন বৈরিতার কারণে আজকাল কোনও কোনও মুসলিম কুরানের সেইসব অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেয় যেগুলোয় তিন ইহুদি গোত্রের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের(স:) সংঘাতের প্রসঙ্গ আছে–তাদের কুসংস্কার বৈধ প্রমাণ করার জন্য। এইসব পঙক্তিকে প্রাসঙ্গিকতার বাইরে এনে তারা কুরানের বাণী এবং পয়গম্বরের দৃষ্টিভঙ্গি উভয়কেই বিকৃত করে, যাঁর জুডাইজমের প্রতি কোনও ঘৃণাবোধ ছিল না।

কুরাঈশ্যাহ্‌র বিরুদ্ধে মুহাম্মদের(সঃ) নিষ্ঠুরতা পরিকল্পনা করা হয়েছিল সকল বৈরিতার দ্রুততর অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে। কুরান শিক্ষা দেয় যে যুদ্ধ এমন এক বিপর্যয় যে মুসলিমদের অবশ্যই সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে তাদের সাধ্য অনুযায়ী সবরকম কৌশল ব্যবহার করতে হবে।[১৮] আরব পৌন:পুনিকভাবে সহিংস সমাজ ছিল এবং শান্তির লক্ষ্যে উম্যাহ্‌কে যুদ্ধ করতে হয়েছে। মুহাম্মদ(সঃ) পেনিনসূলায় যে ধরনের সামাজিক পরিবর্তন আনার প্রয়াস পাচ্ছিলেন সে ধরনের পরিবর্তন কদাচিৎ রক্তপাত ছাড়া অর্জিত হয়। কিন্তু পরিখার যুদ্ধের পর, মুহাম্মদ(সঃ) যখন মক্কাকে অপদস্থ আর মদীনার প্রতিপক্ষকে দমন করেন, তার ধারণা জন্মে যে *জিহাদ* পরিত্যাগ করে শান্তি প্রয়াস চালানোর সময় হয়েছে। ৬২৮ এর মার্চে তিনি বেশ কিছু বেপরোয়া এবং সৃজনশীল প্রয়াস অবলম্বন করেন যার ফলে সংঘাতের অবসান ঘটে। তিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাবার ঘোষণা দেন এবং সফরসঙ্গী হবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানান। যেহেতু তীর্থযাত্রীদের অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ছিল, মুসলিমদের তাই সরাসরি সিংহের ডেরায় গিয়ে নিজেদের বৈরী এবং ক্ষুব্ধ কুরাইশদের করুণার ওপর ছেড়ে দেয়ার মত একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা। তা সত্ত্বেও আনুমানিক একহাজার মুসলিম পয়গম্বরের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত হয় এবং তারা মক্কার পথে বেরিয়ে পড়েন। তাদের পরনে ছিল হজ্জের ঐতিহ্যবাহী শাদা পোশাক। কুরাইশরা যদি আরবদের কাবাহয় যেতে বাধা দেয় বা প্রকৃত তীর্থযাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে সেটা উপাসনাগৃহের অভিভাবক হিসাবে তাদের পবিত্র দায়িত্বের অমর্যাদা হবে। কুরাইশরা অবশ্য তীর্থযাত্রীদল নগরীর বাইরে সহিংসতা নিষিদ্ধ এলাকায় পৌছার আগেই আক্রমণ চালানোর জন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিল, কিন্তু মুহাম্মদ(সঃ) তাদের এড়িয়ে যান এবং কয়েকটি বেদুঈন মিত্রের সহায়তায় স্যাঙ্কচুয়ারির প্রান্তে পৌছতে সক্ষম হন, হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে ঘটনাপ্রবাহের গতি দেখার অপেক্ষায় থাকেন। শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা এই শান্তিপূর্ণ অবস্থানের চাপে পড়ে উম্যাহ্‌র সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। উভয় পক্ষের জন্যেই অজনপ্রিয় একটা পদক্ষেপ ছিল এটা। মুসলিমদের অনেকেই অ্যাকশনের জন্য ব্যাগ্র ছিল, তারা এই চুক্তিকে লজ্জাকর মনে করেছে, কিন্তু মুহাম্মদ(সঃ) শান্তি পূর্ণ উপায়ে বিজয় অর্জনে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

হুদাইবিয়াহ্‌ ছিল আরেকটি বাঁক বদল। এতে করে বেদুঈনরা আরও অধিক মাত্রায় প্রভাবিত হয় আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটি এক অপরিবর্তনীয় ধারায় পরিণত হয়। অবশেষে ৬৩০-এ কুরাইশরা যখন মুহাম্মদের(সঃ) এক গোত্রীয় মিত্রকে আক্রমণ করার মাধ্যমে চুক্তির লঙ্ঘন করল, দশ হাজার সদস্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন মুহাম্মদ(সঃ)। এই বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হবার পর বাস্তববাদী বলে এর তাৎপর্য বুঝতে পেরে কুরাইশরা পরাজয় মেনে নেয়, খুলে দেয় নগরীর দ্বার এবং বিনা রক্তপাতে মক্কা অধিকার করে নেন

মুহাম্মদ(স:)। তিনি কাবাহর চারপাশের প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করেন, একে একমাত্র ঈশ্বর আল্লাহর নামে আবার নিবেদন করেন; আর প্রাচীন পৌত্তলিক আচার হজ্জকে অব্রাহাম, হ্যাগার ও ইসমায়েলের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত করে একে ইসলামী তাৎপর্য দান করেন। কুরাইশদের কাউকেই মুসলিম হতে বাধ্য করা হয়নি, কিন্তু মুহাম্মদের(স:) বিজয়ে তাঁর বেশীরভাগ নীতিবান প্রতিপক্ষ, যেমন আবু সুফিয়ান, উপলব্ধি করেছিল যে, প্রাচীন ধর্ম ব্যর্থ হয়েছে। ৬৩২-এ মুহাম্মদ(স:) যখন তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী আয়েশার হাতে পরলোকগমন করেন, তখন আরবের প্রায় সকল গোত্র কনফেডারেট বা ধর্মান্তরিত মুসলিম হিসাবে *উম্মাহ্‌র* যোগ দিয়েছে। যেহেতু *উম্মাহ্‌র* সদস্যরা পরস্পরকে আক্রমণ করতে পারে না, সেহেতু গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রতিহিংসা এবং পাল্টা প্রতিহিংসার দুষ্টচক্রের অবসান ঘটেছিল। একক প্রয়াসে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আরবে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন মুহাম্মদ(স:)।

রাশিদুন (৬৩২-৬৬১)

মুহাম্মদের(স:) জীবন ও সাফল্যসমূহ চিরকাল মুসলিমদের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে চলবে। এগুলো "মুক্তি অর্জনে"র ইসলামী অনুভূতি প্রকাশ করে যা কোনও "আদিপাপে'র প্রায়শ্চিত্ত," যা আদম করেছিলেন এবং অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার মধ্যে নয় বরং এমন একটা সমাজ নির্মাণে নিহিত যেখানে মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটে। এটা মুসলিমদের কেবল ইসলামপূর্ব কালে বিরজিত রাজনৈতিক ও সামাজিক নরক থেকেই মুক্তি দেয়নি বরং তাদের এমন একটা প্রেক্ষিত দান করেছে যার আওতায় মুসলিমরা আরও সহজে মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছে, যা তাদের পরিপূর্ণতা দিতে পারে। মুহাম্মদের(স:) ঈশ্বরের কাছে নিখুঁত আত্মসমর্পণের আদর্শ উদাহরণে পরিণত হয়েছেন এবং আমরা দেখব, মুসলিমরা তাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে এই পর্যায়ে উন্নীত হতে চায়। মুহাম্মদ(স:) কখনও অলৌকিক চরিত্র হিসাবে সম্মানিত হননি, কিন্তু তাঁকে আদর্শ মানব (Perfect Man) বলে মনে করা হয়ে থাকে। ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ এমন পরিপূর্ণ ছিল যে তিনি সমাজকে বদলে দিয়েছিলেন এবং আরবদের একসঙ্গে বসবাসে সক্ষম করে তুলেছিলেন। উৎপত্তিগতভাবে *ইসলাম* শব্দটিকে *সালাম* (শান্তি)র সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই প্রাথমিক বছরগুলোর ইসলাম প্রকৃতই ঐক্য এবং সমন্বয়কে উৎসাহিত করেছিল।

কিন্তু মুহাম্মদ(স:) এই সাফল্য অর্জন করেছিলেন এক ঐশী প্রত্যাদেশের গ্রহীতা হিসাবে। তাঁর জীবদ্দশায় ঈশ্বর তাঁকে বাণী পাঠিয়েছেন যার মাধ্যমে কুরান সৃষ্টি হয়েছে। যখনই মুহাম্মদ(স:) কোনও সঙ্কট বা দ্বিধার মুখোমুখি হয়েছেন, নিজের গভীরে প্রবেশ করেছেন তিনি এবং ঐশ্বরিক প্রেরণা সঙ্গত সমাধান শ্রবণ করেছেন। এই দিক দিয়ে তাঁর জীবন দুর্জ্ঞেয় সত্তা আর পার্থিব জগতের ভীষণ বিভ্রান্তিকর ও বিব্রতকারী ঘটনাপ্রবাহের মাঝে অব্যাহত সংলাপের পরিচয় তুলে ধরে। সুতরাং, কুরান সাধারণ মানুষের জীবন ও চলতি ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করেছে, রাজনীতিতে ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনা আর আলো যোগ করেছে। কিন্তু মুহাম্মদের(স:) উত্তরাধিকারীগণ পয়গম্বর ছিলেন না, বরং তাঁদের নিজস্ব মানবীয় অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। কীভাবে তাঁরা নিশ্চিত করবেন যে মুসলিমরা এই পবিত্র আদেশের প্রতি সৃজনশীলতার সঙ্গে সরাসরি সাড়া দান অব্যাহত রাখবে? তাদের

শাসিত *উম্মাহ্‌র* আকার আরও বড় হবে এবং মদীনার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির তুলনায় ক্রমবর্ধমানহারে জটিল হয়ে উঠবে। মদীনায় সবাই সবাইকে চিনত, সেখানে অফিস-আদালত আর আমলাতান্ত্রিকতার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। মুহাম্মদের(স:) নতুন ডেপুটিরা (*খলিফাহ্‌*) সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রথম *উম্মাহ্‌র* মূলধারা কীভাবে বজায় রাখবেন।

মুহাম্মদের(স:) উত্তরাধিকারী প্রথম চারজন *খলিফাহ্‌* এইসব কঠিন প্রশ্ন দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন। তাঁরা পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সহচরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মক্কা ও মদীনায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা *বাশিদুন*, সঠিকপথে পরিচালিত খলিফাহ্‌ হিসাবে পরিচিত, তাঁদের শাসনকাল ছিল স্বয়ং পয়গম্বরের সময়ের মতই গঠনমূলক। মুসলিমরা এই সময় কালের উন্মাতাল, মহীয়ান আর করুণ ঘটনাবলীর পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে নিজেদের সংজ্ঞায়িত করবে আর নিজস্ব থিয়োলজি গড়ে তুলবে।

পয়গম্বরের পরলোকগমনের পর নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের *উম্মাহ্‌র* প্রকৃতি কি হওয়া উচিত সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কেউ কেউ হয়ত বিশ্বাস করেনি যে আরবে যার নজীর নেই এমন একটা "রাষ্ট্র", প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন আছে। কেউ কেউ মনে করেছে যেন প্রত্যেক গোত্রীয় গ্রুপের নিজস্ব *ইমাম* (নেতা) নির্বাচন করা উচিত। কিন্তু পয়গম্বরের সহচর আবু বকর এবং উমর ইবন আল-খাত্তাব যুক্তি দেখালেন যে, *উম্মাহ্‌কে* অবশ্যই একটি একাবদ্ধ সমাজ হতে হবে এবং পয়গম্বরের অধীনে যেমন ছিল, একজন মাত্র শাসক থাকতে হবে এর। কারও কারও বিশ্বাস ছিল যে মুহাম্মদ(স:) তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয় আলী ইবন আবি তালিবকে উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখতে চাইতেন। আরবে, যেখানে রক্তের সম্পর্ক ছিল পবিত্র, এটা মনে করা হত যে গোত্রপতির গুণাবলী তাঁর উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় এবং কোনও কোনও মুসলিমের বিশ্বাস ছিল যে আলী মুহাম্মদের(স:) বিশেষ কারিশমার কোনও অংশ বহন কচ্ছেন। কিন্তু যদিও আলীর ধার্মিকতা প্রশ্নাতীত ছিল, কিন্তু তিনি তখনও তরুণ এবং অনভিজ্ঞ; সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আবু বকর পয়গম্বরের প্রথম *খলিফাহ্‌* নির্বাচিত হন।

আবু বকরের শাসনামল (৬৩২-৩৪) ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ সঙ্কটময়। তাঁকে প্রধানত তথাকথিত *রিদ্দাহ্‌* (ধর্মত্যাগ)র যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছিল, বিভিন্ন গোত্র *উম্মাহ্‌* থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের সাবেক স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিল তখন। অবশ্য একে ব্যাপক ধর্মীয় পক্ষত্যাগের ঘটনা হিসাবে দেখা ভুল হবে। বিদ্রোহের ঘটনাগুলো একেবারেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছিল। ইসলামী কনফেডারেসিতে যোগ দেয়া বেশীরভাগ বেদুঈন গোত্রেরই মুহাম্মদের(স:) ধর্মের বিস্তারিত নিয়মকানুনে আগ্রহ ছিল না। বাস্তববাদী পয়গম্বর বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর গঠিত অনেক মৈত্রীই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, আরবীয় মরুপ্রান্তরে যেমন রেওয়াজ ছিল সে অনুযায়ী একজন গোত্রপতি আরেকজনের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। কোনও

কোনও গোত্রপতি এটা মনে করে থাকতে পারেন যে তাঁদের চুক্তি কেবল মুহাম্মদের(স:) সঙ্গে ছিল, উত্তরাধিকারীর সঙ্গে নয় এবং তাঁর পরলোকগমনের পর তাদের *উম্মাহ*র বিভিন্ন গোত্রের ওপর হামলা চালানোয় আর বাধা নেই. এইভাবে তারা নিজেদের ওপর পাল্টা আঘাত আহ্বান করেছিল।

এটা অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ যে বিদ্রোহীদের অনেকেই তাদের বিদ্রোহকে ধর্মীয় সিদ্ধতা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল; নেতারা প্রায়শ: নিজেদের পয়গম্বর দাবী করেছেন এবং কুরানের স্টাইলে "প্রত্যাদেশ" খাড়া করেছেন। আরবরা একটা গভীর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। আমাদের আধুনিককালের অর্থ অনুযায়ী এটা "ধর্মীয়" ছিল না, কেননা অনেকের কাছেই এটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার ছিল না, অন্তরের দীক্ষা অনুসরণ করেনি তারা। পয়গম্বর পুরনো ছাঁচ ভেঙে ফেলেছিলেন এবং আকস্মিকভাবে– সাময়িক হলেও– আরবরা প্রথমবারের মত নিজেদের লাগাতার শক্তি হ্রাসকারী যুদ্ধ-বিগ্রহের ভার হতে মুক্ত একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজের সদস্য হিসাবে আবিষ্কার করেছিল। মুহাম্মদের(স:) সংক্ষিপ্ত শাসনকালে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন ধারার আস্বাদ পেয়েছিল, এক ধর্মীয় পরিবর্তন দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল। ঘটে যাওয়া ঘটনাটি এত বিহবলকারী ছিল যে এমনকি যারা উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছে তারাও পয়গম্বরীয় ধারাতেই চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল। সম্ভবত: *রিদ্দাহ* যুদ্ধ চলার সময়ই মুসলিমরা এই সব *রিদ্দাহ* পয়গম্বরদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে ধারণা করতে শুরু করে যে মুহাম্মদ(স:) ছিলেন শেষ এবং মহানবী, যে দাবী কুরানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

প্রজ্ঞা ও ক্ষমাপ্রদর্শনের মাধ্যমে আবু বকর এইসব বিদ্রোহ প্রশমিত করেছেন এবং আরবের ঐক্যপ্রয়াস শেষ করেছেন। তিনি বিদ্রোহীদের অভিযোগ সৃজনশীলতার সঙ্গে সমাধান করেছেন। যারা প্রত্যাবর্তন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কেউ কেউ আশপাশের এলাকায় লোভনীয় *ঘায়ু* হামলায় অংশ নেয়ার সম্ভাবনা দেখে ফিরে এসেছিল– দ্বিতীয় খলিফাহ উমর ইবন আল-খাত্তাবের (৬৩৪-৪৪) শাসনামলে যা নাটকীয় গতি পায়। এসব হামলা ছিল পেনিনসুলায় প্রতিষ্ঠিত নয়া ইসলামী শান্তি থেকে উদ্ভূত এক সমস্যার প্রতি সাড়া বিশেষ। শত শত বছর ধরে আরবরা তাদের সম্পদের প্রয়োজন মিটিয়ে এসেছিল *ঘায়ুর* মাধ্যমে, কিন্তু ইসলাম এর অবসান ঘটিয়েছিল, কারণ উম্মাহর গোত্র সমূহের পরস্পরের ওপর হামলা চালানোর অনুমোদন ছিল না। *ঘায়ুর* বিকল্প কী হবে যা মুসলিমদের সামান্য জীবীকা সংগ্রহে সক্ষম করে তুলবে? উমর অনুধাবন করেছিলেন যে, উম্মাহর শৃঙ্খলা প্রয়োজন। আইন-বিরোধী উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে এবং যে শক্তি এতদিন যাবৎ হানাদারি যুদ্ধ বিবাদে ব্যয়িত হয়েছে তাকে এবার একটি সাধারণ কর্মধারায় চালিত করতে হবে। স্পষ্ট সমাধান ছিল প্রতিবেশী দেশসমূহের অমুসলিম গোষ্ঠীগুলোর ওপর *ঘায়ু* হামলা পরিচালনা করা। উম্মাহর ঐক্য বাইরের দিকে পরিচালিত আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডের

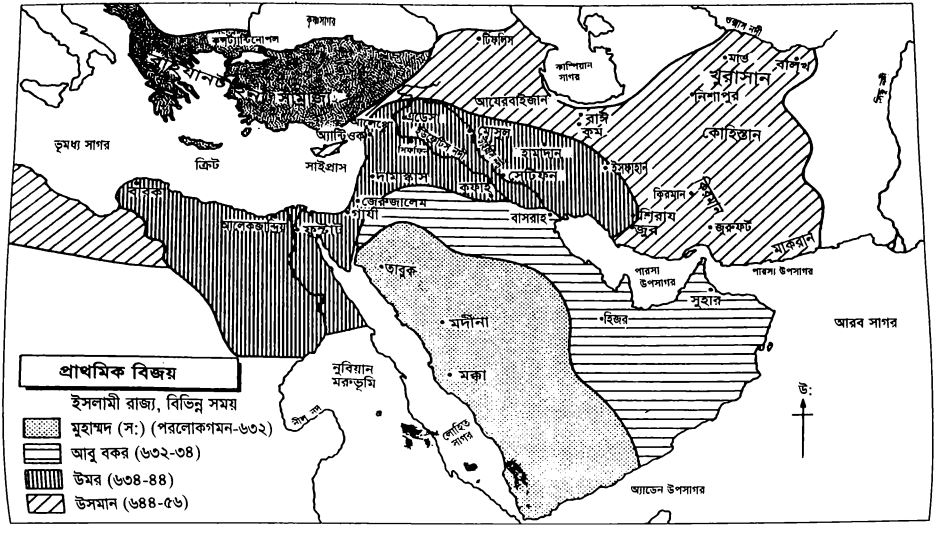

প্রাথমিক বিজয়
ইসলামী রাজ্য, বিভিন্ন সময়
মুহাম্মদ (স:) (পরলোকগমন-৬৩২)
আবু বকর (৬৩২-৩৪)
উমর (৬৩৪-৪৪)
উসমান (৬৪৪-৫৬)
ভূমধ্য সাগর
ক্রিট
সাইপ্রাস
কৃষ্ণসাগর
কনস্ট্যান্টিনোপল
টিফলিস
কাস্পিয়ান সাগর
আযেরবাইজান
খুরাসান
নিশাপুর
বাল্‌খ
কোহিস্তান
ইস্পাহান
কিরমান
শিরায
জুর
জুরুফট
মাকরান
পারস্য উপসাগর
হামাদান
মোসুল
কুফাহ
বাসরাহ
অ্যান্টিওক
দামাস্কাস
জেরুজালেম
গাযা
আলেকজান্দ্রিয়া
বারকা
তাবুক
মদীনা
মক্কা
হিজর
সুহার
আরব সাগর
নুবিয়ান মরুভূমি
লোহিত সাগর
অ্যাডেন উপসাগর
উ:

মাধ্যমে রক্ষিত হবে। এতে খলিফাহ্‌র কর্তৃত্বও বৃদ্ধি পাবে। আরবরা ঐতিহ্যগতভাবে রাজতন্ত্র অপছন্দ করত আর রাজকীয় আচরণ প্রদর্শনকারী যেকোনও শাসকের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করত। কিন্তু তারা সামরিক অভিযানের সময় বা নতুন কোনও চারণ ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রায় গোত্রপতির কর্তৃত্ব মেনে নিত। সুতরাং উমর নিজেকে *আমির আল-মুমীনিন* (বিশ্বাসীদের নেতা) বলে আখ্যায়িত করেন, ফলে গোটা উম্মাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিমরা তাঁর নির্দেশ বা সমাধান মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে এমন বিষয়ের সিদ্ধান্ত মানেনি।

তো উমরের নেতৃত্বে আরবরা লাগাতার বিস্ময়কর বিজয় অর্জনের ভেতর দিয়ে ইরাক, সিরিয়া এবং মিশরে হাজির হয়েছিল। কাদিসিয়াহ্‌র যুদ্ধে (৬৩৭) তারা পারসিয়ান সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে, যার ফলে পারসিয়ান স্যাসানিয় রাজধানী সেসিফনের পতন ঘটে। পর্যাপ্ত লোকবল সংগ্রহ হওয়ামাত্র মুসলিমরা এভাবে গোটা পারসিয়ান সাম্রাজ্য অধিকার করে নিতে সক্ষম হয়। বাইযানটাইন সাম্রাজ্যে তারা কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় এবং বাইযানটাইনের প্রাণকেন্দ্র আনাতোলিয়ায় কোনও এলাকা দখলে ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও, মুসলিমরা উত্তর প্যালেস্টাইনে ইয়ারমুকের যুদ্ধে (৬৩৬) বিজয় লাভ করে এবং ৬৩৮-এ জেরুজালেম অধিকার করে, আর ৬৪১ নাগাদ গোটা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরের নিয়ন্ত্রণাধিকার পেয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী সুদূর সেরেনাইকা পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকান উপকূল দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। বদরের যুদ্ধের মাত্র বিশ বছর পর আরবরা নিজেদের এক উল্লেখযোগ্য সাম্রাজ্যের মালিক হিসাবে আবিষ্কার করে। সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। পয়গম্বরের পরলোকগমনের একশ' বছর পর, ইসলামী সাম্রাজ্য পিরেনিস থেকে হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। একে আরেকটা অলৌকিক ঘটনা আর ঈশ্বরের অনুগ্রহের লক্ষণ বলে মনে হয়েছে। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে আরবরা ছিল ঘৃণিত অস্পৃশ্য জাতি; কিন্তু আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত সময় পরিসরে তারা দু'দুটো প্রধান সাম্রাজ্যের ওপর শোচনীয় পরাজয় চাপিয়ে দিয়েছিল। বিজয়ের অভিজ্ঞতা তাদের মনে এই ধারণা জোরাল করে তোলে যে তাদের ভাগ্যে অসাধারণ একটা কিছু ঘটেছে। এভাবেই উম্মাহ্‌র সদস্যপদ ছিল এক দুর্জ্ঞেয় অভিজ্ঞতা, কারণ তাদের জানা বা প্রাচীন গোত্রীয় আমলে কল্পনাযোগ্য যেকোনও কিছুকে তা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের সাফল্য কুরানের বাণীকেও সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে সঠিক পথে পরিচালিত সমাজ অবশ্যই সমৃদ্ধি অর্জন করবে কেননা তা ঈশ্বরের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলে কী পরিবর্তন এসেছে ভাব একবার! ক্রিশ্চানরা যেখানে দৃশ্যতঃ ব্যর্থতা বা পরাজয়ে ঈশ্বরের ভূমিকা দেখতে পায়, জেসাস যেখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে পরলোকগমন করেছেন, মুসলিমরা সেখানে রাজনৈতিক সাফল্যকে পবিত্র হিসাবে অনুভব করেছে, একে তাদের জীবনে স্বর্গীয় সত্তার প্রকাশ হিসেবে দেখেছে।

অবশ্য একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে রাখা প্রয়োজন যে আরবরা যখন আরব বিশ্ব হতে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন তারা "ইসলামে"র প্রবল শক্তি দ্বারা তাড়িত হয়নি। পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রায়ই ধরে নেয় যে ইসলাম একটি সহিংস এবং সমরভিত্তিক ধর্ম বিশ্বাস, যা তরবারির মাধ্যমে অধীনস্ত প্রজাদের ওপর চেপে বসেছে। এটা মুসলিমদের সম্প্রসারণের যুদ্ধের ভুল ব্যাখ্যা। এসব যুদ্ধে ধর্মীয় কোনও বিষয় জড়িত ছিল না, উমরও একথা বিশ্বাস করতেন না যে তিনি বিশ্ব দখল করে নেয়ার ঐশী অধিকার লাভ করেছেন। উমর এবং তাঁর যোদ্ধাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল একেবারে বাস্তবমুখী: তারা লুণ্ঠন ও সাধারণ কর্মধারার মাধ্যমে *উম্মাহর* ঐক্য ধরে রাখতে চেয়েছেন। বহু শতাব্দী ধরে আরবরা পেনিনসূলার বাইরের ধনী বসতিগুলোয় হামলা চালানোর চেষ্টা চালিয়ে এসেছিল। পার্থক্য হল এই পর্যায়ে তারা ক্ষমতা-শূন্যতার মুখোমুখি হয়েছিল। পারসিয়া ও বাইযানটিয়াম কয়েক দশক ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে দীর্ঘ এবং শক্তি ক্ষয়কারী লাগাতার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। দুটো শক্তিই ছিল ক্লান্ত। পারসিয়ায় চলছিল উপদলীয় কোন্দল আর বন্যায় দেশের কৃষিসম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। স্যাসানিয় বাহিনীর সিংহভাগই ছিল আরব বংশোদ্ভূত, তারা যুদ্ধের সময় আক্রমণকারী শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বাইযানটিয়ামের সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার প্রদেশগুলোয় স্থানীয় জনসাধারণ গ্রিক অর্থোডক্স প্রশাসনের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, আরবীয় আক্রমণের সময় তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি, যদিও মুসলিমরা বাইযানটাইন মূলকেন্দ্র আনাতোলিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

পরবর্তী সময়ে মুসলিমরা এক সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর ইসলামী আইন এই বিজয়ের ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছে– গোটা বিশ্বকে দার আল-ইসলাম (ইসলামের ঘর), যা দার আল-হার্ব (যুদ্ধের ঘর)-এর সঙ্গে চিরন্তন যুদ্ধে লিপ্ত, এই রকম বিভক্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলিমরা মেনে নিয়েছে যে এতদিনে তারা তাদের সম্প্রসারণের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এবং অমুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আন্তরিকভাবেই সহাবস্থান করছে। কুরান যুদ্ধ-বিগ্রহকে পবিত্র করেনি। এটা আত্মরক্ষার জন্যে ন্যায়-যুদ্ধের ধারণা গড়ে তুলেছে যার মাধ্যমে শুভ মূল্যবোধ রক্ষা করা যায়, কিন্তু হত্যা আর আগ্রাসনের নিন্দা জানায়।[১১] এছাড়া একবার পেনিনসূলা ত্যাগ করার পর আরবরা আবিষ্কার করে যে প্রায় সবাই *আহল আল-কিতাবের* অন্তর্ভুক্ত, ঐশীগ্রন্থধারী জাতি যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য ঐশীগ্রন্থ লাভ করেছে। সুতরাং তাদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি: প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আগে ধর্মান্তরকরণকে উৎসাহিত করা হয়নি। মুসলিমরা মনে করেছে ইসলাম ইসমায়েলের বংশধরদের ধর্ম, জুডাইজম যেমন ইসহাকের পুত্রদের ধর্মবিশ্বাস। আরবীয় গোত্রসদস্যরা সবসময়ই অপেক্ষাকৃত দুর্বল সম্প্রদায়কে (*মাওয়ালি*) নিরাপত্তা দিয়ে এসেছে। তাদের নয়া সাম্রাজ্যে ইহুদি, ক্রিশ্চান আর যরোস্ট্রিয়ানরা *জিম্মি* (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত প্রজা)তে পরিণত হওয়ার পর

তাদের ওপর আর কোনওভাবেই হানা বা আক্রমণ চালানোর উপায় ছিল না। আশ্রিতদের সঙ্গে সদাচরণ করা, তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, তাদের যেকোনও ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারটি আরবদের জন্যে বরাবরই ছিল মর্যাদার প্রশ্ন। সামরিক নিরাপত্তার বিনিময়ে *জিম্মিরা* পোল ট্যাক্স প্রদান করত এবং কুরানের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসের অনুশীলন করার অনুমতি পেত তারা। প্রকৃত পক্ষে, রোমান ক্রিশ্চানদের কেউ কেউ ধর্মবিরোধী মত অবলম্বনের জন্য গ্রিক অর্থোডক্সদের হাতে নির্যাতিত হওয়ায় বাইযানটাইন শাসনের চেয়ে মুসলিমদেরই পছন্দ করেছিল বেশী।

উমর ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। আরব সৈন্যদের বিজয়ের ফল ভোগ করার সাধ্য ছিল না; অধিকৃত সকল এলাকা সেনা প্রধানদের মাঝে বন্টিত হত না, বরং বর্তমান আবাদীদের হাতেই রাখা হত যারা মুসলিম রাষ্ট্রকে খাজনা প্রদান করত। মুসলিমদের নগরে বসতি করার অনুমতি ছিল না। তার পরিবর্তে বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন নতুন "গ্যারিসন শহর" (*আমসার*) নির্মাণ করা হয়েছিল তাদের জন্য: ইরাকের কুফাহ্য় এবং বসরাহ্য়, ইরানের কুমে এবং নীল নদের উৎসমুখ, ফুস্ট্যাটে। পুরনো শহরের মধ্যে একমাত্র দামাস্কাসই মুসলিম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেকটি *আমসারে* একটি করে মসজিদ নির্মিত হয় যেখানে মুসলিম সৈন্যরা শুক্রবারের প্রার্থনায় যোগ দিত। এইসব গ্যারিসন শহরে সৈন্যদের ইসলামী জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়া হত। উমর পারিবারিক মূল্যবোধের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন, মদ্যপানের বেলায় কোঠর ছিলেন আর পয়গম্বরের সুন্দর বৈশিষ্ট্যসমূহকে উঁচু করে তুলেছেন। খলিফাহ্র মত পয়গম্বরও সবসময় সাধাসিধে জীবনযাপন করে গেছেন। তবে গ্যারিসন শহরগুলো আবার আরবীয় ছিটমহলের মতই ছিল যেখানে বিশ্ব সম্পর্কে কুরানের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায় এমন ঐতিহ্যগুলোও বিদেশের মাটিতে অব্যাহত থাকে। এই পর্যায়ে ইসলাম আবিশ্যিকভাবেই আরবীয় ধর্ম ছিল। কোনও *জিম্মি* ধর্মান্তরিত হলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে যেকোনও একটি গোত্রের "আশ্রিত" (Client) হতে হত এবং সে আরবীয় ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে যেত।

কিন্তু ৬৪৪-এর নভেম্বরে মদীনার মসজিদে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্ধ এক পারসিয়ান যুদ্ধ বন্দীর হাতে উমর ছুরিকাহত হলে বিজয়ের এই ধারা আকস্মিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। *রাশিদুন* এর শেষ দিকের বছরগুলো ছিল সহিংসতায় আকীর্ণ। উসমান ইবন আফফান পয়গম্বরের সহচরদের ছয়জন দ্বারা খলিফাহ্ নির্বাচিত হয়েছিলেন। পূর্বসূরীদের তুলনায় দুর্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর আমলের প্রথম ছ'টি বছর উম্মাহ্র সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। উসমান চমৎকার শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন: মুসলিমরাও নতুন নতুন অঞ্চল দখল করেছে। তারা বাইযানটাইনদের কাছ থেকে সাইপ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে অবশেষে তাদের (বাইযানটাইন) পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে উৎখাত করে, এবং উত্তর আফ্রিকায় সেনাদল বর্তমান

সিসিলির ত্রিপোলি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পূর্বে, মুসলিম বাহিনী আর্মেনিয়ার অধিকাংশ এলাকা দখল করে, প্রবেশ করে ককেশাস এবং ইরানের ওক্সাস নদী অবধি, আফগানিস্তানের হেরাত আর ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

কিন্তু এসব বিজয় সত্ত্বেও সৈন্যরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের ভেতর। মাত্র এক দশক সময়কালের মধ্যে তারা একটি কঠিন যাযাবর জীবনধারার বিনিময়ে এক পেশাদার সেনাবাহিনীর একেবারে ভিন্ন জীবন ধারা বেছে নিয়েছিল। গ্রীষ্মকাল যুদ্ধ করে আর শীতকালে বাড়ি থেকে দূরে গ্যারিসন শহরে দিন কাটাচ্ছিল তারা। দূরত্ব ব্যাপক হয়ে ওঠায় সমর অভিযানগুলো ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল, আগের তুলনায় লুণ্ঠিত মালের পরিমাণও গিয়েছিল কমে। উসমান তখনও বর্তমান ইরাকের মত দেশগুলোয় সেনাপ্রধান ও ধনী মক্কাবাসী পরিবারগুলোকে ব্যক্তিগত এস্টেট স্থাপনের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন। এটা তাঁর জনপ্রিয়তা কমিয়ে দেয়, বিশেষ করে কুফাহ্ এবং ফুস্ট্যাস্টে। নিজ উমাইয়াহ্ পরিবারের সদস্যদের সম্মানজনক পদ দেয়ার ভেতর দিয়ে মদীনার মুসলিমদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন উসমান। তারা তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছে, যদিও উমাইয়াহ্ কর্মকর্তাদের অনেকেরই অনেক যোগ্যতা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, উসমান মুহাম্মদের(সঃ) পুরনো শত্রু আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়াহ্কে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ দেন। ভাল মুসলিম ছিলেন তিনি, দক্ষ প্রশাসকও; ধীরস্থির চরিত্র এবং পরিস্থিতি বোঝার দক্ষতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু মদীনার মুসলিমদের চোখে, যারা তখনও নিজেদের পয়গম্বরের *আনসার* (সাহায্যকারী) হিসাবে গর্ব করছিল, অন্যায় বলে মনে হয়েছে, আবু সুফিয়ানের বংশধরের স্বার্থে তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে ভেবেছে তারা। কুরান-আবৃত্তিকারীগণ, যাদের ঐশীগ্রন্থ মুখস্থ ছিল, তারা প্রধান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষে পরিণত হয়েছিল এবং উসমান যখন গ্যারিসন শহরগুলোয় পবিত্র বিবরণের কেবল একটি পাঠ ব্যবহার করার ওপর জোর দেন তখন তারাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অন্যান্য পাঠ তিনি বাদ দেন, যা তাদের অনেকেরই পছন্দের ছিল, যদিও সামান্য পার্থক্য ছিল সেসবে। ক্রমবর্ধমান হারে অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীটি পয়গম্বরের চাচাত ভাই আলী ইবন আবি তালিবের মুখাপেক্ষী হতে শুরু করে; উমর এবং উসমান উভয়ের নীতির বিরোধী ছিলেন আলী। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে "সেনাদলের অধিকারে"র পক্ষে ছিলেন তিনি।

৬৫৬ সালে অসন্তোষ স্পষ্ট বিদ্রোহে রূপ নেয়। আরব সেনাদের একটা দল রাগ্য বুঝে নিতে ফুস্ট্যাট থেকে মদীনায় ফিরে এসেছিল, তাদের বঞ্চনার মাধ্যমে বিদায় করা হলে তারা উসমানের সাধারণ বাড়ি অবরোধ করে, জোর করে ভেতরে প্রবেশ করে হত্যা করে তাঁকে। বিদ্রোহীরা আলীকে নতুন খলিফাহ্ হিসাবে ঘোষণা করে।

প্রথম *ফিৎনাহ্*

আলীকেই যোগ্যতম প্রার্থী বলে মনে হয়েছে। পয়গম্বরের আপন নিবাসে বেড়ে উঠেছেন তিনি এবং মুহাম্মদ(সঃ) কর্তৃক প্রচারিত আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। দক্ষ সৈনিক ছিলেন তিনি, সৈন্যদের উৎসাহ জুগিয়ে চিঠি লিখেছেন আজও যেগুলো ধ্রুপদী মুসলিম বিবরণ হিসাবে টিকে আছে; তিনি ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়েছেন, প্রজা সাধারণকে ভালোবাসার সঙ্গে দেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু পয়গম্বরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁর শাসন সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি। মদীনার *আনসার* এবং উমাঈয়াহ্‌দের উত্থানে মক্কার অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীটির সমর্থন পেয়েছিলেন আলী। তখনও ঐতিহ্যবাহী যাযাবর জীবনযাপনকারী, বিশেষত ইরাকের মুসলিমরাও তাঁকে সমর্থন দিয়েছিল, যাদের কূফাস্থ গ্যারিসন শহর ছিল আলীর শক্তঘাঁটি। কিন্তু উসমানের হত্যাকাণ্ড, যিনি স্বয়ং আলীর মত মুহাম্মদের(সঃ) মেয়ে জামাই এবং প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন, ছিল এক অতিশয় বেদনাদায়ক ঘটনা যা উম্মাহ্‌র মাঝে পাঁচ বছর মেয়াদী গৃহযুদ্ধের সূচনা করেছিল, যা *ফিৎনাহ্*, প্রলোভনের কাল হিসাবে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত সময় ক্ষেপণের পর মুহাম্মদের(সঃ) প্রিয়তম স্ত্রী আয়েশা তাঁর আত্মীয় তালহা এবং মুহাম্মদের(সঃ) অন্যতম মক্কাবাসী সহচর যুবায়েরকে নিয়ে উসমানের হত্যাকারীদের বিচার না করায় আলীর ওপর হামলা চালান। সেনাবাহিনী যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিল, বিদ্রোহীরা মদীনা থেকে কুচকাওয়াজ করে বসরাহ্‌র উদ্দেশে এগিয়ে যায়। সমস্যায় পড়েছিলেন আলী। তিনি নিজেও নিশ্চয়ই উসমানের হত্যাকাণ্ডে আঘাত পেয়েছিলেন, একজন ধার্মিক মানুষ হিসাবে ব্যাপারটাকে ক্ষমা করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সমর্থকরা উসমান কুরানের আদর্শ অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন করেননি বলে মৃত্যু তাঁর পাওনা ছিল বলে জোর দিচ্ছিল। আলী তাঁর পক্ষাবলম্বনকারীদের ত্যাগ করতে পারেননি, কূফাহ্‌য় আশ্রয় নেন তিনি, সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান বসরাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং অতি সহজে উটের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন– এমন নাম হওয়ার কারণ: সেনাদলের সঙ্গে অবস্থানকারী আয়েশা নিজের উটের পিঠে বসে যুদ্ধ অবলোকন করেছিলেন। বিজয় অর্জনের পর আলী তাঁর সমর্থকদের উচ্চপদে আসীন করেন, সম্পদ ভাগ করে দেন তাদের মাঝে, কিন্তু তারপরও তিনি তাদের কূফাহ্‌র

[illegible] সেইসব কৃতিত্ব হবে [illegible] পরিপূর্ণ [illegible] [illegible] এ [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible], কেবল তাই নয় উসমানের হত্যাকারীর [illegible] না [illegible] গভীর সন্দেহের ছায়া টেনে এনেছিল

সিরিয়ায় আলীর শাসন মেনে নেয়া হয়নি, সেখানে বিদ্রোহী পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মুয়াবিয়াহ্, দামাস্কাসের তাঁর রাজধানী থেকে। উসমান ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং উমাইয়াহ্ পরিবারের নতুন নেতা হিসাবে এবং একজন আরব গোত্রপ্রধান হিসাবে উসমানের হত্যার বদলা নেয়া দায়িত্ব ছিল তাঁর। মক্কার ধনীক গোষ্ঠি আর সিরিয়ার আরবরা তাঁকে সমর্থন জোগায়, যারা তাঁর শক্তিশালী ও প্রাজ্ঞ সরকারের প্রশংসামুখর ছিল। আলী হয়ত মুয়াবিয়াহ্‌র অবস্থানের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি বোধ করেছিলেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি। কিন্তু পয়গম্বরের আত্মীয় পরিজন ও সহচরগণের পরস্পরের ওপর হামলে পড়ার অবস্থাটি দারুণ বিব্রতকর দৃশ্য ছিল। মুহাম্মদের(স:) মিশন ছিল মুসলিমদের মাঝে একতাবোধের বিস্তার আর *উম্মাহ্‌কে* সংগঠিত করা যাতে ঈশ্বরের একত্ব প্রকাশ পায়। আরও বিবাদের আশঙ্কাজনক সম্ভাবনা ঠেকানোর লক্ষ্যে উভয় পক্ষ ৬৫৭-এ ইউফ্রেটিসের উজানে সিফফিনের এক বসতিতে সমাধানে পৌছার লক্ষ্যে আলোচনায় মিলিত হয়; কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় তা। মুয়াবিয়াহ্‌র সমর্থকরা বর্শার শীর্ষে কুরানের কপি বিঁধিয়ে নিরপেক্ষ মুসলিমদের প্রতি ঈশ্বরের বাণী মোতাবেক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে একটা ফয়সালা করার আহ্বান জানায়। এটা প্রতীয়মান হয় যে, সালিশির ফলাফল আলীর বিপক্ষে গিয়েছিল এবং তাঁর অনেক অনুসারী তাঁকে রায় মেনে নিতে সম্মত করাতে চেয়েছে। এতে করে নিজেকে ক্ষমতাবান ভেবে মুয়াবিয়াহ্ আলীকে পদচ্যুত করেন, ইরাকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং জেরুজালেমে নিজেকে খলিফাহ্ হিসাবে ঘোষণা দেন।

কিন্তু আলীর কিছু সংখ্যক চরমপন্থী সমর্থক সালিশের রায় মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, আলীর নতি স্বীকারে প্রচণ্ড আহত বোধ করেছিল তারা। তাদের দৃষ্টিতে উসমান কুরানের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী চলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আলীও উসমানের ভুল শোধরানোতে ব্যর্থ হয়ে অন্যায়ের সমর্থকদের সঙ্গে আপোস করেছেন, সুতরাং তিনি প্রকৃত মুসলিম নন। তারা নিজেদের *উম্মাহ্* থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, যা কিনা তাদের দাবী অনুযায়ী কুরানের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; একজন স্বাধীন কমান্ডারের অধীনে নিজস্ব শিবির স্থাপন করে তারা। আলী এসব চরমপন্থীকে দমন করেন, যারা *খারেজি* (বিচ্ছিন্নতাবাদী) নামে পরিচিত হয়েছে; মূল বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করলেও গোটা সাম্রাজ্যে আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। অনেকেই উসমান-আমলের স্বজনপ্রীতির কারণে অসহিষ্ণু বোধ করেছিল, কুরানের সাম্যতার চেতনা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল তারা। *খারেজিরা* আগাগোড়াই সংখ্যালঘু দল, কিন্তু তাদের অবস্থানের গুরুত্ব রয়েছে, কেননা এটাই এক গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ধারার প্রথম

নীতি. যত বড় উম্মাহর নৈতিক বোধের দুর্বলকারী কর্তৃত্ব এর নয়
ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে পাপ সংঘটিত হয়েছিল, খারেজিরা জোর দিয়েছিল যে
ইসলামী গোষ্ঠীর শাসককে সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন নেই, তাঁকে বরং
সবচেয়ে নিবেদিত মুসলিম হতে হবে; খলিফাহ্দের মুয়াবিয়াহ্র মত ক্ষমতাকামী
হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর মানবজাতিকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন– যেহেতু তিনি
ন্যায় বিচারক, তিনি অবশ্যই মুয়াবিয়াহ্, উসমান এবং আলীর মত অন্যায়কারীদের
শাস্তি দেবেন, যাঁরা ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধর্মত্যাগী হয়ে গেছেন।
খারেজিরা চরমপন্থী বটে, কিন্তু মুসলিমদের তারা ভাবতে বাধ্য করেছিল কে মুসলিম আর কে নয় সেটা বিবেচনা করার জন্যে। ধর্মীয় ধারণা হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তা ঈশ্বরের প্রকৃতি, পূর্ব-নির্ধারিত নিয়তি আর মানুষের স্বাধীনতার মত বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

খারেজিদের প্রতি আলীর কঠোর আচরণে তাঁর বহু সমর্থক, এমনকি কুফাহ্য়ও, সমর্থন প্রত্যাহার নিয়েছিল। ক্রমশঃ শক্তশালী হয়ে ওঠেন মুয়াবিয়াহ্, আরবদের অনেকেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। সালিশের দ্বিতীয় প্রয়াস, যেখানে আরেকজন খলিফাহ্ প্রার্থী খোঁজার চেষ্টা হয়েছিল, ব্যর্থ হয়; মুয়াবিয়াহ্র সেনাবাহিনী আরবে তাঁর শাসনের বিরোধিতাকারীদের পরাস্ত করে এবং ৬৬১তে জনৈক *খারেজির* হাতে প্রাণ হারান আলী। কুফাহ্য় যারা আলীর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গিয়েছিল তারা আলীর পুত্র হাসানকে খলিফাহ্ হিসাবে ঘোষণা দেয়, কিন্তু হাসান মুয়াবিয়াহ্র সঙ্গে চুক্তিতে উপনীত হন এবং অর্থের বিনিময়ে মদীনায় ফিরে যান। সেখানেই তিনি ৬৬৯-এ পরলোকগমনের আগ পর্যন্ত রাজনীতি নিরপেক্ষ জীবনযাপন করেন।

এইভাবে *উম্মাহ্* এক নয়া পর্যায়ে পৌঁছে। মুয়াবিয়াহ্ দামাস্কাসে রাজধানী স্থাপন করে মুসলিম সমাজের ঐক্য ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেন। কিন্তু একটা প্যাটার্ন খাড়া হয়ে গিয়েছিল। এবার ইরাক এবং সিরিয়ার মুসলিমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে পড়ে। অতীতের আলোকে আলীকে ভদ্র, ধার্মিক মানুষ হিসাবে মনে হয়েছে যিনি বাস্তব রাজনীতির যুক্তির কাছে হেরে গিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ এবং পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠতম পুরুষ আত্মীয় আলীর হত্যাকাণ্ডকে সঙ্গত কারণেই ন্যাক্কারজনক ঘটনা হিসাবে দেখা হয়েছে, ঘটনাটি *উম্মাহ্র* নৈতিক-সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছিল। সাধারণ আরব বিশ্বাস অনুযায়ী আলী পয়গম্বরের ব্যতিক্রমী গুণাবলীর কিছুটা ধারণ করেছিলেন বলে ভাবা হত এবং তাঁর পুরুষ বংশধরদের নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়ে থাকে। মিত্র এবং প্রতিপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার একজন মানুষ হিসাবে আলীর পরিণতি জীবনের অন্তর্গত অবিচারের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সময়ে সময়ে শাসক খলিফাহ্র আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনকারী মুসলিমরা *খারেজিদের* মত নিজেদের *উম্মাহ্* থেকে বিচ্ছিন্ন করে সকল প্রকৃত মুসলিমদের আহ্বান জানিয়েছে আরও উন্নতর ইসলামী মানে উন্নীত হওয়ার জন্যে তাদের সঙ্গে সংগ্রামে (*জিহাদ*)

যোগ দেয়ার। প্রায়শঃ তারা নিজেদের শিয়াহ-ই-আলী'র অংশ– আলীর পক্ষাবলম্বনকারী হিসাবে দাবী করেছে।

অবশ্য অন্যরা অধিকতর নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। *উম্মাহ*কে বিচ্ছিন্নকারী ভয়ানক বিভক্তি দেখে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তারা এবং সেই থেকে ইসলামে ঐক্য আগের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেকেই আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিল যে মুয়াবিয়াহ্ মোটেই আদর্শ শাসক নন। তারা তখন চার *রাশিদূনের* শাসনামলের কথা ভাবতে শুরু করে যখন মুসলিমরা নিবেদিত ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হয়েছে, যাঁরা ছিলেন পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ মানুষ, কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের কারণে অসম্মানিত হয়েছেন। প্রথম *ফিৎনাহ্*র ঘটনাবলী প্রতীকী রূপ পেয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষগুলো এখন তাদের ইসলামী প্রয়াসের অর্থের খোঁজে এইসব করুণ ঘটনার নজীর টানে। অবশ্য একটা কথা সবাই স্বীকার করে যে পয়গম্বর এবং *রাশিদূনের* রাজধানী মদীনা থেকে উমাইয়াহ্-দামাস্কাসে স্থানান্তর রাজনৈতিক সুবিধার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু ছিল। *উম্মাহ্* যেন পয়গম্বরের জগৎ থেকে সরে যাচ্ছিল এবং মূল আদর্শ হারানোর বিপদে পড়েছিল। অধিকতর ধার্মিক এবং উদ্বিগ্ন মুসলিমরা একে আবার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার উপায় সন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

২
বিকাশ

উমাঈয়াহ্ এবং দ্বিতীয় *ফিৎনাহ্*

খলিফাহ্ মুয়াবিয়াহ্ (৬৬১-৮০) সাম্রাজ্যের ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। *ফিৎনাহ্* প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল মুসলিমরা, তারা উপলব্ধি করেছিল যে স্বজাতি আরবদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্ভাব্য বৈরী প্রজাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে গ্যারিসন শহরে তাদের অবস্থান কত নাজুক। এরকম ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ মেনে নিতে পারেনি তারা। শক্তিশালী সরকার চেয়েছিল তারা এবং দক্ষ শাসক মুয়াবিয়াহ্ এমন একটি সরকার দেয়ার যোগ্য ছিলেন। তিনি আবার আরব মুসলিমদের প্রজাসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার উমরের অনুসৃত ব্যবস্থা চালু করলেন এবং যদিও কিছু সংখ্যক মুসলিম তখনও অধিকৃত এলাকাসমূহে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করার দাবীতে সোচ্চার ছিল, মুয়াবিয়াহ্ তার ওপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখেন। তিনি ধর্মান্তরকরণও নিরুৎসাহিত করেছেন এবং একটা দক্ষ প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলেন। এভাবে ইসলাম বিজয় অর্জনকারী আরব অভিজাতদের ধর্ম রয়ে যায়। প্রথম দিকে আরবরা, যাদের রাজকীয় সরকার পরিচালনার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, অমুসলিমদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করেছিল, যারা অতীতের বাইযানটাইন ও পারসিয়ান শাসকদের সেবা দিয়েছে; কিন্তু আস্তে আস্তে আরবরা উচ্চ পদসমূহ থেকে *জিম্মি*দের বিতাড়ন শুরু করে। পরবর্তী শতাব্দীকালে উমাঈয়াহ্ খলিফাহ্রা ক্রমশ: মুসলিম বাহিনীর অধিকৃত বিসদৃশ এলাকাগুলোকে একটি সাধারণ আদর্শের ভিত্তিতে একক সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এক অসাধারণ সাফল্য ছিল এটা; কিন্তু রাজদরবার স্বভাবতই এক উন্নত সংস্কৃতি আর বিলাসবহুলে জীবন ধারা গড়ে তুলতে শুরু করে এবং বহু দিক থেকেই অন্য যেকোনও শাসক শ্রেণী হতে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে তা।

এর মাঝেই ছিল এক দ্বিধার অবস্থান। কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জানা গিয়েছিল যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাক-আধুনিক কোনও সাম্রাজ্য শাসনের একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি হল পরম রাজতন্ত্র; এবং তা সামরিক অলিগারকির (military oligarchy) চেয়ে অনেক বেশী সন্তোষজনক– যেখানে সেনাপ্রধানরা সাধারণত ক্ষমতার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। আমাদের গণতান্ত্রিক যুগে একজন ব্যক্তিকে এমন সুবিধাপ্রাপ্ত করে তোলা, যেখানে ধনী-দরিদ্র সমানভাবে তার সামনে নাজুক অবস্থানে পড়ে, তা আমাদের চোখে ঘৃণিত, কিন্তু আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে শিল্প-উন্নত সমাজের কারণেই

গণতন্ত্র সম্ভবপর হয়ে উঠেছে, যে সমাজের এর সম্পদসমূহ অনির্দিষ্ট মাত্রায় বাড়িয়ে তোলার প্রযুক্তি রয়েছে। পাশ্চাত্যের আধুনিকতার আবির্ভাবের আগে যা সম্ভব ছিল না। প্রাক-আধুনিক বিশ্বে শক্তিশালী একজন রাজার, যার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সশরীরে যুদ্ধে অংশ নেয়ার প্রয়োজন হত না, অভিজাতদের বিবাদ মীমাংসা করতে পারতেন এবং দরিদ্রদের পক্ষে বক্তব্য দানকারীদের আবেদন অগ্রাহ্য করার কোনও কারণ থাকত না তাঁর। রাজার বেলায় এই সুবিধাটি এত জোরাল ছিল যে, আমরা দেখব, এমনকি যখন বৃহৎ সাম্রাজ্যের স্থানীয় প্রকৃত ক্ষমতা স্থানীয় শাসকরা নিয়ন্ত্রণ করছে তখনও তারা রাজার গুণ গাইছে এবং নিজেদের তাঁর সেবক বলে দাবী করছে। উমাইয়াহ্ খলিফাহ্গণ এক সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেছেন, যা তাঁদের শাসনকালে অব্যাহতভাবে বিস্তার লাভ করে। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে তাঁদের একচ্ছত্র রাজা হওয়াই প্রয়োজন, কিন্তু কীভাবে তা একদিকে আরব ঐতিহ্য আর অন্যদিকে কুরানের চরম সাম্যবাদী নীতির সঙ্গে খাপ খাবে?

প্রথম দিকের উমাইয়াহ্ খলিফাহ্গণ একচ্ছত্র রাজা ছিলেন না। মুয়াবিয়াহ্ একজন আরব গোত্রপতির মতই শাসন করেছেন, *প্রাইমাস ইন্টার পেয়ারেস*-এর মত। আরবরা চিরকাল রাজতন্ত্রকে অবিশ্বাস করে এসেছে, অসংখ্য ছোট ছোট গ্রুপ যেখানে অপ্রতুল সম্পদের অংশ পেতে প্রতিযোগিতা করে, সেখানে তা সম্ভবও নয়। বংশ পরম্পরা শাসনের কোনও ব্যবস্থা তাদের ছিল না, কেননা গোত্র প্রধান হিসাবে সবসময় গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে পেতে চাইত তারা। কিন্তু *ফিৎনাহ্*ই বুঝিয়ে দিয়েছিল বিতর্কিত বিচ্ছেদের বিপদ। উমাইয়াহ্দের "সেক্যুলার" শাসক মনে করাটা ভুল হবে। মুয়াবিয়াহ্ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম-ইসলামের চলমান ধারণা অনুসারে। মুসলিমদের প্রথম *কিবলাহ্* এবং অতীতের বহু মহান পয়গম্বরের আবাসভূমি জেরুজালেমের পবিত্রতার প্রতি নিবেদিত ছিলেন তিনি। *উম্মাহ্*র ঐক্য বজায় রাখার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি। তাঁর শাসনের ভিত্তি ছিল কুরানের তাগিদ যে সকল মুসলিম পরস্পরের ভাই, তারা অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত থেকে বিরত থাকবে। কুরানের শিক্ষা অনুযায়ী তিনি *জিম্মি*দের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু *ফিৎনাহ্*র *অভিজ্ঞতা বারেজি*দের মত কোনও কোনও মুসলিমের মনে দৃঢ় ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে রাষ্ট্রিয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলামের অর্থ আরও ব্যাপক হওয়া উচিত।

সুতরাং কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রের চাহিদা এবং ইসলামের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সংঘাত ছিল এবং মুয়াবিয়াহ্র পরলোকগমনের পর তা দুঃখজনক ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল. তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে উত্তরাধিকারী নিশ্চিত করার জন্যে তাঁকে অবশ্যই আরব ঐতিহ্য থেকে সরে আসতে হবে এবং পরলোকগমনের আগেই পুত্র প্রথম ইয়াযিদের (৬৮০-৮৬) ক্ষমতারোহনের ব্যবস্থা গিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরপরই প্রবল গোলমাল শুরু হয়ে যায়। কুফাহ্য় আলীর অনুগতরা আলীর দ্বিতীয় পুত্র হুসেইনের শাসন দাবী করে বসে। অল্পক'জন অনুসারী এবং তাদের

পরিবার-পরিজন নিয়ে মদীনার উদ্দেশে অগ্রসর হন হুসেইন। এদিকে স্থানীয় উমাইয়াহ্ গভর্নর কুফাহ্বাসীদের ভীতি প্রদর্শন করায় তারা সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। আতসমর্পণে অস্বীকৃতি জানান হুসেইন, তাঁর অবশ্য জোর বিশ্বাস ছিল প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধের সন্ধানে স্বয়ং পয়গম্বরের পরিবারের অভিযাত্রা *উম্মাহ*কে তার মূল দায়িত্বের কথাটি স্মরণ করিয়ে দেবে। কুফাহ্র অনতিদূরে, কারবালা প্রান্তরে সসৈন্য উমাইয়াহ্দের বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান তিনি। সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে সবার শেষে প্রাণ দেন হুসেইন। সকল মুসলিমই পয়গম্বরের দৌহিত্রের করুণ মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে, কিন্তু নিজেদের যারা শিয়া-ই-আলী বলে মনে করে পয়গম্বরের বংশধরদের ক্ষেত্রে হুসেইনের পরিণতি অনেক গভীরভাবে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। আলীর হত্যাকাণ্ডের মত কারবালার করুণ ঘটনাটিও শিয়া মুসলিমদের চোখে মানবজাতিকে ঘিরে রাখা অবিরাম অবিচারের প্রতীকে পরিণত হয়েছে; এটা যেন রাজনীতির কঠিন জগতের সঙ্গে ধর্মীয় আদেশ বাস্তবায়নের অসম্ভাব্যতাও দেখিয়ে দেয়, যার সঙ্গে রয়েছে এর প্রবল বিরোধ।

হিজাযে আবদাল্লাহ ইবন আল-যুবায়েরের নেতৃত্বে সংঘটিত অভ্যুত্থানটি ছিল আরও বেশী ভয়াবহ। যুবায়ের ছিলেন উটের যুদ্ধে আলীর বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক বিদ্রোহীর সন্তান। এটা উমাইয়াহ্দের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তা আবার মক্কা ও মদীনায় পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে প্রথম *উম্মাহ্র* উন্নত মূল্যবোধে ফিরে যাবার প্রয়াসও ছিল। ৬৮৩তে উমাইয়াহ্ বাহিনী মদীনা দখল করে নেয়, কিন্তু সেবছর প্রথম ইয়াযিদ এবং তার শিশু পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়াহ্র অকাল মৃত্যু পরবর্তী ধোঁয়াটে পরিস্থিতিতে মক্কা নগরী হতে অবরোধ তুলে নেয়। আরও একবার গৃহযুদ্ধের কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে *উম্মাহ্*। ইবন আল-যুবায়ের খলিফাহ্ হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেন, কিন্তু ৬৮৪তে *খারেজি* বিদ্রোহীরা মধ্য আরবে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বসলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তিনি; ইরাক এবং ইরানেও *খারেজি* বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; হুসেইনের হত্যাকাণ্ডের বদলা নেয়ার জন্য কুফাহ্র শিয়ারা ক্ষেপে ওঠে, তারা আলীর অপর পুত্রকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাতে চায়। বিদ্রোহীদের সকলেই কুরানের সাম্যবাদী নীতির পক্ষে কথা বলেছে, কিন্তু সফলকাম হয়েছিল সিরিয়ানরা– প্রথম মুয়াবিয়াহ্র এক উমাইয়াহ্ কাজিন মারওয়ান এবং তার পুত্র আব্দ আল-মালিকের নামে। ৬৯১ নাগাদ তারা সকল বিদ্রোহীকে দমন করে এবং এর পরের বছর স্বয়ং ইবন আল-যুবায়েরকে পরাস্ত ও হত্যা করে।

আব্দ আল-মালিক (৬৮৫-৭০৫) আবার উমাইয়াহ্ শাসন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলের শেষ বার বছর ছিল শান্তি আর সমৃদ্ধির কাল। তিনিও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান রাজা ছিলেন না, কিন্তু দ্বিতীয় *ফিৎনাহ্*র পর স্পষ্টতই সেদিকে ধাবিত হচ্ছিলেন। স্থানীয় আরব গোত্র প্রধানদের বিরুদ্ধে *উম্মাহ্*র সংহতি বজায় রাখেন তিনি, বিদ্রোহীদের সামাল দেন আর কেন্দ্রীকরণের সুসংহত নীতি

অনুসরণ করেন। সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে আরবী পারসির স্থান অধিকার করে; প্রথম বারের মত ইসলামী মুদ্রা চালু হয় যাতে কুরানের বাণী উৎকীর্ণ ছিল। জেরুজালেমে ৬৯১-তে ডোম অভ দ্য রক- প্রথম প্রধান ইসলামী মন্যুমেন্ট- এর নির্মাণকাজ শেষ হয়- যা গর্বের সঙ্গে পবিত্র নগরীটিতে ইসলামের প্রাধান্য ঘোষণা করেছে- বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রিশ্চানদের বাস ছিল এখানে। 'ডোম' ইসলামের অনন্যসাধারণ স্থাপত্য ও শিল্পকলার রীতির ভিত্তিও স্থাপন করেছিল: কোনওরকম শারীরিক অবয়ব থাকতে পারবে না, যা উপাসনাকারীদের দুর্জ্ঞেয় সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে -মানুষের কল্পনায় সঠিকভাবে যার প্রকাশ করা যায় না। এর বদলে ডোমের অভ্যন্তর সাজানো হয় ঈশ্বরের বাণী কুরানের পঙক্তি দিয়ে। মুসলিম স্থাপত্যকলার প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া খোদ ডোমটি বিশ্বাসীদের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে আরোহণের আধ্যাত্মিক প্রতীক, অবশ্য *তাওহীদের* নিখুঁত ভারসাম্যও প্রকাশ করে তা। এর বাইরের অংশ, যা অসীম আকাশের দিকে উঠে গেছে, অভ্যন্তরীণ মাত্রারই নিখুঁত অনুকৃতি। এটা দেখায় কীভাবে মানুষ এবং ঈশ্বর, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জগৎ, একটি পূর্ণাঙ্গ জিনিসের দুটি অংশ হিসাবে পরস্পরকে পূর্ণতা দেয়। মুসলিমরা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিল এবং তারা তাদের নিজস্ব অনন্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছিল।

এই পরিবর্তিত পরিবেশে যে কঠোর নিয়মের কারণে মুসলিমরা প্রজা সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে আসে। অমুসলিমরা গ্যারিসন শহরগুলোয় বসতি শুরু করে; কৃষিজীবীরা মুসলিম এলাকায় কাজ পায় এবং আরবীতে কথা বলা শেখে। বণিকগণ মুসলিমদের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে, এবং যদিও ধর্মান্তরকরণের বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হচ্ছিল না, কোনও কোনও রাজকীয় কর্মকর্তা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু পুরনো বিভেদ ভেঙে পড়ায় সাধারণ মানুষ আরব মুসলিমদের বাড়তি সুবিধার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে। *খারেজি* এবং শিয়াদের দমন এক তিক্ত অনুভূতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। আব্দ আল-মালিক আরব এবং গ্যারিসন শহরগুলোয় এক নতুন আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, যারা ইসলামী আদর্শের আরও কঠোর প্রয়োগের ব্যাপারে চাপ দিচ্ছিল। আব্দ আল-মালিক এসব নতুন ধারণায় আগ্রহী থাকলেও দাবী করেন যে কুরান তাঁর নীতির সমর্থন করে। এসব নব্য ধর্মানুরাগীদের কেউ কেউ অবশ্য কুরানের আরও সক্রিয় ভূমিকা চেয়েছিল এবং সমর্থক বা শিখণ্ডি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে কুরান নেতৃত্ব দেবে এটাই চেয়েছে তারা।

ধর্মীয় আন্দোলন

গৃহযুদ্ধগুলো বহু জটিল প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। যে সমাজ-এর নির্বেদিত নেতাদের (*ইমাম*) হত্যা করেছে সেটি ঈশ্বর পরিচালিত বলে দাবী করে কীভাবে? কোন ধরনের লোকের *উম্মাহ্‌*র নেতৃত্ব দেয়া উচিত? খলিফাহ্‌কে কী সবচেয়ে ধার্মিক মুসলিম (*খারেজিরা* যেমন বিশ্বাস করে), পয়গম্বরের সরাসরি বংশধর (শিয়ারা যেমন মনে করে) হতে হবে নাকি বিশ্বাসীদের উচিত শান্তি আর ঐক্যের খাতিরে সকল ব্যর্থতা ত্রুটি সত্ত্বেও উমাঈয়াহদেরই মেনে নেয়া? প্রথম *ফিৎনাহ্‌*র সময় কে সঠিক ছিলেন, আলী না মুয়াবিয়াহ? আর উমাঈয়াহ্‌ রাষ্ট্র কতখানি ইসলামী? যেসব শাসক এমন বিলাসী জীবনযাপন করে আর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দারিদ্র্য মেনে নেয় তারা কি প্রকৃত মুসলিম হতে পারে? আর যেসব আরব ইসলাম গ্রহণ করে কোনও না কোনও আরব গোত্রের "ক্লায়েন্টে" (*মাউয়ালি*) পরিণত হয়েছে তাদের অবস্থানটা কী? এতে করে কি একথাই বোঝায় না যে, এখানে এমন এক শভিনিজম আর বৈষম্য রয়েছে যা কুরানের সঙ্গে সম্পূর্ণই বেমানান?

এইসব রাজনৈতিক আলোচনার ভেতর দিয়েই আমাদের পরিচিত ইসলামের ধর্ম ও ধার্মিকতার বিষয়টি বেরিয়ে আসতে শুরু করে। কুরান আবৃত্তিকার এবং অন্য চিন্ত -াশীল ব্যক্তিরা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে মুসলিম হওয়ার প্রকৃত অর্থ কী? তারা তাদের সমাজকে প্রথমত ইসলামী এবং তারপর আরব হিসাবে দেখতে চেয়েছে। কুরান সমগ্র মানব জীবনের একীভূতকরণের (*তাওহীদ*) কথা বলে, যার মানে ব্যক্তিবিশেষ এবং রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি নতি স্বীকার করার কথা প্রকাশ পাওয়া উচিত। বিকাশের একই রকম পর্যায়ে ক্রিশ্চানরা জেসাসের প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বারবার তপ্ত-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যা তাদের ঈশ্বর, মোক্ষ লাভ এবং মানবীয় অবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। গৃহযুদ্ধগুলোর পরবর্তী কালের *উম্মাহ্‌*র রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রবল বিতর্ক ইসলামে চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে খ্রিষ্টধর্মের ক্ষেত্রে ক্রিস্টোলজিক্যাল বিতর্কের অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে।

এই নয়া মুসলিম ধার্মিকতার প্রটোটাইপ এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ ছিলেন হাসান আল-বাসরি (মৃত্যু ৭২৮), যিনি পয়গম্বরের পারিবারিক বলয়ে বেড়ে উঠেছিলেন এবং উসমানের মৃত্যুর পরও বেঁচে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বসরাহ্‌র চলে যান তিনি

যেখানে পার্থিব জিনিসের প্রতি বৈরাগ্যের ওপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সহজ-সরল জীবনধারার অনুরূপ এক আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলেন। কিন্তু বসরাহ্‌র সবচেয়ে খ্যাত ধর্মপ্রচারকে পরিণত হন হাসান, তাঁর সাধারণ জীবন-যাপন রাজদরবারের বিলাসীতার বাহুল্য এবং প্রচ্ছন্ন বিরোধিতাপূর্ণ সমালোচনার রূপ নেয়। বসরাহ্‌য় এক ধর্মীয় সংস্কারের কাজ শুরু করেন হাসান, অনুসারীদের গভীরভাবে কুরান নিয়ে ধ্যান করার তাগিদ দেন এবং এই শিক্ষা দেন যে গভীর চিন্তা, আত্মপর্যালোচনা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণই প্রকৃত সুখের উৎস, কেননা এগুলো মানবীয় আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের জন্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার মাঝে বিরাজিত টানাপোড়েন দূর করে। হাসান উমাঈয়াহ্‌দের সমর্থন করেছিলেন বটে, কিন্তু এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে প্রয়োজনে তাঁদের সমালোচনা করার অধিকার তিনি রাখেন। তিনি কাদেরিয়াহ্‌ নামে পরিচিত থিয়োলজির পক্ষ বেছে নেন, কারণ তা ঈশ্বরের বিধানসমূহ (*কাদার*) নিয়ে কাজ করে। মানবজাতির স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে এবং মানুষ তার কর্মকাণ্ডের জন্যে দায়ী; কোনও সুনির্দিষ্ট কাজ করার ব্যাপারে বাধ্য নয় তারা, ঈশ্বর যেহেতু ন্যায় বিচারক সেহেতু মানুষের সাধ্যের মধ্যে না থাকলে তিনি তাদের সৎপথে জীবনযাপনের নির্দেশ দিতেন না। সুতরাং খলিফাহ্‌দের অবশ্যই তাঁদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে এবং যদি তাঁরা ঈশ্বরের সুস্পষ্ট শিক্ষা অমান্য করেন তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে। খলিফাহ্‌ আব্দ আল-মালিক যখন হাসানের এরকম প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহমূলক মতবাদ প্রচারের সংবাদ পেলেন, রাজদরবারে তলব করলেন তাঁকে, কিন্তু হাসানের তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে তাঁকে শাস্তি দেয়ার সাহস পাননি তিনি। হাসান সুশৃঙ্খল আত্মিকজীবনের সঙ্গে সরকারের রাজনৈতিক বিরোধিতার মিশেল ঘটিয়ে এক শক্তিশালী মুসলিম ধারার সূচনা করেছিলেন।

কাদেরিয়ারা উমাঈয়াহ্‌ শাসন মেনে নিয়েছিল, কারণ একেই উম্মাহ্‌র ঐক্য রক্ষায় সক্ষম বলে মনে হয়েছিল; সুতরাং *খারেজি*দের বিরোধিতা করেছে তারা, যাদের বিশ্বাস ছিল উমাঈয়াহ্‌রা ধর্মত্যাগী এবং মৃত্যুদণ্ড লাভের যোগ্য। হাসানের শিষ্য ওয়াসান ইবন আতা (মৃত্যু: ৭৪৮) এক মধ্যপন্থী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এ দুটো চরম অবস্থান থেকে "প্রত্যাহারের" (*ইতাযাহ্‌*) মাধ্যমে। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রতি জোর দেয়া, রাজদরবারের বিলাসীতার নিন্দা জানানো এবং মুসলিমদের সাম্যতার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপের দিক থেকে মুতাযিলারা কাদেরিয়াদের সঙ্গে একমত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি জোর দেয়ার ফলে মুতাযিলারা যেসব মুসলিম অন্যদের প্রতি শোষণমূলক আচরণ করে তাদের প্রতি চরম সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা আলী এবং মুয়াবিয়াহ্‌র ব্যাপারে রায় দেয়া থেকে বিরত থাকে, কারণ তাদের দাবী ছিল একমাত্র ঈশ্বরই জানেন মানুষের মনে কী আছে। এর সঙ্গে *খারেজি*দের চরমপন্থার পার্থক্য স্পষ্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়ই মুতাযিলাদের রাজনৈতিক কর্মী হতে দেখা গেছে: কুরান মুসলিমদের "সৎকাজে নির্দেশ আর অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকার

আদেশ"[১] দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং কোনও কোনও *খারেজির* মতই মুতাযিলারা এ বাণীকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। কেউ কেউ শিয়া বিদ্রোহে সমর্থন দেয়, আর হাসান আল-বাসরির মত অন্যরা যেসব শাসক কুরানের আদর্শ অনুযায়ী চলেনি তাদের নিন্দা জানিয়েছেন। শতাব্দী কাল সময়ের মধ্যে মুতাযিলারা ইরাকের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। একটা যুক্তি ভিত্তিক থিয়োলজি (*কালাম*) গড়ে তুলেছিল মুতাযিলারা যেখানে ঈশ্বরের কঠোর একত্ব আর সরলতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, উম্যাহ্‌র সংহতির মধ্য দিয়ে যা প্রতিফলিত হওয়ার কথা।

আরেকটি মতবাদ, মুরজিয়াও আলী ও মুয়াবিয়াহ্‌র ক্ষেত্রে রায় প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কারণ মানুষের মনের অবস্থাই আসল। মুসলিমদের অবশ্যই কুরান অনুযায়ী[২] রায় ঘোষণা "স্থগিত" (*আর্জা*) রাখতে হবে। সুতরাং, উমাঈয়াহ্‌দের তারা এমন কিছু করে বসার আগেই অবৈধ শাসক বলে বিচার বা নাকচ করে দেয়া ঠিক হবে না, বরং যদি তারা ঐশীগ্রন্থের মানদণ্ড লঙ্ঘন করে তাহলে তাদের তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করা যেতে পারে। এই মতবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত অনুসারী ছিলেন কুফাহ্‌র একজন বণিক আবু হানিফাহ্ (৬৯৯-৭৬৭)। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জুরিসপ্রুডেন্সের (*ফিকহ্*) এক নতুন ধারার নেতৃত্ব দেন যা ইসলামী ধার্মিকতায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং মুসলিম বিশ্বের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মূল শাস্ত্রে পরিণত হয়। *ফিকহ্*'র মূলেও রয়েছে গৃহযুদ্ধ পরবর্তী ব্যাপক অসন্তোষ। লোকেরা পরস্পরের বাড়ি বা মসজিদে মিলিত হয়ে উমাঈয়াহ্ সরকারের অযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করত। ইসলামী নীতিমালা অনুসারে কীভাবে সমাজ পরিচালনা করা যায়? জুরিস্টরা এমন সুনির্দিষ্ট এক আইনী বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে আত্মসমর্পণকারী একটা সমাজ গঠনে কুরানে প্রদত্ত নির্দেশ পবিত্র স্বপ্নের বদলে বাস্তব সম্ভাবনায় পরিণত করবে। এই প্রাথমিক জুরিস্টগণ (*ফাকিহ্*) বসরাহ্, কুফাহ্, মদীনা এবং দামাসকাসে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট সমাজের জন্য আইনগত পদ্ধতি বের করেন। সমস্যা ছিল তাঁদের, কুরানে খুব কমই আইন রয়েছে এবং যেসব আইন আছে তাও তৈরি হয়েছে অনেক সরল-সমাজের জন্য। তো জুরিস্টদের কেউ কেউ পয়গম্বর এবং তাঁর সহচরবৃন্দ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কেমন আচরণ করেছিলেন তার "সংবাদ" বা "প্রতিবেদন" (*আল-হাদিস*, একবচনে: *হাদিস*) সংগ্রহ শুরু করেন। অন্যরা সূচনা স্বরূপ তাঁদের শহরে মুসলিমদের প্রথাগত অনুশীলন (*সুন্নাহ্*)কে বেছে নেন এবং সেটাকে গোড়ার দিকে সহচরদের– যাঁরা ওখানে বসতি করেছিলেন– তাঁদের কারও সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়াস পান। তাঁদের বিশ্বাস ছিল এভাবে তাঁরা প্রকৃত ইল্‌ম, কোনটা সঠিক এবং কেমন করে চলতে হবে সে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। আবু হানিফাহ্ উমাঈয়াহ্ আমলের শ্রেষ্ঠ আইনবিদে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি জুরিসপ্রডেন্সের একটি মতবাদ (*মাযহাব*) প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিমরা যা আজও অনুসরণ করে। তিনি নিজে খুব বেশী লেখালেখি করেননি, কিন্তু তাঁর অনুসারীরা উত্তর প্রজন্মের জন্যে তাঁর

শিক্ষা লিপিবদ্ধ করে গেছে: অন্যদিকে পরবর্তী সময়ের জুরিস্টগণ সামান্য পৃথক তত্ত্ব আবিষ্কার করে নতুন *মাযহাব* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইসলামী ইতিহাস রচনাও একই ধরনের আলোচনাচক্র হতে আবির্ভূত। চলমান সমস্যাদির সমাধান বের করতে গিয়ে মুসলিমরা উপলব্ধি করে যে তাদের পয়গম্বর এবং *বাপিদূনের* আমলের শরণ নিতে হচ্ছে। খলিফাহ্‌র কী কুরাইশ গোত্রের সদস্য হওয়া উচিত নাকি কোনও *আনসারের* বংশধর গ্রহণযোগ্য? মুহাম্মদ(স:) কি এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য রেখে গেছেন? উত্তরাধিকার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করেছিলেন মুহাম্মদ(স:)? উসমানের হত্যাকাণ্ডের পর আসলে কী ঘটেছিল? মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের মত ঐতিহাসিকগণ (মৃত্যু: ৭৬৭) ওইসমস্ত *আহাদিস* সংগ্রহ শুরু করলেন যেগুলো কুরানের কোনও কোনও অনুচ্ছেদকে পয়গম্বর যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। ইবন ইসহাক পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) এক বিস্তারিত জীবনী (*সিরাহ্*) রচনা করেন যা *আনসারদের* গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মুহাম্মদের(স:) বিরোধিতাকারী মক্কাবাসীদের দুষ্কর্ম তুলে ধরেছে। তিনি স্পষ্টতই শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষ নিয়েছেন যে মুসলিমদের আবু সুফিয়ানদের বংশধরদের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত নয়। এইভাবে ইতিহাস এক ধর্মীয় কাজে পরিণত হয় যা পরস্পরের বিরুদ্ধে নীতিভিত্তিক বিরোধিতাকে যৌক্তিকতা দান করে।

সুতরাং *উম্মাহ্‌র* রাজনৈতিক সুস্থতা উদীয়মান ইসলামী ধার্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। খলিফাহ্ ও তাঁর প্রশাসন যেখানে যেকোনও কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্যের ওপর নেমে আসা নানা সমস্যা মোকাবিলায় এবং একটি শক্তিশালী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন, সেখানে ধার্মিক ব্যক্তিরা এধরনের যেকোনও সমাধানের চরম বিরোধিতা করেছে। সুতরাং একেবারে গোড়া থেকেই কোনও শাসকের আচরণ এবং নীতিমালা এক ধর্মীয় তাৎপর্য পেয়ে এসেছে যার সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের ভাববাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, পবিত্র জুরিসপ্রুডেন্স এবং প্রাথমিক থিয়োলজিক্যাল চিন্তার ভাবনা গভীর বিপরীত সম্পর্ক ছিল।

উমাঈয়াহ্‌দের শেষ বছরগুলো (৭০৫-৭৫০)

অধিকতর ধার্মিক ব্যক্তিদের অসম্মতি সত্ত্বেও আব্দ আল-মালিক তাঁর ছেলে প্রথম আল-ওয়ালিদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন: ইসলামী বিশ্বে প্রথম বারের মত বংশধারার নীতি বিনা আপত্তিতে গৃহীত হয়। উমাঈয়াহ্‌ বংশ এর সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে গিয়েছিল। আল-ওয়ালিদের অধীনে মুসলিম সেনাবাহিনী উত্তর আফ্রিকা অধিকার করে এবং স্পেনে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এটাই ইসলামের পশ্চিম অভিমুখী বিস্তারের সীমা চিহ্নিত করে দেয়। ৭৩২-এ চার্লস মারটেল যখন পয়টিয়ার্সে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করেন, মুসলিমরা একে বড় কোনও বিপর্যয় বলে ভাবেনি। পশ্চিমের লোকজন প্রায়ই পয়টিয়ার্সের গুরুত্বে অতিরঞ্জন আরোপ করে, যা মোটেই ওয়াটারলু ছিল না। আরবরা ইসলামের নামে পশ্চিমে ক্রিশ্চান জগৎ অধিকার করার ধর্মীয় বা অন্য কোনওরকম তাগিদ বোধ করেনি। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ লক্ষ্যণীয়ভাবে অনাকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে: পশ্চাদপদ ওই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ খুব একটা ছিল না, লুণ্ঠিত মালের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হত না, পরিবেশ ছিল জঘন্য।

দ্বিতীয় উমর (৭১৭-২০)-এর শাসনামলের শেষ দিকে ঝামেলায় পড়ে সাম্রাজ্য। প্রাক-আধুনিক যে কোনও সাম্রাজ্যেরই আয়ুষ্কাল ছিল সীমিত, যেহেতু এর ভিত্তি ছিল কৃষিজাত উদ্বৃত্ত, এমন একটা পর্যায় অনিবার্য যখন এক বিশাল সম্পদসারণশীল রাষ্ট্র এর সম্পদ শেষ করে ফেলবে। কনসট্যান্টিনোপল দখল করার এক বিপর্যয়কর প্রয়াসের মাসুল গুনতে হয়েছিল উমরকে, যা কেবল ব্যর্থই হয়নি বরং প্রচুর লোকবল আর সাজসরঞ্জামের ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। উমরই প্রথম খলিফাহ্‌ যিনি *জিম্মিদের* ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন, তারাও গতিশীল নতুন ধর্মবিশ্বাসকে আলিঙ্গন করতে উদগ্রীব ছিল; কিন্তু যেহেতু তাদের আর টোল ট্যাক্স (*জিযিয়াহ্‌*) দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকত না, সে কারণে নতুন নীতি রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বিপুলভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। ধার্মিক মানুষ ছিলেন উমর, যিনি মদীনায় বড় হয়েছেন এবং সেখানকার ধর্মীয় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। নিজের আচরণকে তিনি *রাশিদুনদের* আদলে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন, ইসলামী ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, সকল অঞ্চলকে সমতার ভিত্তিতে বিবেচনা করেছেন (সিরিয়ার প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়ে) আর *জিম্মিদের* প্রতি মানবিক আচরণ করেছেন। অসম্ভব

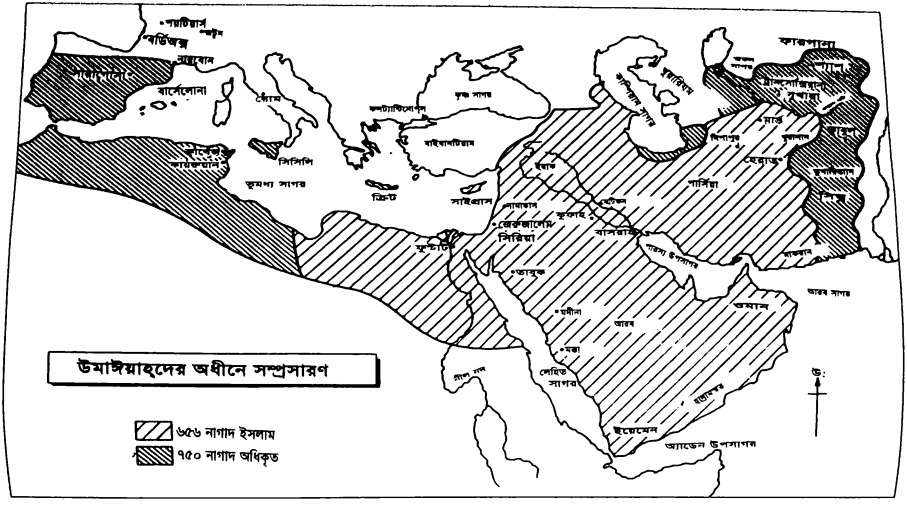

উমাইয়াহদের অধীনে সম্প্রসারণ

জনপ্রিয় ছিলেন তিনি; কিন্তু তাঁর ইসলামী নীতিমালা, যা তাঁকে ধার্মিকদের কাছে আপন করে তুলেছিল, সাম্রাজ্যের রুগ্ন অর্থনীতির জন্য সঠিক ছিল না। তাঁর উত্তরসূরীদের শাসনামলগুলো বিদ্রোহ আর তীব্র অসন্তোষে আকীর্ণ ছিল। খলিফাহ্‌রা দ্বিতীয় ইয়াযিদের (৭২০-২৪) মত অসচ্চরিত্রের হোক কিংবা হিশামের (৭২৪-৪৩) মত ধার্মিকই হোন, তাতে আর কিছু এসে যায়নি। হিশাম শক্তিশালী এবং কার্যকর খলিফাহ্ ছিলেন, সাম্রাজ্যকে অধিকতর শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রকে কঠোরভাবে কেন্দ্রীকরণ এবং আপন শাসনকে আরও স্বৈরাচারী করার ফলে। তিনি অধিকহারে প্রচলিত একচ্ছত্র রাজাধিপতিতে পরিণত হচ্ছিলেন, এতে রাজনৈতিক দিক দিয়ে সাম্রাজ্য লাভবান হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হল, এধরনের স্বৈরাচারী ব্যবস্থা আবার ধার্মিকদের চোখে ঘৃণিত এবং মৌলিকভাবে অনৈসলামিক। তবে কি নীতির ভিত্তিতে কোনও রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়? শিয়ারা ক্রমবর্ধমান হারে সক্রিয় হয়ে উঠছিল। তাদের নেতারা আলীর বংশধর হিসাবে দাবী করেন নিজেদের, তাঁদের বিশ্বাস ছিল, যে ইলম মুসলিমদের ন্যায়-বিচারভিত্তিক সমাজ গঠনে সক্ষম করে তুলতে পারে তা কেবল মুহাম্মদের(সঃ) পরিবারের মাঝেই সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আছে এবং কেবল তাদেরই শাসন করার অধিকার আছে। অধিকতর চরমপন্থী শিয়ারা উম্মাহ্‌র বর্তমান সব সমস্যার জন্য প্রথম তিন *রাশিদুন*কে (আবু বকর, উমর এবং উসমান) দায়ী করে, যাঁদের উচিত ছিল প্রথমেই আলীর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়া। আরও চরমপন্থী শিয়াদের (*ঘুলাত*: অতিরঞ্জনকারী হিসাবে পরিচিত) বেশীর ভাগ ছিল ধর্মান্তরিত মুসলিম এবং তারা তাদের পুরনো কিছু বিশ্বাসও বজায় রেখেছিল। আলীকে তারা ঈশ্বরের এক অবতার (জেসাসের মত) হিসাবে দেখেছে, তাদের বিশ্বাস ছিল বিদ্রোহে নিহত শিয়া নেতৃবৃন্দ এক অস্থায়ী "গোপন স্থানে" ("occultation") অবস্থান করছেন এবং তাঁরা শেষ জমানায় ন্যায়-বিচার ও শান্তির এক স্বপ্নরাজ্যের উদ্বোধন করার জন্য ফিরে আসবেন।

কিন্তু কেবল ধার্মিক ব্যক্তিরাই উমাইয়াহ্‌দের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বোধ করেনি। ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারী (*মাওয়ালি*: ক্লায়েন্ট) তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মর্যাদায় আপত্তি উত্থাপন করে। আরব মুসলিমদের গোত্রীয় বিভাজনও ছিল, যাদের কেউ কেউ সাধারণ প্রজাদের মাঝে বসতি স্থাপন করে তাদের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে, আবার অন্যরা পুরনো সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। কিন্তু ইসলামী সেন্টিমেন্ট এমন ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে বিভিন্ন বিদ্রোহ আর আন্দোলনের সকল পক্ষই ধর্মীয় কোনও আদর্শ বেছে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উমাইয়াহ্ রাজবংশকে উৎখাতকারী বিদ্রোহের বেলায় এ কথাটি সর্বাংশেই সত্যি। আব্বাসীয় উপদলটি সিংহাসনে মুহাম্মদের(সঃ) পরিবারের কোনও সদস্যকে দেখার ব্যাপক আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে এবং জোর দিয়ে বলে যে তাদের নেতা পয়গম্বরের চাচা আব্বাস এবং তাঁর পুত্র প্রাথমিক কালের কুরান আবৃত্তিকারকদের অন্যতম

আবদুল্লাহ্‌র বংশধর। ৭৪৩-এ তারা ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয় এবং ৭৪৯-এর আগস্টে কুফাহ্ অধিকার করে নেয়, এর পরের বছর ইরাকে শেষ উমাইয়াহ্ খলিফাহ্ দ্বিতীয় মনসুরকে পরাস্ত করে। অবশেষে যখন তারা সাম্রাজ্য অধিকার করে নেয়, আব্বাসীয় খলিফাহ্‌গণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমাজ গঠন শুরু করেন।

আব্বাসীয় যুগ: খেলাফতের সুবর্ণসময় (৭৫০-৯৩৫)

নিজেদের সযত্নে শিয়া আলোয় তুলে ধরার মাধ্যমে সমর্থন আদায় করেছিল আব্বাসীয়রা, কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণের পর তারা এই ধর্মীয় ক্যামোফ্লাজ ঝেড়ে ফেলে এবং পরিষ্কার করে দেয় যে, প্রচলিত কৃষিভিত্তিক চরম রাজতন্ত্র গড়ে তুলতে তারা বদ্ধ পরিকর। প্রথম আব্বাসীয় খলিফাহ আবু আল-আব্বাস আল-সাফাহ (৭৫০-৫৪) যেখানে উমাইয়াহদের যাকে পেয়েছেন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। এর আগে পর্যন্ত কোনও অভিজাত আরব পরিবারের সকল সদস্যেকে নির্বিচারে হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল অকল্পনীয়। খলিফাহ আবু জাফর আল-মনসুর (৭৫৪-৭৫) তাঁর ক্ষমতার প্রতি হুমকি বিবেচিত সকল শিয়া নেতাকে হত্যা করান। এই খলিফাহগণ নিজেদের এমন ধরনের উপাধি দিয়েছিলেন যাতে ক্ষমতাকে স্বর্গপ্রদত্ত অধিকার বোঝায়। আল-মনসুর বোঝায় যে বিজয় অর্জনে ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ সাহায্য দেবেন: তাঁর ছেলে আল-মাহদি (পথপ্রাপ্ত) উপাধি নিয়েছিলেন, শিয়ারা এ উপাধিটি প্রয়োগ করে এমন নেতার কথা বোঝানোর জন্য যিনি ন্যায় বিচার আর শান্তির কাল প্রতিষ্ঠা করবেন।

উপাধি নির্বাচন করার সময় খলিফাহ আল-মাহদি (৭৭৫-৮৫) হয়ত শিয়াদের তাঁর পিতার সংঘটিত রক্তপাতের ঘটনার পর সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। উমাইয়াহদের পতন ত্বরান্বিতকারী অসন্তোষের ব্যাপারে সচেতন ছিল আব্বাসীয়রা এবং উপলব্ধি করেছিল যে তাদের অবশ্যই বিক্ষুব্ধ দলগুলোর কাছে কিছু ছাড় দিতে হবে। যদিও তারা নিজেরা আরব ছিল, কিন্তু তাদের বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যে আরবদের বিশেষ সুবিধা লাভের প্রচলিত রেওয়াজের অবসান ঘটে। তারা দামাস্কাস থেকে ইরাকে রাজধানী সরিয়ে নেয়, প্রথমে কুফাহ্ এবং পরে বাগদাদে স্থায়ী হয়। তারা সকল অঞ্চলকে একইভাবে শাসন করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কোনও জাতিগত গোষ্ঠীকে বিশেষ মর্যাদা না দেয়ার ঘোষণা দেয় যা *মাওয়ালিদের* সন্তুষ্ট করেছিল। সাম্রাজ্য এই অর্থে সাম্যবাদী ছিল যে যে-কোনও লোকের পক্ষে রাজদরবার বা আদালতে হাজির হওয়া সম্ভব ছিল তখন। কিন্তু কুফাহ্ থেকে বাগদাদে স্থানান্তর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। খলিফাহ্গণ পুরনো গ্যারিসন শহরগুলোর আবহ পেছনে ফেলে গেছেন, যেগুলো প্রাচীন গোত্রীয় নকশানুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখানে প্রত্যেক অংশ ছিল সমান ও স্বাধীন। বাগদাদের কেন্দ্রস্থল ছিল

বিখ্যাত "রাউন্ড সিটি" যেখানে প্রশাসন, রাজদরবার আর রাজপরিবারের অবস্থান ছিল। বাজার আর কর্মী ও দাসদের আবাসস্থলের অবস্থান ছিল সীমানায়। টাইগ্রিসের তীরে ইরাকের কৃষিভিত্তিক সোয়াদের কাছাকাছি এক সুবিধাজনক স্থানে নির্মিত হয়েছিল বাগদাদ, কিন্তু তা পারসিয়ান স্যাসানিয়দের রাজধানী সেটিফনেরও কাছাকাছি ছিল: এবং নতুন খেলাফত প্রাচীন প্রাক-ইসলামী ধারায় গড়ে উঠেছিল।

খলিফাহ্ হারুন আল-রশিদের (৭৮৬-৮০৯) আমল নাগাদ পরিবর্তন চূড়ান্ত হয়ে যায়। আল-রশিদ *রাশিদুনদের* মত নয়, বরং প্রাচীন কেতার রাজাধিরাজের মত শাসন করেছেন। প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তিনি, প্রথম খলিফাহ্দের আমলের বৈশিষ্ট্য, অনানুষ্ঠানিকতার স্থান দখল করে নিয়েছিল চোখ টাটান জাঁকজমক। দরবারের সদস্যরা তাঁর সামনে উপস্থিত হবার পর এমন ভঙ্গিতে মাটিতে চুম্বন করতে যা খোদ আরবরা যখন ঈশ্বরের সামনে নত হয়েছিল সেই সময় চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল। পয়গম্বরকে যেখানে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ধরেই সম্বোধন করা হত খলিফাহ্ সেখানে "পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া" উপাধি ধারণ করে বসেন। খলিফাহ্র পেছনে জল্লাদ দাঁড়িয়ে থাকত একথা বোঝাতে যে তাঁর প্রাণ দেয়া এবং নেয়ার ক্ষমতা আছে। উম্মাহ্র খবরদারি আর নিজে করছিলেন না খলিফাহ্ বরং উজিরের হাতে সরকারের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ভূমিকা দাঁড়িয়েছিল চূড়ান্ত আপীলের দরবার হিসাবে, উপদল বা রাজনীতিকদের নাগালের বাইরে। শুক্রবার অপরাহ্নের প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতেন তিনি আর বড় ধরনের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে থাকতেন। অবশ্য সেনাবাহিনীও বদলে গিয়েছিল। এটা আর তখন যেকোনও মুসলিমের জন্যে উন্মুক্ত জনগণের সেনাদল ছিল না, বরং পারসিয়দের একটি বাহিনী হয়ে গিয়েছিল যারা আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আরোহণে সাহায্য করেছিল, খলিফাহ্র ব্যক্তিগত বাহিনী হিসাবে বিবেচনা করা হত তাদের।

এটা অবশ্যই ধর্মীয় আন্দোলনের চোখে ঘৃণিত ছিল– আব্বাসীয়রা প্রথম ক্ষমতায় আসার সময় যাদের সদস্যরা আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু যত অনৈসলামিকই হোক না কেন গোড়ার দিকে নয়া খেলাফত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সফল ছিল। প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল খলিফাহ্র দায়িত্ব এবং হারুন আল-রশিদের অধীনে, খেলাফত যখন তুঙ্গ সময়ে অবস্থান করছে, সম্রাজ্য নজিরবিহীন শান্তি প্রত্যক্ষ করে। অভ্যুত্থানসমূহ নির্দয়ভাবে দমন করা হয়েছিল, জনগণ বুঝতে পেরেছিল যে এই শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা বৃথা, কিন্তু ভাল দিক ছিল এই যে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে অধিকতর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পেরেছে। চিত্রকলা আর বিদ্যা অর্জনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হারুন আল-রশিদ, এক মহান সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি। সাহিত্য সমালোচনা, দর্শন, কাব্য, ওষুধ, গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যা কেবল বাগদাদেই নয় বরং কুফাহ্, বসরাহ্, জানজিবার এবং হারানেও বিকাশ লাভ

করেছিল। *জিম্মিরা* ক্লাসিক্যাল হেলেনিজমের দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক বিবরণ গ্রিক এবং সিরিয়াক থেকে আরবীতে অনুবাদ করে এই আলোকময় কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। এভাবে অতীতের শিক্ষা নাগালে আসায় এর ওপর ভিত্তি করে মুসলিম পণ্ডিতগণ এই সময়কালে অতীতের লিপিবদ্ধ গোটা ইতিহাসের চেয়ে ঢের বেশী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিল্প আর বাণিজ্যও বিকশিত হয় আর অভিজাতরা উন্নত এবং বিলাসী পরিবেশে বাস করে। কিন্তু এই শাসনামলটি কিভাবে ইসলামী সেটা বোঝা কঠিন। খলিফাহ্ এবং তাঁর সঙ্গীরা দারুণ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতেন যার সঙ্গে পয়গম্বর এবং *রাশিদুনদের* সরল জীবন ধারার প্রকট বৈপরীত্য ছিল। কুরান নির্দেশিত চারজন স্ত্রীতে নিজেদের সীমিত রাখার বদলে তাঁদের স্যাসানিয় রাজাদের মত বিরাট হারেম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংস্কারকদের পক্ষে আব্বাসীয়দের মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইসলাম একটা বাস্তববাদী ও বাস্তবমুখী ধর্ম বিশ্বাস যা সাধারণভাবে শহীদি চেতনা বা অর্থহীন ঝুঁকি গ্রহণ উৎসাহিত করে না।

এই বাস্তববাদীতা বিশেষভাবে শিয়াদের মাঝে বেশী দেখা যায়। কারবালাহ্য় হুসেইনের দুঃখজনক মৃত্যুর পর তাঁর নিকট বংশধরেরা মদীনায় যথারীতি ধার্মিকের জীবনযাপন করে গেছেন, যদিও অনেকেই তাঁদের *উম্মাহ্র* সঠিক *ইমাম* হিসাবে দেখেছিল। হুসেইনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী যায়েন আল-আবিদিন (মৃত্যুঃ ৭১৪), শিয়ারা যাকে চতুর্থ ইমাম হিসাবে জানে– যেহেতু তিনি আলী, হাসান এবং হুসেইনের পরবর্তীজন ছিলেন– একজন সাধু ছিলেন, চমৎকার এক প্রার্থনা সংকলন রেখে গেছেন তিনি।[৩] পঞ্চম ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (মৃত্যুঃ ৭৩৫) কুরান পাঠের এক গূঢ় পদ্ধতির আবিষ্কার করেনঃ কুরানের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পঙক্তির একটি গোপন (*বাতিন*) অর্থ রয়েছে, যা কেবল মনোযোগ নিবদ্ধ করার অতীন্দ্রিয় কৌশলের সাহায্যেই উপলব্ধি করা সম্ভব, এসব কৌশল অন্যান্য বিশ্ব ধর্মে বিকাশিত সত্তার গভীরে প্রবেশ করার পদ্ধতির অনুরূপ। এই *বাতিন* অর্থই সম্ভবত ইমামতি সম্পর্কে আল-বাকিরের নতুন মতবাদের ব্যাখ্যা দেয়। তাঁর ভাই যায়েদ ইবন আলী একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ৭৪০-এ উমাইয়াহ্দের বিরুদ্ধে সংঘটিত এক অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান। সে সময়ের *ইমাম* হিসাবে যায়েদের দাবীর বিপরীতে আল-বাকির যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে পয়গম্বরের অনন্য *ইল্ম* আলীর নিকটতম বংশধরদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে। প্রত্যেক *ইমাম* তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং ঐশীগ্রন্থের গুপ্ত অর্থ আবিষ্কারে সক্ষম করার জন্য গুপ্তবিদ্যা তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে। একমাত্র *ইমাম* যিনি তাঁর পূর্বসূরীর কাছ থেকে বিশেষ খেতাব (*নাস*) লাভ করেছেন তিনিই মুসলিমদের বৈধ নেতা। তিনি– আল-বাকির- তাঁর পিতার কাছ থেকে *নাস* পেয়েছেন, যায়েদ পাননি। অবশ্য ৭৪০-এ অল্প সংখ্যক অনুসারী ছিল আল-বাকিরের; অধিকাংশ শিয়া আল-বাকিরের অতীন্দ্রিয়বাদী শান্তি বাদের চেয়ে যায়েদের বিপ্লবী নীতিমালা বেশী পছন্দ করেছিল। কিন্তু শিয়া ভিন্ন

মতাবলম্বীর ওপর আব্বাসীয়দের নির্বিচার নিষ্ঠুর নিপীড়নের প্রেক্ষিতে তারা ষষ্ঠ ইমাম জাফর আল-সাদিকের (মৃত্যু: ৭৬৫) নির্দেশনা মানতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, আল-সাদিক স্বয়ং আল-মনসুর কর্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। আল-সাদিক *নাসের* মতবাদকে উন্নত এবং নিশ্চিত করে ঘোষণা দেন যে যদিও নির্বাচিত ইমাম হিসাবে তিনিই *উম্মাহ*র প্রকৃত নেতা, কিন্তু তিনি তাঁর প্রজন্মকে স্বর্গীয় ইলম শিক্ষা দেবেন এবং কুরানের *বাতিন* পাঠে পথনির্দেশ যোগাবেন, কিন্তু শিয়াদের অবশ্যই এই বিপদসঙ্কুল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের সব মতবাদ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস গোপন রাখতে হবে।

কিন্তু এই মতবাদ কেবল সংখ্যালঘু অতীন্দ্রিয়বাদে আগ্রহী অভিজাতদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকাংশ মুসলিমের আরও সহজগম্য ধার্মিকতা প্রয়োজন ছিল এবং এক নতুন ধরনের ভক্তিতে সেটা তারা আবিষ্কার করে, যা উমাঈয়াহ্ শাসনামলের শেষদিকে আবির্ভূত হলেও হারুন আল-রশিদের আমলে ব্যাপকতা লাভ করে। এটা জেসাসের প্রতি ক্রিশ্চানদের ভক্তিবাদের অনুরূপ, যেহেতু এখানে কুরানকে ঈশ্বরের অনির্মিত বাণী (Uncreated Word) হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা অনন্তকাল ধরে তাঁর সঙ্গে অস্তিত্ববান ছিল এবং যা, যেমন বলা হয়ে থাকে, মুহাম্মদের(স:) কাছে প্রত্যাদিষ্ট ঐশীগ্রন্থের ভেতর রক্তমাংসের মনুষ্যরূপ নিয়েছে। মুসলিমরা ঈশ্বরকে দেখতে পায় না, কিন্তু যখনই তারা কুরানের আবৃত্তি শোনে তখন তাঁর কথা শুনতে পায় এবং স্বর্গীয় সত্তায় প্রবেশের অনুভূতি লাভ করে। যখন তারা অনুপ্রাণীত বাণী উচ্চারণ করে, ঈশ্বরের বক্তব্য তাঁদের জিহবা আর মুখে আন্দোলিত হয়; যখন তারা পবিত্র গ্রন্থটি ধারণ করে তখন তাঁকেই হাতে পায়। এ বক্তব্য মুতাযিলাদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, যেহেতু এটা তাদের যুক্তিনির্ভর ধার্মিকতা এবং ঈশ্বরের একত্ব এবং পরম সরলতার ধারণাকে আক্রান্ত করেছিল। এ মতবাদ যেন কুরানকে দ্বিতীয় স্বর্গীয় সত্তায় পরিণত করেছিল। কিন্তু গুপ্ত শিয়ার মত মুতাযিলা মতবাদও সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের বিষয় ছিল এবং কুরানের প্রতি এই ভক্তি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর অনুসারীগণ *আহল আল-হাদিস*, হাদিসের জনগণ নামে পরিচিতি লাভ করে, কারণ তারা জোর দিয়ে বলেছে মুসলিমদের আইনকে অবশ্যই পয়গম্বরের আদর্শ এবং সাধারণ অনুশীলনের (*সুন্নাহ্*) প্রত্যক্ষদর্শীর "প্রতিবেদনে"র ভিত্তিত প্রণীত হতে হবে। তারা আবু হানিফাহ্র অনুসারীদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে, যিনি মনে করেছিলেন যে জুরিস্টদের "স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগের" (*ইজতিহাদ*) ক্ষমতা ব্যবহার করা আবশ্যক। তাঁর যুক্তি ছিল, তাঁদের অবশ্যই নতুন নতুন আইন নির্মাণের স্বাধীনতা থাকতে হবে, যদি কোনও *হাদিস* বা কুরানের কোনও উচ্চারণের ওপর নির্ভর করতে নাও পারেন।

সুতরাং *আহল আল-হাদিস'রা* ছিল রক্ষণশীল: এক আদর্শে রূপান্তরিত অতীতের প্রেমে নিমগ্ন ছিল তারা; সকল *রাশিদুন*কে শ্রদ্ধা করত তারা এবং এমনকি পয়গম্বরের অন্যতম সহচর মুয়াবিয়াহ্কেও। মুতাযিলাদের বিপরীতে– যাদের প্রায়ই

স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী হতে দেখা গেছে– তারা জোর দিয়ে বলেছে "সৎ কাজে নির্দেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেয়া"র দায়িত্ব কেবল নগণ্য সংখ্যকের; নিম্ন পর্যায়ের লোকদের অবশ্যই খলিফাহ্কে মানতে হবে, তাঁর ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক না কেন। হারুন আল-রশিদের কাছে এ বক্তব্য আকর্ষণীয় *ঠেকেছিল*। আরও ধর্মীয় আন্দোলনের শুভেচ্ছা লাভের দরকার ছিল তাঁর, *আহল আল-হাদিসের* প্রতি-বিপ্লবাত্মক প্রবণতার অনুমোদন দেন তিনি। মুতাযিলারা বাগদাদের সুনজরে থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং হাদিসের জনগণ তাদের সামাজিকভাবে একঘরে করার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কখনও কখনও তাদের অনুরোধে সরকার এমনকি নেতৃস্থানীয় মুতাযিলাদের কারাগারেও নিক্ষেপ করে।

ধর্মীয় আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল আব্বাসীয়রা, ফলে রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় সফল হওয়ার পর তারা নিজেদের শাসনকে ইসলামী বৈধতা দেয়ার প্রয়াস পায়। সেকারণেই তারা জনগণের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে *ফিকহ্'র* বিকাশ উৎসাহিত করেছে। সাম্রাজ্যে এক ধরনের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ জনগণের জীবনধারা প্রকৃতই শরিয়াহ্ নামে আখ্যায়িত ইসলামী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু রাজদরবার বা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে মুসলিম নীতিমালা প্রয়োজ্য হয়নি। তারা আব্বাসীয় শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রাক-ইসলামী স্বৈরাচারী নিয়মকানুনের প্রতিই বেশী অনুরক্ত ছিল।

উমাঈয়াহ্দের অধীনে প্রত্যেক শহরে আলাদা নিজস্ব *ফিক্হ* গড়ে *ওঠে*, কিন্তু আব্বাসীয়রা আরও সংহত আইনগত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে জুরিস্টদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। কুরানের আমলের তুলনায় মুসলিম জীবনযাত্রা আমূল বদলে গিয়েছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছিল বলে *জিম্মিরা* সংখ্যালঘু দলে পরিণত হচ্ছিল। মুসলিমরা আর গ্যারিসন শহরে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন ছোট অভিজাত গ্রুপ ছিল না। তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিমদের কেউ কেউ সম্প্রতি ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল, তখনও তারা তাদের পুরনো বিশ্বাস আর আচার অনুষ্ঠানে আঁকড়ে রেখেছিল। জনগণের জন্য ইসলামী জীবন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অধিকতর সংহত এবং স্বীকৃত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। *উলেমাদের* (ধর্মীয় পণ্ডিত: একবচনে: *আলিম*) একটা আলাদা শ্রেণী আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল তখন। বিচারকগণ (*কাজি*) আরও কঠোর প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। আল-মাহ্দি এবং হারুন আল-রশিদ দু'জনই *ফিক্হ্'র* পৃষ্ঠপোষক হওয়ার মাধ্যমে আইন গবেষণায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। দু'জন অসাধারণ পণ্ডিত চিরন্তন অবদান রেখে গেছেন। মদীনায় মালিক ইবন আনাস (মৃত্যু: ৭৯৫) একটি সংকলন গ্রন্থিত করেন যার নাম *আল-মুতাওয়াত্তাব (দ্য বীটেন পাথ: The Beaten Path)*। এটা ছিল মদীনার প্রচলিত আইন ও ধর্মীয় অনুশীলনের বিস্তারিত বিবরণ যা পয়গম্বরের সমাজের মূল বা আদি *সুন্নাহ্* ধরে রেখেছে বলে মালিকের বিশ্বাস ছিল। মালিকের

অনুসারীরা তাঁর ধর্মতত্ত্ব সমূহকে মালিকি মতবাদ (*মাযহাব*) হিসাবে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছিল যা মদীনা, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

কিন্তু অন্যরা একথা মানতে চায়নি যে, বর্তমান কালের মদীনা আদি ইসলামের পথে সত্যিই নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক হতে পারে। মুহাম্মদ ইদ্রিস ইবন আল-শাফী (মৃত্যু: ৮২০), গাযায় দারিদ্র্যের মধ্যে যাঁর জন্ম এবং যিনি মদীনায় মালিকের সঙ্গেই পড়াশোনা করেছিলেন, যুক্তি তুলে ধরেন যে মাত্র একটি ইসলামী শহরের ওপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়, এর মর্যাদা যত উন্নতই হোক না কেন। তাঁর পরিবর্তে সকল জুরিসপ্রুডেন্সের ভিত্তি হওয়া উচিত পয়গম্বর সম্পর্কিত *আহাদিস*, যাঁকে কেবল কুরানের প্রচারক হিসাবে নয় বরং অনুপ্রাণিত ব্যাখ্যাকারী হিসাবে দেখা উচিত। ঐশীগ্রন্থের নির্দেশ ও আইন-কানুন মুহাম্মদের(স:) বাণী এবং কর্মধারার আলোকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু, শাফী জোর দিয়ে বললেন যে, প্রত্যেকটা *হাদিস*কে অবশ্যই নির্ভরযোগ্যভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের একটি পরম্পরা (*ইসনাদ*) দ্বারা স্বয়ং পয়গম্বর অবধি সমর্থিত হতে হবে। *ইসনাদকে* অবশ্যই কঠোরভাবে যাচাই করতে হবে। যদি পরম্পরায় বিচ্যুতি ঘটে বা কোনও "সংযোগকারী"কে যদি অবিশ্বস্ত মুসলিম হতে দেখা যায়, তাহলে *হাদিসটিকে* অবশ্যই বাদ দিতে হবে। আল-শাফী *আহল আল-হাদিস* এবং *ইজতিহাদের* প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপকারী আবু হানিফাহ্‌র মত জুরিস্টদের মাঝে মধ্যস্থতার প্রয়াস পেয়েছিলেন; শাফী একটা মাত্রা পর্যন্ত *ইজতিহাদের* প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, একে পয়গম্বরের রীতি (customs) আর সমসাময়িক আচার অনুষ্ঠানের কঠোর মিলের (*কিয়াস*) মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। আল-শাফী শিক্ষা দিয়েছেন পবিত্র আইনের (*উসুল আল-ফিক্‌হ*) চারটি "মূল" রয়েছে: কুরান, পয়গম্বরের *সুন্নাহ*, কিয়াস (analogy) এবং *ইজমাহ*, সমাজের "ঐকমত্য" (consensus)। ঈশ্বর সমগ্র *উম্মাহ*কে ভ্রান্তিতে আক্রান্ত হতে দিতে পারেন না, সুতরাং কোনও আচার যদি সকল মুসলিম কর্তৃক গৃহীত হয়, তাকে অবশ্যই সঠিক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যদি এর সমর্থনে কুরানের কোনও সূত্র বা *হাদিস* নাও পাওয়া যায়। আল-শাফীর পদ্ধতি– সঠিকতার আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী পয়গম্বরের *সুন্নাহ*র কঠিন এতিহাসিক বাস্তবতা নিশ্চিত করার উপযুক্ত ছিল না– কিন্তু এতে করে গভীর এবং সন্তোষজনক ধর্মীয় অনুভূতি দানকারী একটা জীবনধারা নির্মাণের অবলম্বন পেয়েছিল মুসলিমরা।

আল-শাফীর অসাধারণ কাজের ফলে অন্য পণ্ডিতগণ তাঁর মানদণ্ড অনুযায়ী *আহাদিস* পর্যবেক্ষণায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আল-বুখারি (মৃত্যু: ৮৭০) এবং মুসলিম (মৃত্যু: ৮৭৮) দু'টি নির্ভরযোগ্য এবং কর্তৃত্বপূর্ণ সংকলন সম্পাদন করেন যা *ফিক্‌হ*'র প্রতি আগ্রহ জোরাল করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত শরিয়াহ্ আইনের ভিত্তিতে এক বিশাল ইসলামী সমরূপ ধর্মীয় জীবন সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে। আইনের অনুপ্রেরণা ছিলেন ব্যক্তি পয়গম্বর, সাম্রাজ্য জুড়ে আদর্শ মানুষ। তাঁর ব্যবহারিক

জীবনের তুচ্ছ বিষয়টির অনুকরণের মাধ্যমে– তাঁর খাদ্য গ্রহণের ভঙ্গি, হাত-মুখ ধোয়া, ভালোবাসা, কথপকথন আর প্রার্থনার ভঙ্গি অনুকরণ করে মুসলিমরা ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণের তাঁর নিখুঁত ভঙ্গি অর্জনের আশা করে থাকে। ধর্মীয় আচরণ এবং ধারণাসমূহের ভিত্তি পাওয়ার কারণ এই নয় যে সেগুলো শক্তিমান থিয়োলজিয়ান দ্বারা প্রচারিত বা সেগুলোর শক্ত ঐতিহাসিক বা যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে; বরং এগুলো অনুসৃত হতে দেখা যাওয়ার কারণ বিশ্বাসীকে তা পবিত্র অলৌকিকের অনুভূতি যোগায়। মুসলিমরা আজও গভীরভাবে শরিয়াহ্‌কে আঁকড়ে রেখেছে যা তাদের খুবই গভীর স্তরে মুহাম্মদের(স:) আদর্শ চরিত্রকে আত্মীকরণে সাহায্য করে এবং তাঁকে সপ্তম শতাব্দী থেকে মুক্ত করে এনে তাদের জীবনে জীবন্ত সত্তা এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে।

কিন্তু অন্য সকল ইসলামী ধার্মিকতার মত শরিয়াহ্‌ও রাজনৈতিক। এতে ধার্মিকদের চোখে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিধান রয়েছে। মালিক ইবন আনাস এবং আল-শাফী উভয়েই আব্বাসীয়দের সূচনার দিকে শিয়া বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন, উভয়কেই তাঁদের রাজনীতির কারণে কারাভোগ করতে হয়েছিল, যদিও আল-মাহ্‌দি এবং হারুন আল-রশিদ তাঁদের মুক্তি এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন– যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্য জুড়ে একটা একক আইনগত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শরিয়াহ্‌ রাজদরবারের আভিজাত্য ও বিশেষ প্রথা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা খলিফাহ্‌র ক্ষমতাকে সীমিত করেছে, জোরের সঙ্গে বলেছে যে তাঁর ভূমিকা পয়গম্বর বা *রাশিদুনদের* অনুরূপ নয়, বরং তাঁকে পবিত্র আইন প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। রাজদরবারের সংস্কৃতি এভাবে পরোক্ষে অনৈসলামিক হিসাবে নিন্দিত হয়েছে। কুরানের মত শরিয়াহ্‌র বৈশিষ্ট্যও সাম্যবাদী। দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ বিধি-বিধান রয়েছে এতে এবং খেলাফত বা রাজদরবারের মত কোনও প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং বিশ্বাসে নাক গলানোর কোনও ক্ষমতা ছিল না। প্রত্যেক মুসলিমের ঈশ্বরের নির্দেশ প্রতিপালন করার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এবং কোনও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান ("গির্জার" মত) এবং "পুরহিত"দের বিশেষায়িত কোনও দল ঈশ্বর এবং ব্যক্তি মুসলিমের মধ্যে নাক গলাতে পারবে না। সকল মুসলিমের অবস্থান সমপর্যায়ের, এখানে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যাজকগোষ্ঠী বা পুরহিততন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। এভাবে রাজদরবারের মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মান অনুযায়ী সমাজ পুর্নগঠনের একটা প্রয়াস ছিল শরিয়াহ্‌। একটা পাল্টা সংস্কৃতি আর প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল এর উদ্দেশ্য যা অচিরেই একে খেলাফতের বিরুদ্ধে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

হারুন আল-রশিদের শাসনামলের শেষনাগাদ এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে খেলাফত এর তুঙ্গ সময় অতিক্রম করে এসেছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আর নির্যাতনের আধুনিক উপায় আবিষ্কারের আগে একক সরকারের পক্ষে এমন বিশাল

সাম্রাজ্য অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। স্পেনের (যেখানে একজন পলাতক উমাইয়াহ্ ৭৫৬-তে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন) মত সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছিল। অর্থনীতির পড়তি দশা চলছিল। সাম্রাজ্যকে দুই পুত্রের মাঝে ভাগ করে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছিলেন হারুন আল-রশিদ, কিন্তু তাতে কেবল তাঁর মৃত্যুর পর দু'ভাইয়ের মাঝে গৃহযুদ্ধই (৮০৯-১৩) পাওয়া গেছে। এটা ছিল রাজদরবারের সেক্যুলার চেতনার লক্ষণ, অতীতের *ফিৎনাহ্* যুদ্ধের বিপরীতে এই সংঘাতে কোনও আদর্শিক বা ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল না, এটা ছিল স্রেফ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংঘাত। আল-মামুন যখন বিজয়ী হিসাবে আবির্ভূত হয়ে শাসন শুরু করেন (৮১৩-৩৩), তখন এটা স্পষ্ট ছিল যে সাম্রাজ্যের দু'টি প্রধান ক্ষমতা বলয় রয়েছে। একটা রাজদরবারের অভিজাত গোষ্ঠী, অন্যটি শরিয়াহ্-ভিত্তিক সাম্যবাদী এবং "সংবিধানবাদী" গোষ্ঠী।

নিজের নাজুক শাসন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন আল-মামুন। গৃহযুদ্ধ, কুফাহ্ এবং বসরাহয় শিয়া বিদ্রোহ (৮১৪-১৫), এবং খুরাসানে *খারেজি* বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে সূচিত হয়েছিল তাঁর রাজত্ব। এইসব বিক্ষুব্ধ গ্রুপকে বশ মানানোর প্রয়াস পেয়েছেন তিনি যাতে ধর্মীয় টানাপোড়েন হ্রাস পায়। কিন্তু তাঁর অনুসৃত নীতি পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়। নিজে বুদ্ধিজীবী হওয়ায় স্বভাবতই মুতাযিলাদের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেছেন এবং তাদের আবার আনুকূল্যে ফিরিয়ে এনেছেন। এটাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঐশী আইন প্রত্যেক মুসলিমের সরাসরি বোধগম্য বলে দাবীদার *আহল আল-হাদিসের* জনপ্রিয় আন্দোলন একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। যাহোক, আবার ক্ষমতার কাছাকাছি আসায় মুতাযিলারা এতদিন ধরে তাদের ওপর নিপীড়ন পরিচালনাকারী *আহল আল-হাদিসের* ওপর চড়াও হয়। এক "ইনকুইজিশন" (*মিহ্নাহ্*) শুরু হয়েছিল যার ফলে নেতৃস্থানীয় 'হাদিসপন্থী'রা, যেমন উল্লেখযোগ্য, জনপ্রিয় আহমাদ ইবন হানবাল (মৃত্যু: ৮৩৩) কারারুদ্ধ হন। ইবন হানবাল পরিণত হন গণমানুষের নেতায়। মুতাযিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা দান আল-মামুনের জন্য কোনও ফায়দা বয়ে আনেনি; বরং সাধারণ জনগণকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এক পর্যায়ে, শিয়াদের অষ্টম ইমাম আলী আল-রিদাকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে শিয়াদের কাছে টানার প্রয়াস পান খলিফাহ্, কিন্তু মুতাযিলাদের মত শিয়ারাও স্রেফ আরেকটা সংখ্যালঘু আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিজীবী অভিজাত গোষ্ঠী ছিল বলে সাধারণ নাগরিকদের সমর্থন আদায় করতে পারেনি। কয়েক মাস পরে সুবিধাজনকভাবেই পরলোকগমন করেন আল রিদা –সম্ভবত: বাঁকা পথে।

পরবর্তী খলিফাহ্গণও শিয়াদের কাছে টানার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপদলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালান, কিন্তু কোনও ফল মেলেনি তাতে। খলিফাহ্ আল-মুতাসিম (৮৩৩-৪২) সেনাবাহিনীকে ব্যক্তিগত বাহিনীতে পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এই সৈন্যরা ছিল

তুর্কি ক্রীতদাস যাদের ওক্সাস নদীর অপর পাড় থেকে ধরে এনে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই পদক্ষেপ তাঁকে জনগণ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তার্কিশ সৈন্য ও বাগদাদের জনগণের ভেতর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনা দূর করতে খলিফাহ্ আনুমানিক ষাট মাইল দক্ষিণে, সামারায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু এতে করে তাঁর বিচ্ছিন্নতা আরও বৃদ্ধি পায়। এদিকে জনগণের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কবিহীন তুর্কিরা দশকে দশকে ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত খলিফাহ্দের কাছ থেকে সাম্রাজ্যের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণভার ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করে তারা। নবম শতাব্দীর শেষ এবং দশম শতাব্দীর শুরুর দিকে যেসব ভঙ্গি শিয়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিবেদিত ছিল বলে অতীন্দ্রিয়বাদী শান্তি বাদের পথে পা বাড়ায়নি তাদের দ্বারা অসংখ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়।

কিন্তু রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের এই সময়কালে সুন্নী ইসলাম নামে পরিচিতি হয়ে ওঠা অংশটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বিভিন্ন আইনবিদ, মুতাযিলা এবং *আহল আল-হাদিস* তাদের মতভেদ বিসর্জন দিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি হয়। এই প্রক্রিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আবু আল-হাসান আল-আশারি (মৃত্যু: ৯৩৫), যিনি মুতাযিলা এবং হাদিসপন্থীদের থিয়োলজি সমন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত মুতাযিলারা ঈশ্বরের মানুষরূপী ধারণার প্রতি এতই আতঙ্কিত ছিল যে ঈশ্বরের কোনও "মানবীয়" গুণ থাকার ব্যাপারটি অস্বীকার করে এসেছিল তারা। আমরা কেমন করে বলি যে ঈশ্বর "কথা বলেন" বা "সিংহাসনে বসেন" –যেভাবে কুরান নিশ্চিত করে বলছে– কীভাবে আমরা ঈশ্বরের "জ্ঞান" বা "ক্ষমতা" নিয়ে আলোচনা করতে পারি? *আহল আল-হাদিস* পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছে যে, এই সতর্কতা ঈশ্বরের অনুভূতি পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়ে ঈশ্বরকে বিমূর্ত দার্শনিক বিষয়ে পরিণত করে যার কোনও ধর্মীয় তাৎপর্য থাকে না। একমত হন আল-আশারি, কিন্তু মুতাযিলাদের একথা বলে আশ্বস্ত করেন যে, ঈশ্বরের গুণাবলী মানুষের বৈশিষ্ট্যের মত নয়। কুরান ঈশ্বরের অনির্মিত বক্তব্য (Uncreated Speech), কিন্তু যে মানবীয় ভাষা একে প্রকাশ করে এবং খোদ গ্রন্থটির কালি এবং কাগজ নির্মিত। বাস্তবতার গভীরে রহস্যময় কোনও মূলসুর অনুসন্ধানের কোনও যুক্তি নেই। আমরা নিশ্চিত করে কেবল ইতিহাসের নিরেট বাস্তবকেই জানতে পারি। আল-আশারির দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে কিছু নেই। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশে প্রতিমুহূর্তে বিশ্বজগৎ সংগঠিত হচ্ছে। স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই: ঈশ্বর যতক্ষণ তাদের মাঝে এবং মাধ্যমে চিন্তা না করছেন ততক্ষণ নারী বা পুরুষ কোনও কিছু ভাবতে পারে না: আগুন জ্বলে, তার কারণ এটা তার বৈশিষ্ট্য বলে নয়, বরং ঈশ্বর ইচ্ছা করেছেন বলে।

মুতাযিলারা আগাগোড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল মুসলিমদের কাছে ভালোরকম দুর্বোধ্যই ছিল। আশারিবাদ সুন্নী ইসলামের প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হয়েছিল।

অবশ্যই এটা যুক্তিনির্ভর বিশ্বাস নয়, বরং অধিকহারে অতীন্দ্রিয়বাদী ও ধ্যাননির্ভর অনুশীলন। এটা মুসলিমদের সর্বত্র ঐশী উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করতে উৎসাহ যোগায়, বাহ্যিক বাস্তবতার "ভেতর" দিয়ে অন্তস্থঃ দুর্জ্ঞেয় সত্তাকে দেখতে বলে, যেভাবে কুরান নির্দেশ দিয়েছে। এতে করে "হাদিসপন্থী"দের ধারণায় স্পষ্ট হয়ে ওঠা নিরেট বাস্তবতায় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। এই দর্শন শরিয়াহ্‌র চেতনার সঙ্গেও মানানসই ছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পয়গম্বরের *সুন্নাহ্* অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিমরা নিজেদের পয়গম্বরের সঙ্গে একীভূত করে–যাঁর জীবন ঐশ্বরিক উপাদানে সম্পৃক্ত ছিল। ঈশ্বরের প্রিয় (*হাবিব*)কে অনুকরণ করলে– এতীম, দরিদ্র বা পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিংবা খাদ্য গ্রহণের সময় সৌজন্য এবং সংস্কৃত আচরণ করে– স্বয়ং ঈশ্বরের ভালোবাসাই লাভ করা যায়। জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশে ঐশী আজ্ঞার বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিমরা কুরান নির্দেশিত অবিরাম ঈশ্বরের স্মরণ (*জিকর-dhikr*) করছে।[6] দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ এই শরিয়াহ্ ভিত্তিক ধার্মিকতা গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। মোট চারটি স্বীকৃত আইন মতবাদ রয়েছে যার প্রতিটিই মুসলিম সাম্যবাদী দৃষ্টিতে সমভাবে বৈধ: হানাফি, মালিকি, শাফীই এবং হানবালি মতবাদ। শেষোক্তটি ইবন হানবাল এবং হাদিস-পন্থীদের আদর্শ ধারণ করে। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে, এই চারটি *মাযহাব* লক্ষণীয়ভাবে আলাদা নয়। প্রত্যেক মুসলিম অনুসরণ করার জন্য যেকোনওটি বেছে নিতে পারে, যদিও স্থানীয়ভাবে প্রচলিতটির দিকেই অধিকাংশজন আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

কিন্তু প্রত্যাশিতভাবেই সুন্নী মুসলিমদের একত্রিতকারী মূল বা প্রধান উপাদানটি ছিল রাজনৈতিক। সমাজের গৃহীত আকারে ঈশ্বর অনুভূত হন এবং এটা একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত ধার্মিকতাকে প্রভাবিত করে। সুন্নী মুসলিমদের সবাই মুহাম্মদ(স:) এবং চার *রাশিদুনের* সকলকে শ্রদ্ধা করে থাকে। উসমান বা আলীর ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই শাসকগণ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সকল শাসককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সুন্নীরা শিয়াদের মত প্রথম তিন *রাশিদুনকে* অবজ্ঞা করে না; শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী কেবল আলীই *উম্মাহ্‌র* বৈধ *ইমাম* ছিলেন। সুন্নী ধার্মিকতা শিয়াদের ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় অনেক বেশী আশাবাদী। এখানে সুদৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, এমনকি ব্যর্থতা এবং বিরোধের সময়ও ঈশ্বর *উম্মাহ্‌র* সঙ্গে থাকতে পারেন। সমাজের ঐক্য এক পবিত্র মূল্য, কেননা তা ঈশ্বরের একত্ব প্রকাশ করে। এটা যেকোনও সাম্প্রদায়িক বিভাজন থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শান্তির স্বার্থে খলিফাহ্‌দের সুস্পষ্ট দোষত্রুটি সত্ত্বেও বর্তমান খলিফাহ্‌দের স্বীকৃতি দান অত্যন্ত জরুরি। মুসলিমরা যদি শরিয়াহ্ অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে তারা একটা প্রতি-সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম হবে যা তাদের সময়ের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বদলে দেবে এবং একে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করবে।

গোপন ধর্মীয় আন্দোলন

এই ধার্মিকতা অবশ্য সকল মুসলিমকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, যদিও তা সংখ্যাগরিষ্ঠজনের বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। যারা অধিকতর বুদ্ধিজীবী বা অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল ধর্মকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার আবশ্যকতা ছিল তাদের। আব্বাসীয় আমলে আরও চারটি জটিল ধরনের ইসলামী দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাব ঘটেছিল যেগুলো অভিজাতদের কাছে আকর্ষণীয় ঠেকেছে। এসব ধারণা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, কারণ শিক্ষানবীশদের বিশ্বাস ছিল স্থূল বুদ্ধির লোকজন তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং কেবল প্রার্থনা আর ধ্যানের প্রেক্ষিতেই এসবের অর্থ বোধগম্য হতে পারে। এই গোপনীয়তা আবার স্বয়ং-রক্ষক ব্যবস্থাও ছিল। শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিক তাঁর অনুসারীদের আপন নিরাপত্তার স্বার্থেই *তাকিয়াহ* (গোপনীয়তা) বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শিয়াদের জন্য সঙ্কটময় সময় ছিল এটা, রাজনৈতিক প্রশাসনের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কায় ছিল তারা। ধর্মীয় পণ্ডিত, *উলেমা*গণও এসব গুপ্ত সংগঠনের অর্থডক্সির ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। *তাকিয়াহ* সংঘাতকে সীমিত পর্যায়ে রেখেছিল। ক্রিশ্চান জগতে প্রশাসনের সঙ্গে ভিন্নমত অবলম্বনকারীরা প্রায়শ ধর্মদ্রোহী হিসাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ইসলামে এইসব প্রচ্ছন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীরা নিজেদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে নীরবতা বজায় রেখেছিল এবং সাধারণত নিরাপদে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে পেরেছে। তবে গোপনীয়তার নীতির ভিন্ন তাৎপর্যও ছিল। গুপ্ত আদর্শবাদীদের কিংবদন্তী (Myths) এবং ধর্মতাত্ত্বিক দর্শন (Theological insights) সামগ্রিক জীবনযাত্রারই অংশ ছিল। অতীন্দ্রিয় মতবাদসমূহ বিশেষত কাল্পনিক এবং স্বজ্ঞা মূলকভাবে বৈধ হিসাবে অনুভব করা যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে সেগুলো বহিরাগত কারও যৌক্তিক উপলব্ধির নাগালের মধ্যে নাও থাকতে পারে। এগুলো কবিতা বা সঙ্গীতের মত যার প্রভাব যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং যার পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য প্রায়শ বিশেষ মাত্রার সৌন্দর্য বিদ্যাগত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন হয়।

নিগূঢ় বিদ্যাধারীরা তাদের ধারণাকে ধর্মদ্রোহী বলে ভাবেনি। তারা *উলেমা*দের তুলনায় অধিকতর গভীরভাবে প্রত্যাদেশ উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে বলে বিশ্বাস করত। একথা আবার মনে করা আবশ্যক যে ইসলামে বিশ্বাস (Beliefs) এবং

মতবাদ (Doctrines) ক্রিশ্চান ধর্মের মত অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। জুডাইজমের মত ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে মানুষকে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে জীবনযাপন করতে হয়, স্রেফ নির্দিষ্ট কতগুলো বিশ্বাসগত প্রস্তাবনা মেনে নেয়া নয়। এখানে অর্থডক্সি নয় বরং অর্থপ্রাক্সির ওপরই গুরুত্ব দেয়া হয়। গূঢ় বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট সকল মুসলিমই ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় অনুশীলন বা পাঁচ "স্তম্ভ" (*রুকন*) মেনে চলেছে। তারা মুসলিম বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত ঘোষণা *শাহাদা*: "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই এবং মুহাম্মদ(স:) তাঁর পয়গম্বর" সম্পূর্ণ মেনেছে। দৈনিক পাঁচবার *সালাত* প্রার্থনা করেছে তারা, *যাকাত* দান করেছে, রমজান মাসে উপবাস পালন করেছে এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে জীবনে অন্তত একবার মক্কায় গেছে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে। স্তম্ভসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত যে কেউ অবশ্যই প্রকৃত মুসলিম, তার বিশ্বাস যাই হোক না কেন।

আমরা আব্বাসীয়দের ক্ষমতারোহনের পরপর জাফর আস-সাদিক প্রবর্তিত শিয়াবাদের নীরবতম ধরন সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। যদিও শিয়ারা সুন্নীদের মতই শরিয়াহ্ ভিত্তিক ধার্মিকতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এবং তাদের *নিজস্ব মাযহাব* (জাফরি মতবাদ, স্বয়ং জাফর আস-সাদিকের নামানুসারে) ছিল, কিন্তু তারা প্রধানত দিক-নির্দেশনার জন্য বর্তমান *ইমামের* দিকে চেয়ে থাকত, যিনি তাঁর প্রজন্মের জন্য স্বর্গীয় *ইলমের* গ্রহীতা। *ইমাম* নিষ্পাপ আধ্যাত্মিক পরিচালক এবং আদর্শ *কাজি*। সুন্নীদের মত শিয়ারাও প্রথম গোষ্ঠীর মুসলিমদের মত, যারা সচক্ষে পয়গম্বরের প্রতি কুরান উন্মোচিত হতে দেখেছিল– সরাসরি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল। ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত *ইমামের* প্রতীকটি শিয়াদের পবিত্র সত্তার অনুভূতি প্রতিফলিত করে যা কেবল প্রকৃত ধ্যানীর কাছে ধরা পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিপজ্জনক বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। *ইমামতের* মতবাদ এও দেখায় যে সাধারণ রাজনৈতিক জীবনের করুণ পরিবেশে স্বর্গীয় আজ্ঞা বাস্তবায়ন কতখানি কঠিন। শিয়ারা মনে করে যে *ইমামদের* প্রত্যেকেই তাঁর সময়কালের খলিফাহ্র হাতে নিহত হয়েছেন। কারবালায় তৃতীয় ইমাম হুসেইনের শাহাদৎবরণ এই জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলার প্রয়াস কী পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার এক বিশেষ বাঙ্ময় উদাহরণ। দশম শতাব্দী নাগাদ শিয়ারা আশুরার (১০ মুহররম) উপবাসের দিন, মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রকাশ্যে হুসেইনের শোকে মাতম করা আরম্ভ করে। তারা রাস্তায় মিছিল করে কেঁদে কেঁদে বুকে চাপড় বসিয়ে মুসলিমদের রাজনৈতিক জীবনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জীবন-বাজি বিরোধিতার ঘোষণা দেয়, যার কারণে কুরানের সুস্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও ধনীরা দুর্বলদের ওপর নির্যাতন করার সুযোগ পাচ্ছে। জাফর আস-সাদিকের অনুসারী শিয়ারা হয়ত রাজনীতি পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু সান্দ্রিক ন্যায়বিচারের প্রতি আবেগ ছিল তাদের প্রতিবাদী ধার্মিকতার প্রাণ কেন্দ্রে।

নবম শতাব্দীতে খেলাফতের পতনোন্মুখ অবস্থায় আব্বাসীয় প্রশাসন এবং শিয়াদের মধ্যকার বৈরিতা আবার প্রকাশিত হয়ে পড়ে। খলিফাহ্ আল-মুতাওয়াক্কিল

(৮৪৭-৬১) দশম ইমাম আলী আল-হাদিকে মদীনা থেকে সামারায় ডেকে এনে গৃহবন্দী করে রাখেন। পয়গম্বরের এই সরাসরি বংশধরকে মুক্ত রাখা নিরাপদ নয় বলে ভেবেছিলেন তিনি। এরপর থেকে ইমামগণ কার্যতঃ শিয়াদের নাগালের বাইরে চলে যান এবং কেবল "প্রতিনিধি"র মাধ্যমেই বিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ৮৭৪-এ একাদশ ইমামের পরলোকগমনের পর বলা হয় যে তিনি একজন তরুণ পুত্র সন্তান রেখে গেছেন যিনি আত্মরক্ষার খাতিরে আত্মগোপন করেছেন। দ্বাদশ ইমামের কোনও সন্ধান স্বভাবতই আর পাওয়া যায়নি, হয়ত আগেই পরলোকগমন করে থাকতে পারেন তিনি। কিন্তু আজও প্রতিনিধিগণ তাঁর পক্ষে শিয়াদের শাসন করছেন, তাদের কুরানের গূঢ়ার্থ পাঠে সাহায্য করছেন, যাকাত আদায় করছেন এবং আইনি রায় প্রদান করছেন। ৯৩৪-এ গোপন ইমাম স্বাভাবিক জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছালে "প্রতিনিধি" শিয়াদের জন্য তাঁর কাছ থেকে এক নতুন বাণী এনে হাজির করেন। তিনি "গোপন স্থানে" (occultation) চলে গেছেন এবং ঈশ্বর অলৌকিক উপায়ে তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন; তিনি আর শিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না। একদিন আবার ফিরে আসবেন তিনি, ন্যায় বিচারের যুগের উদ্বোধন করার জন্যে, কিন্তু সেটা দীর্ঘ কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর। গোপন ইমামের "গোপন স্থানে" যাবার কিংবদন্তী আক্ষরিক অর্থে পার্থিব ঘটনার বিবরণ হিসাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে অবতারণা করা হয়নি। এটা অতীন্দ্রিয়বাদী মতবাদ যা ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিকে ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট বা ধরা-ছোঁয়ার অতীত হিসাবে প্রকাশ করে, এই জগতে উপস্থিত থাকলেও তা জগতের অংশ নয়। এটা এই জগতে প্রকৃত ধর্মীয় নীতির বাস্তবায়নের অসম্ভাব্যতাকেও প্রতীকায়িত করে, কেননা খলিফাহ্গণ পৃথিবী হতে আলীর বংশধারা ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং ইলম্ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। এরপর থেকে শিয়া উলেমাগণ গুপ্ত ইমামের প্রতিনিধিতে পরিণত হন এবং তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করার জন্যে তাঁদের নিজস্ব অতীন্দ্রিয়বাদী ও যৌক্তিক দর্শনের প্রয়োগ করেন। দ্বাদশবাদী (Twelver) শিয়ারা (যারা বারজন ইমামে বিশ্বাসী) আর রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করেনি, কেননা উম্মাহ্র প্রকৃত নেতা গোপন ইমামের অনুপস্থিতিতে কোনও সরকার বৈধ হতে পারে না। তাদের মেসিয়ানিক ধর্মানুরাগ, যা ইমামের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রয়েছে, সমাজের অবস্থার সঙ্গে স্বর্গীয়লোকের অসন্তোষের পরিচয় প্রকাশক।

শিয়াদের সবাই দ্বাদশবাদী ছিল না, সবাই রাজনীতিও ত্যাগ করেনি। কেউ কেউ (সপ্তবাদী- Seveners বা ইসমায়েলি) মনে করে যে আলীর বংশধারা জাফর আস-সাদিকের পুত্র ইসমায়েলের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, যিনি মনোনীত ইমাম ছিলেন কিন্তু পিতার আগেই পরলোকগমন করেছেন। সুতরাং তারা জাফরের দ্বিতীয় পুত্র মুসা আল-কাযিমের বৈধতা স্বীকার করেনি, দ্বাদশবাদীরা যাকে সপ্তম ইমাম হিসাবে মর্যাদা দিয়েছিল।[৫] তারাও এক গূঢ় আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটিয়েছিল যা

ঐশীগ্রন্থের গোপন (*বাতিন*) অর্থের সন্ধানী কিন্তু প্রকাশ্য জীবনধারা থেকে সরে যাবার বদলে তারা একেবারে ভিন্নতর রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিল এবং প্রায়ই সক্রিয় কর্মী ছিল তারা। ৯০৯-এ এক ইসমায়েলি নেতা টিউনিসিয়ার এক প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলে নিজেকে মেসিয়ানিক খেতাব আল-মাহ্‌দি (নির্বাচিত ব্যক্তি) প্রদান করেন। ৯৮৩-তে ইসমায়েলিরা আব্বাসীয়দের কাছ থেকে মিশর ছিনিয়ে নিয়ে কায়রোয় পাল্টা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে, যা প্রায় দু'শ' বছর টিকে ছিল। সিরিয়া, ইরাক, ইরান এবং ইয়েমেনেও গোপন ইসমায়েলি সেল ছিল। সদস্যরা স্থানীয় দাই (*dai*: প্রতিনিধি) দ্বারা আস্তে আস্তে সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হত। নিম্ন পর্যায়ের অনুসৃত ধর্ম সুন্নীবাদের বিপরীত কিছু ছিল না, কিন্তু শিক্ষার্থী অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আরও বিমূর্ত দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হত যেখানে দুর্জ্ঞেয়র বিস্ময়ের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্যে গণিত আর বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হত। কুরান নিয়ে ইসমায়েলিদের ধ্যান ইতিহাস সম্পর্কে তাদের মাঝে আবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়েছিল, যাকে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানের বিরোধিতার পর থেকে ক্রমাবনতিশীল বলেই বিশ্বাস করেছে। মোট ছয়জন মহান পয়গম্বর ছিলেন [অ্যাডাম, নোয়াহ্, অব্রাহাম, মোজেস, জেসাস এবং মুহাম্মদ(স:)] যাঁদের প্রত্যেকেই এই নিম্নমুখী প্রবণতা উল্টে দিয়েছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন করে "কর্মী" (executor) ছিলেন যিনি তাঁর বাণীর গোপন অর্থ যোগ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ, অ্যারন ছিলেন মোজেসের কর্মী আর আলী ছিলেন মুহাম্মদের(স:)। বিশ্বাসীরা যখন তাদের শিক্ষা বাস্তবায়নের সংগ্রামে লিপ্ত হবে তখন তারা পৃথিবীকে চূড়ান্ত শান্তির পর্বের জন্যে প্রস্তুত করে তুলবে, সপ্তম পয়গম্বর মাহ্‌দি যার সূচনা ঘটাবেন।

আকর্ষণীয় আন্দোলন ছিল এটা। রাজদরবারের বিরুদ্ধে সুন্নীদের প্রতিবাদ যেখানে তাদের শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রতি সন্দিহান করে তুলেছিল, ইসমায়েলবাদ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিজীবী মুসলিমকে ধর্মীয় পথে নতুন দর্শন গবেষণার পথ খুলে দিয়েছিল। তাদের ব্যাখ্যা ছিল *তাওয়িলের* (আদিতে প্রত্যাবর্তন–Carrying back) প্রক্রিয়া যার ফলে উপাসনাকারীর মনোযোগ ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ অতিক্রম করে এর মূল উৎস গুপ্ত স্বর্গীয় বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়। কুরান জোর দিয়ে বলেছে যে ঈশ্বর "প্রতীকে"র (*আয়াত*) মাধ্যমে বিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, কেননা ঈশ্বরকে কখনও সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক বা যৌক্তিক ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ইসমায়েলিরা সবসময় ঈশ্বরকে "চিন্তার তীক্ষ্ণতা যাঁকে ধারণ করতে পারে না" বাগধারার মাধ্যমে পরোক্ষ উল্লেখ করে এসেছে। তারা এও বিশ্বাস করেছে যে কোনও বিশেষ প্রত্যাদেশ বা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা চূড়ান্ত হতে পারে না, কেননা ঈশ্বর চিরকালই মানবীয় ভাবনার চেয়ে বিশাল। ইসমায়েলিরা মুহাম্মদকে(স:) ছয়জন প্রধান পয়গম্বরের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে, কিন্তু এটাও জোর দিয়ে বলে যে আরবদের কাছে অবতীর্ণ

প্রত্যাদেশের পূর্ণ তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে কেবল ইমাম মাহ্‌দির আগমনের পরেই। সুতরাং তারা সত্যের সম্ভাবনার ব্যাপারে প্রস্তুত ছিল যা অধিকতর রক্ষণশীল *উলেমা*দের জন্য ছিল উদ্বেগজনক। কিন্তু ইসমায়েলিরা কেবল চিন্তাশীল একটা গোত্র ছিল না, সকল প্রকৃত মুসলিমের মত তারা উম্মাহ্‌র ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল এবং বিশ্বাস করত যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছাড়া ধর্মবিশ্বাস মূল্যহীন। একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজের জন্যে কাজ করার মাধ্যমে তারা মাহ্‌দির আগমনের পথ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে। একটি দীর্ঘস্থায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় ইসমায়েলিদের সাফল্য দেখায় যে তাদের আদর্শের রাজনৈতিক সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। ইসমায়েলি দর্শন মাত্রাতিরিক্ত পৌরহিত্যমূলক এবং অভিজাত্যপূর্ণ হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মুসলিমের কাছেই আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

ইসমায়েলিরা তাদের সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রতীকসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশই এসময়ে আবির্ভূত তৃতীয় গূঢ় তত্ত্বীয় আন্দোলন ফালসাফাহ্‌ থেকে গ্রহণ করেছিল। আব্বাসীয়দের সময় সৃচিত সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ, বিশেষ করে গ্রিক দর্শন, বিজ্ঞান আর চিকিৎসা শাস্ত্র সেই সময় আরবী ভাষায় মুসলিমদের নাগালের মধ্যে আসায় সেখান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এই আন্দোলন। ফায়লাসুফরা হেলেনিস্টিক যুক্তিবাদ দ্বারা আলোড়িত হয়েছিল, তারা যুক্তিবাদকে ধর্মের সর্বোচ্চ পর্যায় বলে বিশ্বাস করত এবং একে অধিকতর উচ্চ স্তরের দর্শনকে কুরানের প্রত্যাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চেয়েছিল। কাজটা কঠিন ছিল তাদের পক্ষে। অ্যারিস্টটল এবং প্লটিনাসের পরম উপাস্য (Supreme Deity) ছিলেন আল্লাহ্‌ থেকে একেবারে আলাদা। এই উপাস্য জাগতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন না, তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেননি এবং সময়ের সমাপান্তে এর বিচারও করবেন না। একেশ্বরবাদীরা যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে ফায়লাসুফরা সেখানে গ্রিকদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে যে ইতিহাস কুহেলিকা; এর কোনও আদি মধ্য বা অন্ত নেই, কেননা বিশ্বজগৎ আদি কারণ (First Cause) হতে চিরন্তনভাবে উৎসারিত হচ্ছে। ফায়লাসুফরা ইতিহাসের ক্ষণস্থায়ী প্রবাহের অতীতে গিয়ে এর অভ্যন্তরস্থ স্বর্গীয় পরিবর্তনহীন আদর্শ জগৎ প্রত্যক্ষ করতে শিখতে চেয়েছিল। মানুষের যুক্তিজ্ঞানকে তারা পরম কারণ (Absolute Reason) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হিসাবে দেখেছে। আমাদের বুদ্ধির অযৌক্তিক অংশগুলোকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে এবং সম্পূর্ণ যৌক্তিক উপায়ে জীবন যাপন শিক্ষা করে মানুষ স্বর্গীয় জগৎ থেকে চিরন্তন উৎসারণ বিপরীতমুখী করে এই মর্ত্য জগতের বহুমাত্রিকতা (multiplicity) এবং জটিলতা (Compexity) থেকে এক (One)-এর সারল্য এবং একত্বে আরোহণ করতে পারবে। ফায়লাসুফরা বিশ্বাস করত ক্যাথারসিসের (Catharsis) এই প্রক্রিয়া গোটা মানব জাতির আদি ধর্ম। অন্যসব বিশ্বাস (Cult) স্রেফ যুক্তির প্রকৃত ধর্মের অপূর্ণাঙ্গ রূপ মাত্র।

কিন্তু ফায়লাসুফরা সাধারণভাবে ধার্মিক ছিল. নিজেদের তারা ভাল মুসলিম বলে বিশ্বাস করত। খোদ তাদের যুক্তিবাদ এক ধরনের ধর্মবিশ্বাস ছিল. কারণ বিশ্বজগৎ যৌক্তিকভাবে শৃঙ্খলিত ভাবার জন্যে সাহস আর প্রখর আস্থার প্রয়োজন। একজন ফায়লাসুফ যৌক্তিক তিত্তিকে তার গোটা জীবনযাপনে নিবেদিত করে. সে তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা আর মূল্যবোধ একত্রিত করতে চায় যাতে করে বিশ্ব সম্পর্কে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক এবং যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। এটা সম্ভবত *তাওহীদের* একটা দার্শনিক রূপ ছিল। সামাজিক প্রেক্ষিতেও ফায়লাসুফরা ভাল মুসলিম ছিল: রাজদরবারের বিলাসী জীবন ধারা অপছন্দ করেছে তারা. খলিফাহ্দের উৎপীড়ন অপছন্দ করেছে। কেউ কেউ তাদের আদর্শ অনুসারে সমাজকে বদলে দিতে চেয়েছে। রাজদরবার এবং অন্যান্য বড় বড় প্রাসাদে জ্যোতির্বিদ এবং চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেছে তারা। সংস্কৃতিতে সামান্য হলেও এর প্রভাব পড়েছে। অবশ্য ফায়লাসুফদের কেউই *উলেমাদের* মত ব্যাপক সংস্কার প্রয়াসের দিকে যায়নি. শরিয়াহ্র সাধারণ জনপ্রিয়তার সমকক্ষ কিছু উদ্ভাবন করতে পারেনি।

ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দি (মৃত্যু: ৮৭০) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রথম প্রধান ফায়লাসুফ বা "দার্শনিক"। কুফাহ্য় জন্ম গ্রহণকারী আল-কিন্দি বসরাহ্য় পড়াশোনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বাগদাদে স্থায়ী হন। সেখানে তিনি আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। রাজধানীতে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মুতাযিলাদের সঙ্গে তাদের ধর্মতত্ত্বকে (*কালাম*) মানবীয় গুণাবলী হতে মুক্ত করার প্রয়াসে যোগ দিয়েছেন কিন্তু নিজেকে তাদের মত মুসলিম উৎসগুলোর কাছে সীমাবদ্ধ করে ফেলেননি, বরং গ্রিক সাধুদের কাছ থেকেও জ্ঞান অন্বেষণ করেছেন। এভাবে তিনি "আদি কারণে"র (First Cause) সপক্ষে অ্যারিস্টটলের প্রমাণকে কুরানের ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালের সকল ফায়লাসুফের মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিমদের সর্বত্র সত্যের সন্ধান করা উচিত, এমনকি যদি তা একেবারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকেও হয়। ঈশ্বর এবং আত্মা সম্পর্কে কুরানে প্রত্যাদিষ্ট শিক্ষা সম্পূর্ণ দার্শনিক সত্যের প্রতীক যার মাধ্যমে এগুলো সাধারণ মানুষের বোধগম্য–যাদের যৌক্তিক চিন্তাভাবনার যোগ্যতা নেই–হয়ে উঠেছে। সুতরাং বলা হয়ে থাকে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম "দরিদ্র-ব্যক্তির ফালসাফাহ্"। আল-কিন্দির মত একজন ফায়লাসুফ প্রত্যাদেশকে যুক্তির বশীভূত করতে চাননি বরং ঐশীগ্রন্থের অভ্যন্তরীণ সত্তা দেখতে চেয়েছেন তিনি, অনেকটা শিয়ারা যেভাবে কুরানের *বাতিন* অর্থ অনুসন্ধান করেছে সেরকম।

অবশ্য তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন সঙ্গীতযন্ত্রবাদকই যুক্তিভিত্তিক দর্শনের ইসলামী ট্রাডিশনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবু নাসর আল-ফারাবি (মৃত্যু: ৯৫০) দর্শনকে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের তুলনায় উন্নত বিবেচনার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী অগ্রসর হন, ধর্ম তাঁর কাছে নিতান্ত সুবিধাজনক একটা বিষয় এবং স্বাভাবিক সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়েছে। অবশ্য আল-ফারাবি

যেখানে গ্রিক যুক্তিবাদী এবং ক্রিশ্চান দার্শনিকদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন সেটা হল রাজনীতির প্রতি তাঁর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। তিনি যেন বিশ্বাস করেছিলেন যে ইসলামের বিজয়ের ফলেই প্লেটো আর অ্যারিস্টটল যে যৌক্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখেছিলেন সেটা গঠন করা সম্ভব হয়েছে। ইসলাম এর পূর্বসূরীদের চেয়ে ঢের বেশী যুক্তিভিত্তিক ধর্ম। এর ট্রিনিটি (ত্রিত্ববাদ)র মত কোনও অযৌক্তিক মতবাদ নেই, বরং এখানে আইনের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আল-ফারাবি বিশ্বাস করতেন, সমাজের পথপ্রদর্শক স্বরূপ *ইমাম*দের নিয়ে শিয়া ইসলাম সাধারণ মুসলিমদের যৌক্তিক নীতিমালার ভিত্তিতে একজন দার্শনিক-রাজার শাসনাধীন সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে সক্ষম। প্লেটো যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে কোনও সু-শৃঙ্খল সমাজের এমন কিছু মতবাদের প্রয়োজন রয়েছে যাকে সাধারণ মানুষ ঐশী অনুপ্রেরণাজাত বলে বিশ্বাস করে। মুহাম্মদ(স:) এমন একটা আইন এনেছেন যেখানে ঐশী শাস্তি স্বরূপ নরকের ব্যবস্থা রয়েছে, যা একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রভাবিত করবে যা অধিকতর যৌক্তিক বক্তব্যে সম্ভব নয়। এভাবে ধর্ম রাষ্ট্র বিজ্ঞানেরই একটা শাখা এবং একজন ভাল ফায়লাসুফ দ্বারা এর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ হওয়া প্রয়োজন, যদিও গড়পড়তা মুসলিমের তুলনায় ধর্মের অনেক গভীর পর্যন্ত আলোক করতে পারবে সে।

অবশ্য এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে আল-ফারাবি একজন সক্রিয় (Practising) সুফি ছিলেন। বিভিন্ন গূঢ়বিদ্যা সম্পর্কিত দলগুলোর মাঝে পরস্পরের সঙ্গে অংশত: মিলে যাবার প্রবণতা ছিল এবং অধিকতর রক্ষণশীল *উলেমা*দের চেয়ে অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের মাঝে। অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি আকৃষ্ট শিয়া ও ফায়লাসুফরা শিয়া ও সুফিদের মত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, যাদের ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একই রকম। সুন্নী ইসলামের অতীন্দ্রিয় রূপ সুফিবাদ আমাদের আলোচিত অন্যান্য মতবাদের চেয়ে আলাদা। কেননা এটা রাজনীতি প্রবণ দর্শন গড়ে তোলেনি। পরিবর্তে এটা যেন আবার পুরনো ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করেছে; এবং সুফিরা চলমান ঘটনাবলীর পরিবর্তে নিজেদের সত্তার গভীরে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু ইসলামের প্রায় সকল ধর্মীয় আন্দোলন অন্তত রাজনৈতিক কোনও দৃষ্টিভঙ্গি হতেই সূচিত হয়, সুফিবাদও তার ব্যতিক্রম ছিল না। উমাঈয়াহ্ আমলে মুসলিম সমাজে দৃষ্ট ক্রমবর্ধমান ইহজাগতিকতা আর বিলাসীতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গড়ে ওঠা তপস্যায় (*যুহ্দ*) এর শেকড় নিহিত। *উম্মাহ্*র আদি সমাজে ফিরে যাবার প্রয়াস ছিল এটা যেখানে সকল মুসলিম সমান মর্যাদা নিয়ে বসবাস করেছে। সাধুগণ প্রায়শই এক ধরনের কর্কশ উলের পোশাক পরত (*তাসাউফ*), দরিদ্রদের মাঝে যার চল ছিল, পয়গম্বর যেমন পরতেন। নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে *তাসাউফ* (যেখান থেকে আমাদের "সুফি" শব্দটি এসেছে) শব্দটি আব্বাসীয় সমাজে ধীর গতিতে গড়ে ওঠা অতীন্দ্রিয়বাদী আন্দোলনের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

সুফিবাদ সম্ভবত জুরিসপ্রুডেন্সের বিকাশের প্রতিক্রিয়াও ছিল, যাকে কোনও কোনও মুসলিমের কাছে ইসলামকে কতগুলো বাহ্যিক নিয়মকানুনের সেটে পর্যবসিত করার মত ঠেকেছিল। সুফিরা নিজেদের মাঝে সেই মানসিক অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চেয়েছিল যার দরুণ মুহাম্মদের(সঃ) পক্ষে কুরানের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। জুরিস্টদের *উসুল আল-ফিক্‌হ*'র নয় বরং তাঁর অন্তরের ইসলামই আইনের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় ইসলামের সহিষ্ণুতা যেখানে কমে আসছিল, কুরানকে একমাত্র বৈধ ঐশীগ্রন্থ এবং মুহাম্মদের(সঃ) ধর্মকে দেখা হচ্ছিল একমাত্র সত্যি ধর্মবিশ্বাস হিসাবে, সুফিরা সেখানে অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে কুরানের মূল চেতনায় ফিরে গেছে। কেউ কেউ, উদাহরণস্বরূপ, বিশেষভাবে জেসাসের প্রতি অনুরক্ত ছিল, তাঁকে আদর্শ সুফি হিসাবে দেখেছে, কেননা তিনি ভালোবাসার গসপেল প্রচার করেছিলেন। অন্যরা এমনকি এমনও মনে করেছে একজন পৌত্তলিক যে পাথরের সামনে প্রণামে নত হচ্ছে সেও আসলে সত্যের (*আল-হাক্ব*) উপাসনা করছে, যা সকল বস্তুর মাঝে বিরাজমান। *উলেমা* ও জুরিস্টরা যেখানে ক্রমবর্ধমান হারে প্রত্যাদেশকে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত মনে করছিলেন, সেখানে শিয়াদের মত সুফিরাও নতুন সত্যের সম্ভাবনার ব্যাপারে ছিল উদার, যা যেকোনও স্থানেই মিলতে পারে, এমনকি অন্য ধর্মীয় ট্র্যাডিশনসমূহেও। কুরান যেখানে কঠোর বিচারক ঈশ্বরের বর্ণনা দিয়েছে, সেখানে মহান মহিলা সাধু রাবিয়াহ্ (মৃত্যুঃ ৮০১)র মত সুফিরা একজন ভালোবাসার ঈশ্বরের কথা বলেছেন।

সমগ্র বিশ্ব এবং প্রধান প্রধান ধর্মীয় ট্র্যাডিশনে এই ধরনের অভ্যন্তরীণ যাত্রার যোগ্যতার অধিকারী নারী এবং পুরুষ এমন নির্দিষ্ট কিছু কৌশল আবিষ্কার করেছে যা তাদের অবচেতন মনের গভীরে প্রবেশে সক্ষম করে তোলে এবং এমন অনুভূতি যোগায় যাকে তাদের সত্তার গভীরস্থ কোনও সত্তা বলে মনে হয়। ছন্দোময় ভঙ্গিতে গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সময় মানসিক শক্তি একত্রিত করতে শেখে সুফিরা; তারা উপবাস করে, রাত্রি জাগরণ করে এবং মন্ত্রের মত কুরানে প্রদত্ত ঈশ্বরের গুণসূচক নাম উচ্চারণ করে চলে। মাঝে মাঝে তারা একধরনের বুনো, সীমাহীন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়, এই অতীন্দ্রিয়বাদীরা "মাতাল সুফি" ("drunken sufis") হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এধরনের সুফিদের প্রথম দিকের একজন হলেন আবু ইয়াযিদ আল-বিস্তামি (মৃত্যুঃ ৮৭৪), যিনি আল্লাহ্‌কে একজন প্রেমিকের মত মিনতি জানিয়েছেন। তবে তিনি *ফানাহ্‌র* (বিলীন) কৌশলও শিখেছিলেনঃ আস্তে আস্তে অহমবোধের সমস্ত স্তর (যা, সকল অধ্যাত্মিক লেখক একমত পোষণ করেছেন, ঐশী উপলব্ধি থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে) খসিয়ে ফেলার মাধ্যমে আল-বিস্তামি আপন সত্তার (being) ভিত্তিভূমিতে এক বর্ধিত সত্তার (Self) সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন যা স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নন, যিনি বিস্তামিকে বলেছেন; "তোমার মাধ্যমেই আমি; তুমি ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই।" শাহাদায় সম্ভাব্য আঘাত সৃষ্টিকারী এই পুনর্বিন্যাস এক গভীর সত্য প্রকাশ করে, যা অন্য বহু

ট্র্যাডিশনের অতীন্দ্রিয়বাদীরাও আবিষ্কার করেছে। *শাহাদা* ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর, কোনও সত্তা নেই, সুতরাং এটা সত্যি হতে বাধ্য যে যখন সত্তা *ইসলামের* নিখুঁত কাজের মাধ্যমে নাকচ হয়ে যায়, তখন সকল মানুষই কার্যতঃ স্বর্গীয়। হুসেইন আল-মনসুর (মৃত্যুঃ ৯২২) যিনি আল-হাল্লাজ বা উল-কারডার নামেও পরিচিত, একই রকম ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন: "*আনা আল-হক্ব।*" ("আমিই সত্য!" বা "আমিই বাস্তব!"), যদিও কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এটা হওয়া উচিতঃ "আমি সত্য দেখছি!"

বাড়িতে অবস্থান করেই আত্মার মাধ্যমে বৈধ হজ্জ করা সম্ভব দাবী করার কারণে *উলেমাদের* হাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন হাল্লাজ। তাঁর মৃত্যু সুফি এবং *উলেমাদের* মাঝে ক্রমবর্ধমান বৈরিতারই পরিচায়ক। বাগদাদের মুনায়েদ (মৃত্যুঃ ৯১০) যিনি ছিলেন প্রথম তথাকথিত "স্থির সুফি" ("Sober Sufi"), এই জাতীয় চরমপন্থা থেকে সরে আসেন। তিনি মনে করেছেন, বিস্তামির অনুভূত উন্মাদনা একটা পর্যায় মাত্র, সত্তার বর্ধিত উপলব্ধি এবং আরও পূর্ণাঙ্গ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অতীন্দ্রিয়বাদীকে যা অতিক্রম করে যেতেই হবে। একজন সুফি যখন প্রথম ঐশী আহ্বান শুনতে পায়, সে নারী বা পুরুষ যেই হোক, অস্তিত্বের সকল উৎসের সঙ্গে কটকর বিচ্ছেদ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। অতীন্দ্রিয় যাত্রা মানুষের জন্য যা একেবারেই স্বাভাবিক সেখানে ফিরে যাওয়া মাত্র। এই মতবাদ বুদ্ধদের অনুসৃত মতবাদের অনুরূপ। আব্বাসীয় আমলে সুফিবাদ প্রান্তিক আন্দোলন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সুফি সাধকরা জুনায়েদের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে এক গূঢ় আন্দোলন গড়ে তোলে যা আমাদের আলোচিত অন্যান্য আন্দোলনের বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের আকৃষ্ট করেছিল।

নিজেদের যদিও তারা ধার্মিক, নিবেদিত মুসলিম বলে দাবী করেছিল, কিন্তু গূঢ় তাত্ত্বিকরা সবাই পয়গম্বরের ধর্মকে বদলে ফেলেছে। ফায়লাসুফদের মতবাদ শুনলে মুহাম্মদ(সঃ) হয়ত হতবাক হয়ে যেতেন এবং আলী নির্ঘাত তাঁর দলের লোক বলে ঘোষণাদানকারী শিয়াদের ধারণা ও কিংবদন্তী বুঝতেই পারতেন না। কিন্তু যেকোনও ট্র্যাডিশনের অধিকাংশ বিশ্বাসীর দৃঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও, যারা মনে করে যে ধর্ম কখনও বদলায় না এবং তাদের বিশ্বাস ও আচরণ ধর্ম প্রবর্তকদের অনুরূপ, টিকে থাকার স্বার্থেই ধর্মকে পরিবর্তিত হতে হয়। মুসলিম সংস্কারকগণ ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদী ধরনকে নির্ভরযোগ্য নয় বলে আবিষ্কার করেছেন এবং পরবর্তীকালের সংযোজনে বিকৃত হবার আগের প্রথম *উম্মাহ্‌র* নিখাঁদ অবস্থায় ফিরে যাবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সময়ের স্রোতের উল্টোদিকে কখনও যাওয়া যায় না। যেকোনও "সংস্কার," এর উদ্দেশ্য যত রক্ষণশীলই হোক না কেন, সব সময়ই তা নতুন বিচ্যুতি এবং সংস্কারকের আপন সময়ের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহের সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের অভিযোজন। যদি কোনও ট্র্যাডিশনের মাঝে বিকাশ ও বৃদ্ধির অবকাশ না থাকে, তা বিলুপ্ত হবে। ইসলাম প্রমাণ করেছে যে এর সেই সৃজনশীল ক্ষমতা রয়েছে।

পয়গম্বরের হতাশ নিষ্ঠুর আমল হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী নারী এবং পুরুষের মাঝে এক গভীর স্তরে এটা আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। তারা কুরানের শব্দের আক্ষরিক অর্থের অতীত অর্থ দেখতে পায় যা মূল প্রত্যাদেশের পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে যায়। কুরান তাদের জীবনে একটা শক্তিতে পরিণত হয়েছে যা তাদের পবিত্রতার অনুভূতি যোগায় এবং প্রবল শক্তি আর অন্তর্দৃষ্টির নতুন আধ্যাত্মিকতা গড়ে তুলতে সক্ষম করে তোলে।

নবম ও দশম শতাব্দীর মুসলিমরা মদিনার প্রথম অবরুদ্ধ ক্ষুদ্র *উম্মাহ*র চেয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। তাদের দর্শন, *ফিক্‌হ* এবং অতীন্দ্রিয়বাদী অনুশীলনের মূলে ছিল কুরান এবং প্রাণপ্রিয় পয়গম্বরের চরিত্র, কিন্তু ঐশীগ্রন্থ যেহেতু ঈশ্বরের বাণী, এটা মনে করা হয়েছে যে এর অসংখ্যরূপে ব্যাখ্যায়িত হওয়ার ক্ষমতা আছে। এভাবে তারা প্রত্যাদেশকে এমন এক পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে অর্থময় করে তুলেছে যার কথা হয়ত পয়গম্বর এবং *রাশিদুন* কল্পনাই করেননি। কিন্তু একটা বিষয় অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। একেবারে গোড়ার *উম্মাহ*র ধর্মের মত ইসলামের দর্শন, আইন এবং আধ্যাত্মিকতা গভীরভাবে রাজনৈতিক। মুসলিমরা– প্রশংসনীয়ভাবেই– গভীর সচেতন ছিল যে, সব উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অর্জন সত্ত্বেও তাদের সৃষ্ট সাম্রাজ্য কুরানের নির্দেশিত মানদণ্ড অনুযায়ী চলেনি। খলিফাহ্ *উম্মাহ*র নেতা, কিন্তু তিনি এমনভাবে জীবন কাটিয়েছেন এবং শাসন করেছেন যা হয়ত পয়গম্বরকে শঙ্কিত করে তুলত। যখনই কুরানের আদর্শের সঙ্গে চলমান রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি দেখা গেছে, মুসলিমরা মনে করেছে তাদের সবচেয়ে পবিত্র মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হয়েছে। *উম্মাহ*র রাজনৈতিক স্বাস্থ্য তাদের সত্তার গভীরতম সত্তা স্পর্শ করতে পারে। দশম শতাব্দীর অধিকতর চিন্তাশীল মুসলিমরা বুঝতে পেরেছিল খেলাফত সঙ্কটাপন্ন, কিন্তু খেলাফত ইসলামের চেতনা থেকে এত দূরবর্তী ছিল যে মুসলিমরা এর পতনকে এক ধরনের মুক্তি হিসাবেই অনুভব করেছে।

৩
তুঙ্গ অবস্থা

এক নয়া ব্যবস্থা (৯৩৫-১২৫৮)

দশম শতাব্দী নাগাদ এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে অখণ্ড রাজনৈতিক একক হিসাবে ইসলামী বিশ্ব আর কার্যকরভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে পারবে না। খলিফাহ্ উম্মাহ্‌র নামমাত্র প্রধান হিসাবে ছিলেন এবং প্রতীকী ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বজায় রেখেছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়েছে। মিশর থেকে ইসমায়েলি ফাতেমীয়দের[১] বিচ্ছিন্ন খেলাফত উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, আরবের সিংহভাগ অঞ্চল এবং প্যালেস্টাইন শাসন করেছে; ইরাক, ইরান এবং মধ্য এশিয়ায় তুর্কি সেনা অফিসারগণ (*আমির*) ক্ষমতা দখল করে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজ্যসমূহের প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলোর পরস্পরের সঙ্গে সামরিকভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। দশম শতাব্দীকে শিয়া-শতক হিসাবে অভিহিত করা হয়, কারণ এসব রাজবংশের অনেকগুলোরই শিয়াদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঝোঁক ছিল। কিন্তু *আমির*দের সকলেই আব্বাসীয় খলিফাহ্‌কে উম্মাহ্‌র সর্বাধিনায়ক হিসাবে স্বীকার করা অব্যাহত রাখেন, একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের আদর্শ এমনই সুরক্ষিত ছিল। এসব রাজবংশ কিছু মাত্রায় রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছিল। একটা এমনকি একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্থায়ী মুসলিম ঘাঁটি স্থাপনেও সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১০৫৫-তে নিম্ন সির (Syr) বেসিন হতে আগত সেলজুক তুর্করা বাগদাদে ক্ষমতা দখল করে খলিফাহ্‌র সঙ্গে বিশেষ চুক্তিতে উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউই দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারেনি। খলিফাহ্ তাদের সমগ্র দার আল-ইসলামে তাঁর সহকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেলজুকদের বিজয় অর্জনের পূর্ববর্তী বছরগুলোয় এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যেন সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে। একটি রাজবংশ যেভাবে অপরটির স্থান দখল করছিল আর যেভাবে বদলে যাচ্ছিল সীমান্ত, একজন বহিরাগত পর্যবেক্ষকের এমন ধারণা করা অযৌক্তিক হত না যে, এক স্বল্পস্থায়ী প্রাথমিক সাফল্যের পর ইসলামী বিশ্ব পতনোন্মুখ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এমন ধারণা হত ভুল। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় দুর্ঘটাক্রমেই এক নতুন ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটছিল যা মুসলিম চেতনার অনেক কাছাকাছি হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও ইসলামী ধর্ম ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। প্রত্যেক অঞ্চলের আলাদা রাজধানী ছিল বলে কেবল বাগদাদে একটিমাত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিবর্তে একাধিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ফাতিমীয়দের অধীনে কায়রো শিল্পকলা ও

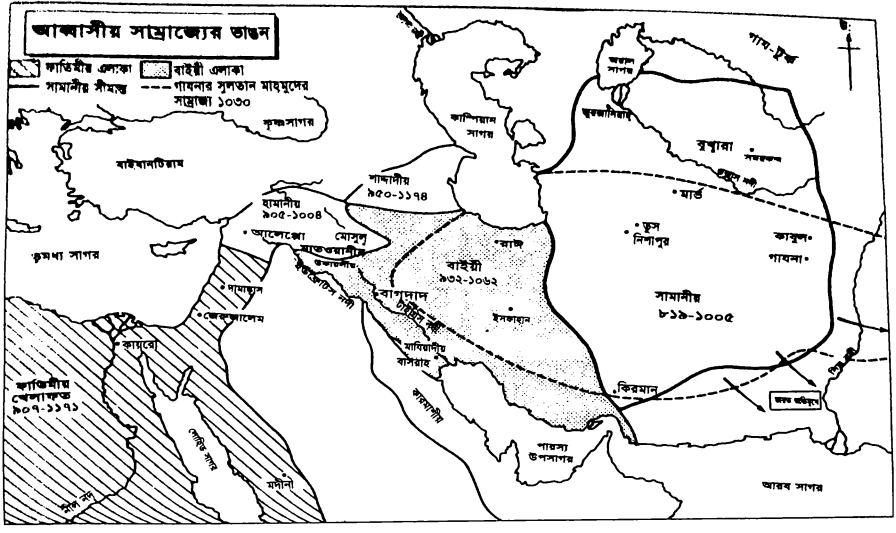

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ভাঙন
ফাতিমীয় এলাকা
বাইয়্যী এলাকা
সামানীয় সীমান্ত
গাযনার সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য ১০৩০
কৃষ্ণসাগর
বাইযানটিয়াম
ভূমধ্য সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আরাল সাগর
খুরজানিয়া
বুখারা
সমরকন্দ
মার্ভ
তুস
নিশাপুর
কাবুল
গাযনা
সামানীয়
৮১৯-১০০৫
শাদ্দাদীয়
৯৫০-১১৭৪
হামানীয়
৯০৫-১০০৪
আলেপ্পো
মোসুল
রাই
বাইয়্যী
৯৩২-১০৬২
ইসফাহান
বাগদাদ
দামাস্কাস
জেরুসালেম
কায়রো
মাযিয়াদীয়
বাসরাহ
কারমাতীয়
কিরমান
পারস্য উপসাগর
আরব সাগর
মদীনা
লোহিত সাগর
ফাতিমীয় খেলাফত
৯০৭-১১৭১
নীল নদ

জ্ঞানার্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়। এখানে দর্শন বিকাশ লাভ করে এবং দশম শতাব্দীতে খলিফাহ্‌গণ আল-আযহার মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, যা একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সমরকন্দেও পারসিয়ান সাহিত্য রেনেসাঁ সংগঠিত হয়। এ পর্যায়ের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন ফায়লাসুফ আবু আলী ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭), পাশ্চাত্যে যিনি আভিসেনা নামে খ্যাত। ইবন সিনা ছিলেন আল-ফারাবির অনুসারী, কিন্তু ধর্মকে অনেক বেশী গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর চোখে একজন পয়গম্বর হলেন আদর্শ দার্শনিক, সাধারণ জনগণের কাছে বিমূর্ত যৌক্তিক সত্যের বাহকমাত্র নন, কেননা তাঁর এমন অন্তর্দৃষ্টির কাছে পৌছার ক্ষমতা ছিল যা এলোমেলো সামঞ্জস্যহীন চিন্তা-ভাবনার ওপর নির্ভরশীল নয়। ইবন সিনা সুফিবাদে আগ্রহী ছিলেন এবং স্বীকার করতেন যে অতীন্দ্রিয়বাদীরা অলৌকিকের এমন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় যা সম্ভব নয়, তবে ফায়লাসুফদের ধারণার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং, ফায়লাসুফ ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিশ্বাস আর প্রচলিত মতে ধার্মিকদের মাঝে ঐক্যতান রয়েছে।

যদিও ১০১০-এ স্পেনে উমাঈয়াহ্ খেলাফত শেষ পর্যন্ত ভেঙে গিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন রাজদরবার সৃষ্টি হয়েছিল, তথাপি কর্ডোভাও এক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ প্রত্যক্ষ করে। স্প্যানিশ রেনেসাঁ বিশেষভাবে এর কাব্যসাহিত্যে জন্যে বেশী খ্যাতি লাভ করে যা ফরাসি ট্রোবাডোর কোর্টলি ঐতিহ্যের অনুরূপ। মুসলিম কবি ইবন হাযাম (৯৯৪-১০৬৪) অপেক্ষাকৃত সরল ধার্মিকতার উদ্ভাবন করেন, যা কেবল *আহাদিসের* ওর নির্ভরশীল এবং জটিল *ফিকহ্*, ম্যাটাফিজিক্যাল দর্শন পরিত্যাগ করেছিল। এসব সত্ত্বেও স্পেনের শেষ পর্যায়ের তারকা বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন ফায়লাসুফ আবু আল-ওয়ালিদ আহমাদ ইবন রুশদ (১১২৬-৯৮), যিনি মুসলিম বিশ্বে সুফিবাদের প্রতি অনুরক্ত ইবন সিনার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর যুক্তিনির্ভর ধ্যান-ধারণা মায়মোনাইডস (Maimonides), টমাস অ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas) এবং (Albert the Great) অ্যালবার্ট দ্য গ্রেটের মত ইহুদি ও ক্রিশ্চান দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছিল। নবম শতাব্দীতে ফিলোলজিস্ট আর্নেস্ট রেনান (Ernest Renan) ইবন রুশদকে (পাশ্চাত্যে অ্যাভেরোস নামে খ্যাত) মুক্ত মনের অধিকারী বলে প্রশংসা করেছিলেন, অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধিতাকারী যুক্তিবাদের আদি পতাকাবাহী ছিলেন ইনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইবন রুশদ ধার্মিক মুসলিম ছিলেন, শরিয়াহ্ আইনের *কাজিও*। ইবন সিনার মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্ম ও ফয়লাসুফদের মাঝে কোনও বিরোধ নেই, কিন্তু ধর্ম যেখানে সর্বজনীন, একমাত্র মননশীল সংখ্যাঘরিষ্ঠেরই উচিত দর্শনের দিকে যাওয়া।

মনে হয় যেন খেলাফত– সকল বাস্তব দিক থেকেই– পরিত্যক্ত হওয়ার পর ইসলাম নতুন করে প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছিল। চরম রাজতন্ত্র আর কুরানের

আদর্শের মাঝে একটা টানাপোড়েন সবসময়ই ছিল। ইসলামী বিশ্বে ক্রমপ্রয়াসের ভেতর দিয়ে আবির্ভূত নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের অনেক কাছাকাছি ছিল। এমন নয় যে সকল নতুন শাসকই ধার্মিক মুসলিম ছিলেন –বরং উল্টো –কিন্তু স্বাধীন রাজদরবার এবং শাসকবৃন্দের ব্যবস্থা– সবাই সমমর্যাদার কিন্তু এক শিথিল জাতীয় ঐক্যের অধীন– কুরানের সাম্যবাদী চেতনার অনেক নিকটবর্তী ছিল। এটা সেই সময়ে মুসলিম বিশ্বে বিকাশমান শিল্পকলার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অ্যাবারাস্ক কোনও একটি হরফকে অন্য হরফের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয় না, প্রত্যেকটা হরফের নিজস্ব অবস্থান রয়েছে এবং তা সমগ্রে নিজস্ব আলাদা অবদান রাখে। ইবন ইসহাক এবং আবু জাফর আল-তাবারি (মৃত্যুঃ ৯৩২)র মত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ পয়গম্বরের জীবনের কখনও কখনও পরস্পর বিরোধী বিবরণের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের খুব একটা প্রয়াস পাননি, বরং পরস্পর বিরোধী বিবরণ পাশাপাশি উল্লেখ করে গেছেন, সমান গুরুত্ব দিয়ে। *উম্মাহ্‌র* ঐক্যের নিশ্চয়তা দেয়ার কারণেই মুসলিমরা খেলাফতকে মেনে নিয়েছিল; কিন্তু যেই খলিফাহ্‌রা দেখালেন যে তাঁদের দ্বারা আর সাম্রাজ্যকে সংহত রাখা সম্ভব নয়, তখন তাঁরা তাদের প্রতীকী মর্যাদায় নামিয়ে এনে সন্তোষ বোধ করল। ইসলামী ধার্মিকতায় একটা পরিবর্তন এসেছিল। এতদিন পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি রাজনৈতিক সাড়ার মাঝেই থিয়োলজি ও আধ্যাত্মিকার মূল নিহিত ছিল। কিন্তু এবার মুসলিমরা আরও অনুকূল রাজনৈতিক ব্যবস্থা লাভ করায়, মুসলিম চিন্তা আর ভক্তি চলমান ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা আগের মত চালিত হচ্ছিল না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, আধুনিক কালে ইসলাম অধিকতর রাজনৈতিক হয়ে পড়েছে, যখন মুসলিমরা নতুন নতুন বিপদের মোকাবিলা করেছে, যা *উম্মাহ্‌র* সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় কল্যাণকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে হয়েছে তাদের এবং এমনকি অস্তিত্বকেই হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে।

পরিকল্পিত নয় বরং কাকতালীয়ভাবেই সেলজুক তুর্করা ফার্টাইল ক্রিসেন্টে (Firtile Crescent) নতুন ব্যবস্থার পর পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছিল। বিকেন্দ্রীকরণ অনেক বেশী অগ্রসর ছিল এখানে। সেলজুকরা ছিল সুন্নী, সুফিবাদের প্রতি জোরাল ঝোঁক ছিল তাদের। ১০৬৩ থেকে ১০৯২ পর্যন্ত তীক্ষ্ণধী পারসিয়ান *উযির* নিযামুলমুলক কর্তৃক তাদের সাম্রাজ্য শাসিত হয়, যিনি সাম্রাজ্যের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পুরনো আব্বাসীয় আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তুর্কিদের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাগদাদকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় আর ছিল না, কেননা এর অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিপ্রধান এলাকা সোয়াদ অপরিবর্তনীয় অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সেলজুক সেনাদেরও সামাল দিতে পারেননি নিযামুলমুলক। যাযাবর গোষ্ঠীর এক অশ্বারোহী বাহিনী ছিল এরা, যেখানে ইচ্ছা তাদের পাল নিয়ে হাজির হত তারা; কিন্তু নতুন দাস-বাহিনীর সহায়তায় নিযামুলমুলক এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যার সীমানা দক্ষিণে ইয়েমেন আর পুবে সির-ওক্সাস বেসিন এবং

পশ্চিমে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এই নতুন সেলজুক সাম্রাজ্যের খুব বেশী আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, স্থানীয় পর্যায়ে *আমির* এবং *উলেমাগণ* আদেশ কার্যকর করতেন, যাঁরা অস্থায়ী অংশীদারী গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত *আমিরগণ* নিযামুলমুলকের কেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনায় বাদ সেধে কার্যতঃ স্বাধীনভাবে যার যার এলাকা শাসন করতে থাকেন এবং বাগদাদের পরিবর্তে অধিবাসীদের কাছ থেকে সরাসরি ভূমিকর আদায় করতে থাকেন। সামন্ত বাদী ব্যবস্থা ছিল না এটা, কারণ উযিরের ইচ্ছা যাই থাকুক না কেন *আমিরগণ* খলিফাহ্ বা সেলজুক সুলতান মালিকশাহ্র সামন্ত ছিলেন না। *আমিরগণ* যাযাবর ছিলেন বলে তাদের এলাকায় চাষাবাদ করার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ ছিল না, সুতরাং ভূমি সংশ্লিষ্ট সামন্ত ধাঁচের কোনও অভিজাতন্ত্র গড়ে তোলেননি তাঁরা। তাঁরা সৈনিক ছিলেন, তাই প্রজাদের নাগরিক জীবনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না, যা কার্যতঃ *উলেমাদের* এলাকায় পরিণত হয়।

উলেমাগণ এইসব বিচ্ছিন্ন সামরিক রাজ্যগুলোকে একত্রিত রেখেছিলেন। দশম শতাব্দীতে নিজেদের শিক্ষার মানের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন তাঁরা এবং ইসলামী বিজ্ঞানের গবেষণার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত *মাদ্রাসা* প্রতিষ্ঠা করেন। এতে করে তাদের প্রশিক্ষণ আরও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শিক্ষা আরও সমরূপ হয় এবং পুরোহিত গোষ্ঠীর মর্যাদা বেড়ে যায়। সেলজুক সাম্রাজ্যে জুড়ে *মাদ্রাসা* প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করেন নিযামুলমুলক, শিক্ষাক্রমের সঙ্গে এমন সব বিষয় যোগ করেছিলেন যা *উলেমাদের* স্থানীয় সরকার পরিচালনায় সক্ষম করে তুলবে। ১০৬৭তে বাগদাদে নিযামিয়াহ্ *মাদ্রাসা* স্থাপন করেন তিনি। নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় *উলেমাগণ* এবার ক্ষমতার একটা ভিত্তি পান, যা *আমিরদের* সামরিক দরবারের চেয়ে আলাদা কিন্তু সমমানের হয়ে দাঁড়ায়। শ্রেণীকৃত *মাদ্রাসাসমূহ* সমগ্র সেলজুক অঞ্চলে শরিয়াহ্ নির্দেশিত পথে মুসলমানদের একই রকম জীবনযাত্রা উৎসাহিত করে। *উলেমাগণ* শরিয়াহ্ আদালতের আইনি ব্যবস্থায়ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে আপনাআপনি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সমাজের নাগরিক জীবনে একটা বিভেদ তৈরি হয়। *আমির* শাসিত ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর কোনওটিই টেকেনি; কোনও রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না তাদের। *আমিররা* খুব স্বল্প বা অস্থায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সামগ্রিক আদর্শবাদ সরবরাহ করতেন *উলেমা* আর সুফি শিক্ষক (*পির*)গণ, যাদের সম্পূর্ণ আলাদা বলয় ছিল। পণ্ডিত *উলেমাগণ* *মাদ্রাসা* হতে *মাদ্রাসায়* ঘুরে বেড়াতেন; সুফি *পিরগণও* সবসময় চলিষ্ণু ছিলেন, এক শহর বা কেন্দ্র থেকে অন্য শহর বা কেন্দ্র দারুণভাবে সফরে যেতেন। ধর্মীয় ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন সমাজকে একসূত্রে গাঁথার সুতোর যোগান দিতে শুরু করেছিলেন।

এভাবে খেলাফতের কার্যকর বিলুপ্তির পর সাম্রাজ্য আরও ইসলামী হয়ে ওঠে। নিজেদের *আমির* শাসিত স্বল্পায়ু রাষ্ট্রের বাসিন্দা ভাবার বদলে মুসলিমরা নিজেদের *উলেমাদের* প্রতিনিধিত্বশীল অধিকতর আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হিসাবে দেখতে

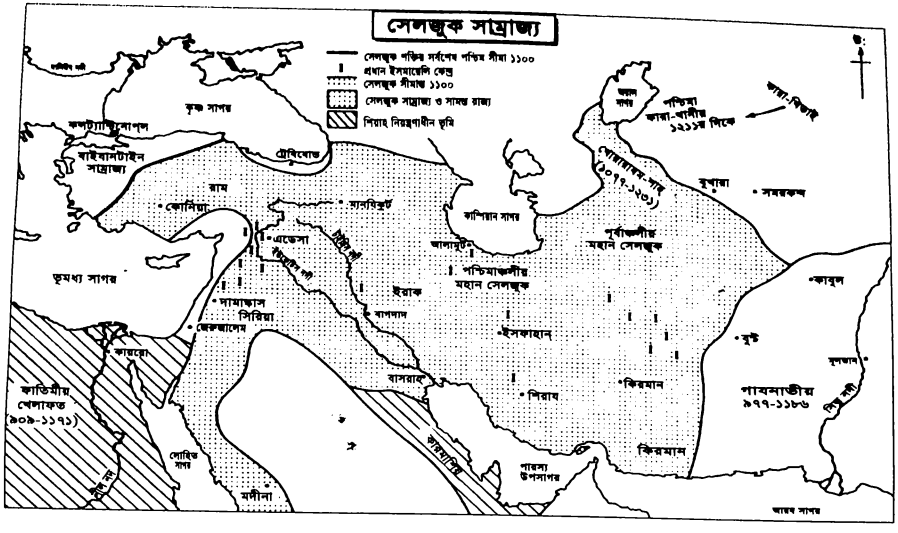

সেলজুক সাম্রাজ্য
সেলজুক শক্তির সর্বশেষ পশ্চিম সীমা ১১০০
প্রধান ইসমায়েলি কেন্দ্র
সেলজুক সীমান্ত ১১০০
সেলজুক সাম্রাজ্য ও সামন্ত রাজ্য
শিয়াহ নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি
কৃষ্ণ সাগর
কনস্ট্যান্টিনোপল
বাইযানটাইন সাম্রাজ্য
ত্রেবিযোন্ড
রূম
কোনিয়া
মানযিকুর্ট
এডেসা
কাস্পিয়ান সাগর
আলামুট
পূর্বাঞ্চলীয় মহান সেলজুক
পশ্চিমাঞ্চলীয় মহান সেলজুক
ইরাক
ভূমধ্য সাগর
দামাস্কাস
সিরিয়া
বাগদাদ
জেরুজালেম
ইসফাহান
কায়রো
বাসরাহ
কিরমান
শিরায
ফাতিমীয় খেলাফত (৯০৯-১১৭১)
লোহিত সাগর
পারস্য উপসাগর
কিরমান
মদীনা
খোয়ারাযম-শাহ (১০৭৭-১২৩১)
বুখারা
সমরকন্দ
পশ্চিমা কারা-খানীয় ১২১১র দিকে
কারা-খিতাই
কাবুল
বুস্ট
মুলতান
গাযনাভীয় ৯৭৭-১১৮৬
আরব সাগর

শুরু করে, যা দার আল-ইসলামের সঙ্গে সহাবস্থানের যোগ্য। *উলেমাগণ* এই নয়া অবস্থার সঙ্গে শরিয়াহ্‌কে মানিয়ে নেন। মুসলিম আইনকে পাল্টা সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে ব্যবহারের পরিবর্তে শরিয়াহ্‌ নতুন খলিফাহ্‌কে পবিত্র আইনের প্রতীকী অবিভাবক হিসাবে দেখল। *আমিরগণ* এসেছেন, বিদায় নিয়েছেন; কিন্তু শরিয়াহ্‌র সমর্থক বলে *উলেমাগণ* একমাত্র স্থিতিশীল কর্তৃপক্ষে পরিণত হন; এবং সুফিবাদ আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সাধারণ মানুষের ধার্মিকতা গভীর হয় এবং এক অভ্যন্তরীণ মাত্রা লাভ করে।

এসময় সর্বত্র সুন্নী ইসলামের অগ্রযাত্রা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধিকতর চরমপন্থী ইসমায়েলিদের কেউ কেউ, যারা ফাতিমীয় সাম্রাজ্যের বেলায় আশাহত হয়েছিল, *উম্মাহ্‌র* মাঝে যা প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যণীয়ভাবে ব্যর্থ হয়, গেরিলাদের এক আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওঅর্ক গঠন করে, সেলজুকদের উৎখাত এবং সুন্নীদের ধ্বংসের কাজে নিবেদিত ছিল এরা। ১০৯০ থেকে কার্যভিনের উত্তরে অবস্থিত আলামুতের পাহাড়ী দুর্গ থেকে হামলা পরিচালনা শুরু করে তারা, সেলজুকদের শক্ত ঘাঁটি দখল করে আর *নেতৃস্থানীয় আমিরদের* প্রাণনাশ করতে থাকে। ১০৯২ নাগাদ তা পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। প্রতিপক্ষের কাছে বিদ্রোহীরা *হ্যাশিশিন* (যেখান থেকে আমাদের "অ্যাসাসিন" শব্দটি এসেছে) নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, কারণ তারা নাকি আত্মঘাতী এসব হামলায় যোগ দানে উৎসাহিত হবার জন্যে হ্যাশিস সেবন করত। ইসমায়েলিরা নিজেদের সাধারণ মানুষের রক্ষক বলে বিশ্বাস করত, যারা নিজেরাই প্রায়ই *আমিরদের* হয়রানির শিকার হত, কিন্তু এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম অধিকাংশ মুসলিমকে ইসমায়েলিদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। *উলেমাগণ* তাদের নিয়ে অবিশ্বাস্য আর ভ্রান্ত কাহিনী ছড়াতে থাকেন (হ্যাশিসের গল্প এসব কিংবদন্তীর অন্যতম), সন্দেহভাজন ইসমায়েলিদের ধরে এনে হত্যা করা হয়, যার ফলে আবার নতুন করে ইসমায়েলি হামলার ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসমায়েলিরা আলামুতের আশপাশে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল, যা ১৫০ বছর টিকে ছিল এবং কেবল মঙ্গোল হানাদাররাই একে ধ্বংস করতে পেরেছিল। অবশ্য তাদের *জিহাদের* প্রত্যক্ষ ফলাফল আশানুযায়ী মাহ্‌দির আগমন ছিল না, বরং গোটা শিয়া সম্প্রদায়ের অপমান ছিল। ইসমায়েলি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকা দ্বাদশবাদীরা (Twelvers) সুন্নী কর্তৃপক্ষকে সযত্নে খুশি রাখে এবং যেকোনও রাজনৈতিক সংশ্রব থেকে দূরে সরে থাকে। সুন্নীরা তাদের দিক থেকে একজন থিয়োলজিয়ানের ভূমিকায় সাড়া প্রদানে প্রস্তুত ছিল যিনি তাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রামাণিক সংজ্ঞা প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন, যাঁকে পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম বলে অভিহিত করা হয়।

আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযযালি (মৃত্যু: ১১১১) উযির নিযামুলমুলকের আশ্রয়প্রাপ্ত ছিলেন, এবং বাগদাদস্থ নিযামিয়াহ্‌ *মাদ্রাসার* লেকচারার এবং ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। ১০৯৫-তে এক নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হন।

এই সময়ে ইসমায়েলি বিদ্রোহ তুঙ্গে পৌঁছেছিল, কিন্তু আল-গাযযালি বিশ্বাস হারাচ্ছেন ভেবেই প্রধানত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় আবিষ্কার করেন তিনি, কথা বলতে পারছিলেন না: চিকিৎসকগণ তাঁর মাঝে গভীর মানসিক আবেগাসঞ্জাত দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করেন: পরে গাযযালি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যদিও ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন: কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরকে জানেন না বলে উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। তো জেরুজালেমে চলে যান তিনি, সেখানে সুফি চর্চা করেন, দশ বছর পর ইরাকে ফিরে আসার পর রচনা করেন অসাধারণ গ্রন্থ *ইয়াহ্ আলাম আল-দিন* (*দ্য রিভাইভাল অভ দ্য রিলিজিয়াস সায়েন্সেস*)। এটা কুরান এবং *আহাদিসের* পর সর্বাধিক উদ্ধৃত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হল কেবল আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রার্থনাই মানুষকে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জোগাতে পারে: কিন্তু থিয়োলজি (*কালাম*) এবং ফালসাফাহ্‌র যুক্তিসমূহ ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারে না। *ইয়াহ্* মুসলিমদের এক দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক ও প্রায়োগিক কর্মধারার যোগান দেয়, যা তাদের এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রস্তুত করে তোলে। খাওয়া, ঘুমানো, ধোয়া, স্বাস্থ্য এবং প্রার্থনা সংক্রান্ত সকল শরিয়াহ্ আইনের ভক্তিমূলক ও নৈতিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, ফলে সেগুলো আর নেহাত বাহ্যিক নির্দেশাবলী না থেকে মুসলিমদের কুরান উল্লেখিত ঈশ্বর সম্পর্কে চিরন্তন সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম করে তুলেছে। এভাবে শরিয়াহ্ সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার কায়দা এবং পয়গম্বর ও তাঁর *সুন্নাহ্‌র* যান্ত্রিক বাহ্যিক অনুকরণের অতিরিক্ত কিছুতে পরিণত হয়েছে: এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অভ্যন্তরীণ *ইসলাম* অর্জনের উপায়। আল-গাযযালি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের জন্যে লেখেননি, বরং সাধারণ ধার্মিকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। তিনি মনে করতেন তিন ধরনের মানুষ আছে: যারা বিনা প্রশ্নে ধর্মীয় সত্যকে মেনে নেয়, যারা *কালামের* যুক্তিভিত্তিক অনুশীলনে তাদের বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তির সন্ধান করে: আর সুফিগণ, যাদের ধর্মীয় সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের ভিন্ন ধর্মীয় সমাধানের প্রয়োজন সে সম্পর্কে সজাগ ছিলেন আল-গাযযালি। একজন নিষ্পাপ *ইমামের* প্রতি ইসমায়েলিদের অগাধ ভক্তি অপছন্দ ছিল তাঁর: কোথায় আছেন এই *ইমাম*? সাধারণ মানুষ কীভাবে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে? একজন কর্তৃত্বময় ব্যক্তিত্বের ওপর এই নির্ভরশীলতাকে কুরানের সাম্যবাদের লঙ্ঘন বলে মনে হয়েছে তাঁর। ফালসাফাহ্‌কে তিনি গণিত আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত শাস্ত্রের জন্যে অপরিহার্য হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু যুক্তি প্রয়োগের অতীত আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কে এটা নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশ দিতে পারে না। আল-গাযযালির দৃষ্টিতে সুফিবাদই সমাধান, কারণ এর অনুশীলন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে। প্রাথমিককালে উলেমাগণ সুফিবাদ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন এবং একে বিপজ্জনক প্রান্তিক আন্দোলন হিসাবে দেখেছেন। আল-গাযযালি এবার ধর্মীয় পণ্ডিতদের সুফি

অতীন্দ্রিয়বাদীদের উদ্ভাবিত ধ্যানের আচারগুলো পালন এবং শরিয়াহ্‌র বাহ্যিক নিয়মাচারের প্রচারণার পাশাপাশি এই অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিকতায়ও উৎসাহিত করার আহ্বান জানালেন। ইসলামের জন্যে উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে আল-গাযযালি অতীন্দ্রিয়বাদকে সোচ্চার স্বীকৃতি দিয়েছেন, নিজের কর্তৃত্ব আর মর্যাদা ব্যবহার করে মুসলিম জীবনের মূলধারায় এর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছেন।

আপন সময়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন আল-গাযযালি। এই সময়ে সুফিবাদ জনপ্রিয় আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল, এটা আর সংখ্যালঘুদের মাঝে সীমিত থাকেনি। এ পর্যায়ে অতীতের মত জনগণের ধার্মিকতা *উম্মাহ্‌র* রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না থাকায় তারা অতীন্দ্রিয়বাদীর ইতিহাস নিরপেক্ষ, কিংবদন্তীর অভ্যন্তরীণ অভিযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। গূঢ় বিদ্যার্থী মুসলিমদের একান্ত অনুশীলনের পরিবর্তে *জিকর* (dhikr)– ঐশী নাম জপ– দলীয় চর্চায় পরিণত হয়, যা মুসলিমদের *পিরের নির্দেশনায়* চেতনার বিকল্প স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। সুফিরা তাদের দুর্জ্ঞেয়ের সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সঙ্গীত শুনত। *পিরের* চারপাশে জমায়েত হত তারা, শিষ্যরা যেমন এককালে *ইমামদের* ঘিরে থাকত, তাঁকে ঈশ্বরের পথে পরিচালক হিসাবে দেখত। যখন কোনও *পির* পরলোকগমন করতেন, কার্যতঃ একজন "সাধু" ("Saint")তে পরিণত হতেন তিনি– পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু– আর লোকে তাঁর সমাধিতে প্রার্থনা আর *জিকর* অনুষ্ঠান করত। প্রত্যেক শহরে এসময় মসজিদ বা *মাদ্রাসার* মত আলাদা *খানকাহ্‌* (আশ্রম) ছিল, যেখানে স্থানীয় *পির* তাঁর অনুসারীদের নির্দেশনা দান করতেন। নতুন নতুন সুফি পদ্ধতি (*তুরিকাহ্‌*) গড়ে ওঠে, গেগুলো নির্দিষ্ট কোনও এলাকায় সীমিত না থেকে সমগ্র দার আল-ইসলামে শাখা বিস্তার করে আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছিল। এসব *তুরিকাহ্‌* এভাবে বিকেন্দ্রীয়ায়িত সাম্রাজ্যের *ঐক্য* বজায় রাখার আরেকটা উপায়ে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন শহরের কারুশিল্পী এবং বণিকদের জন্যে নতুন ভ্রাতৃসংঘ আর সমিতি (*ফুতুওয়াহ্‌- futuwwah*) গুলোও একই উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল, যেগুলো প্রবলভাবে সুফি আদর্শে প্রভাবিত ছিল। ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোই ক্রমবর্ধমানহারে সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাখছিল এবং একই সময়ে একেবারে অশিক্ষিতদের ধর্ম বিশ্বাসও এক ধরনের অভ্যন্তরীণ অনুরণন লাভ করেছিল, যা এক সময় কেবল অভিজাত এবং বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর করায়ত্ত ছিল।

এরপর আর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সংমিশ্রিত নয় এমন ধর্মতাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনার অস্তিত্ব থাকেনি। নতুন "থিয়োসফাররা" (Theosophers) এই নয়া মুসলিম সিনথেসিসের প্রচার করেন। আলেপ্পোয় ইয়াহিয়া সুহরাওয়ার্দি (মৃত্যুঃ ১১৯১) প্রাচীন প্রাক ইসলামী ইরানি অতীন্দ্রিয়বাদের ওপর ভিত্তি করে আলোকনের (*আল-ইশরাক*) নতুন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত দর্শনকে তিনি ফালসাফাহ্‌র মাধ্যমে মননের সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ এবং সুফিবাদের মাধ্যমে হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, এ দুয়ের মিশেলের ফলাফল হিসাবে দেখেছেন। যুক্তি এবং

অতীন্দ্রিয়বাদকে অবশ্যই হাত ধরাধরি করে এগোতে হবে; মানুষের জন্যে উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং সত্যের অনুসন্ধানে উভয়ের প্রয়োজন রয়েছে। অতীন্দ্রিয়বাদীদের দর্শন (Vision) এবং কুরানের প্রতীকসমূহ (যেমন স্বর্গ, নরক ও শেষ বিচার) অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ করা যাবে না; বরং ধ্যানীর প্রশিক্ষিত সজ্ঞামূলক গুণাবলী দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। অতীন্দ্রিয় মাত্রার বাইরে ধর্মের কিংবদন্তী কোনও অর্থ বহন করে না, কেননা সেগুলো আমাদের স্বাভাবিক সচেতনতা দিয়ে অনুভূত জাগতিক ঘটনাবলীর মত "বাস্তব" ("real") নয়। একজন অতীন্দ্রিয়বাদী নারী বা পুরুষ নিজেকে সুফি অনুশীলনের মাধ্যমে জাগতিক অস্তিত্বের অভ্যন্তরীণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্যে প্রশিক্ষিত করে তোলে। মুসলিমদের *আলম আল-মিথালের*– "খাঁটি প্রতিবিম্বের জগৎ" (the world of pure images)– অনুভূতি গড়ে তুলতে হয়, যা নশ্বর জগৎ আর ঈশ্বরের মাঝে বিরাজমান। এমনকি যারা প্রশিক্ষিত অতীন্দ্রিয়বাদী নয় তারাও নিদ্রিত অবস্থায় বা ঘোরে থাকার সময় স্বপ্ন বা হিপনোগোগিক ইমেজারিতে এই জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। সুহ্‌রাওয়ার্দি বিশ্বাস করতেন, যখন কোনও পয়গম্বর বা অতীন্দ্রিয়বাদী কিছু প্রত্যক্ষ করেন (vision), তিনি অন্তস্থঃ জগৎ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠেন, যা আজকের দিনে আমরা যাকে অবচেতন মন বলি তার অনুরূপ।

ইসলামের এই ধরন হাসান আল-বাসরি বা শাফীর কাছে অচেনা ঠেকত। নিজের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুহ্‌রাওয়ার্দির মৃত্যুদণ্ড হতে পারত, কিন্তু ধার্মিক মুসলিম ছিলেন তিনি, অতীতের যেকোনও ফায়লাসুফের তুলনায় অনেক বেশী কুরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর রচনা আজও অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্রুপদী সাহিত্য হিসাবে পঠিত হয়ে থাকে। একই রকম পঠিত হয় দ্রুতপ্রজ এবং প্রবল প্রভাবশালী স্প্যানিশ থিয়োসফার মুঈদ আদ-দিন ইবন আল-আরাবিব (মৃত্যুঃ ১২৪০) গ্রন্থসমূহ। আল-আরাবিও মুসলিমদের নিজের মাঝে *আলম আল-মিথাল* অনুসন্ধানের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরকে পাওয়ার উপায় সৃজনশীল কল্পনার (Creative Imagination) মাঝে নিহিত। ইবন আল-আরাবির গ্রন্থসমূহ সহজপাঠ্য নয়, কিন্তু অধিকতর মননশীলদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছে; তবে তিনি বিশ্বাস করতেন, যে কেউই সুফি হতে পারে এবং সবারই উচিত ঐশী গ্রন্থের প্রতীকী, গুপ্ত অর্থের সন্ধান করা। মুসলিমদের দায়িত্ব রয়েছে নিজেদের কল্পনাকে শাণিত করার মাধ্যমে উপরিতলের অভ্যন্তরে সর্বত্র এবং সর্বজনে বিরাজমান পবিত্র সত্তাকে দেখে নিজস্ব থিয়োফ্যানি সৃষ্টি করা। প্রতিটি মানুষই অনন্য এবং ঈশ্বরের কোনও না কোনও গুপ্ত গুণাবলীর অপুনরাবৃত্তিযোগ্য উন্মোচন এবং আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশে স্থোদিত স্বর্গীয় নাম দিয়েই আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারব। ব্যক্তিগত প্রভুর (Personal Lord) দর্শন ব্যক্তির জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের শর্তাধীন। এভাবে অতীন্দ্রিয়বাদীকে সকল ধর্মবিশ্বাসকে সম বৈধভাবে দেখতে হবে এবং তাকে সিনাগগ, মসজিদ, গির্জা বা মন্দিরে সমান স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হবে, যেমন কুরানে ঈশ্বর বলেছেন: "আর যেদিকেই তুমি মুখ ফেরাও, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক।"[২]

এভাবে খেলাফতের বিলোপের পর এক ধর্মীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এতে করে সাধারণ শিল্পী এবং অভিজাত বুদ্ধিজীবীগণ সমভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। একটি প্রকৃত মুসলিম জাতি অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছিল, যারা ধর্মকে গভীর স্তরে মেনে নিতে শিখেছিল। মুসলিমরা এক ব্যাপক আধ্যাত্মিক নবজাগরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতি সাড়া দিয়েছিল যা নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে ধর্মকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ইসলাম এসময় রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়াই বিকশিত হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষেই রাজনৈতিক পরিবর্তনশীল বিশ্বে এটাই কেবল অপরিবর্তনীয়।

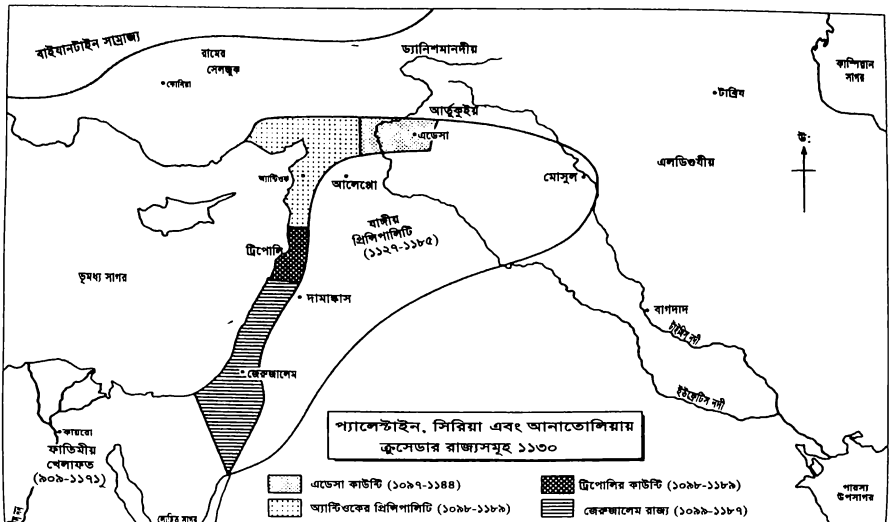

প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং আনাতোলিয়ায় ক্রুসেডার রাজ্যসমূহ ১১৩০
বাইযানটাইন সাম্রাজ্য
রামের সেলজুক
কোনিয়া
ড্যানিশমানদীয়
আর্তুকুইয়
এডেসা
কাস্পিয়ান সাগর
টাব্রিয
এলডিগুযীয়
উ:
আন্টিওক
আলেপ্পো
মোসুল
যাঙ্গীয় প্রিন্সিপালিটি (১১২৭-১১৮৫)
ত্রিপোলি
ভূমধ্য সাগর
দামাস্কাস
বাগদাদ
টাইগ্রিস নদী
জেরুজালেম
ইউফ্রেটিস নদী
কায়রো
ফাতিমীয় খেলাফত (৯০৯-১১৭১)
লোহিত সাগর
পারস্য উপসাগর
এডেসা কাউন্টি (১০৯৭-১১৪৪)
অ্যান্টিওকের প্রিন্সিপালিটি (১০৯৮-১১৮৯)
ত্রিপোলির কাউন্টি (১০৯৮-১১৮৯)
জেরুজালেম রাজ্য (১০৯৯-১১৮৭)

ক্রুসেডসমূহ

একাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ সেলজুক তুর্কিদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে শুরু করলেও তাদের অধীনে বিকাশ লাভ করা রাজনৈতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত *আমির*দের ব্যবস্থা টিকে ছিল। এব্যবস্থার সুস্পষ্ট ঘাটতি ছিল। *আমিরগণ* অবিরাম পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন, ফলে বহিস্থঃ কোনও শত্রুর মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারতেন না কিছুতেই। এ ব্যাপারটি দুঃখজনকভাবে জুলাই ১০৯৯-তে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, যখন পশ্চিম ইউরোপ থেকে আগত ক্রিশ্চান ক্রুসেডাররা মক্কা ও মদীনার পর মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় পবিত্র নগরী জেরুজালেম আক্রমণ করে. এখানকার অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে এবং প্যালেস্টাইন, লেবানন ও আনাতোলিয়ায় রাষ্ট্র স্থাপন করে তারা। সেলজুক সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত অঞ্চলের *আমিরগণ* ঐক্যবদ্ধ পাল্টা আঘাত হানতে পরেননি। আগ্রাসী পশ্চিমা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তাদের অসহায় বলে মনে হয়েছে। এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবার পর মসুল ও আলেপ্পোর *আমির* ইমাদ আদ-দিন যাঙ্গি ১১৪৪-এ আর্মেনিয়া থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আরও প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হবার পর পশ্চিমে সালাদিন নামে খ্যাত কুর্দিশ সেনাপতি ইউসুফ ইবন আইয়ুব সালাহ্ আদ-দিন ১১৮৭-তে ক্রুসেডারদের দখল থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নিয়েছিলেন. ক্রুসেডাররা অবশ্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ অবধি নিকট প্রাচ্যে উপকূলবর্তী একটা অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই বহিস্থঃ হুমকির কারণে সালাদিন প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবীয় রাজবংশ ফার্টাইল ক্রিসেন্টের *আমির* শাসিত স্বল্পায়ু রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে বেশী দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছিল। অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে সালাদিন মিশরের ফাতিমীয় রাজবংশকে পরাজিত করে এর এলাকাকে নিজের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেন এবং অধিবাসীদের সুন্নি ইসলামে ফিরিয়ে আনেন।

ক্রুসেডসমূহ ন্যাক্কারজনক হলেও পাশ্চাত্য ইতিহাসের ক্ষেত্রে গঠনমূলক ঘটনা ছিল; এগুলো নিকট প্রাচ্যের মুসলিমদের পক্ষে বিপর্যয়কর ছিল বটে, কিন্তু ইরাক, ইরান, মধ্য এশিয়া, মালয়, আফগানিস্তান এবং ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জন্যে ছিল সুদূর কোনও সীমান্ত সংঘর্ষের মত। একেবারে বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য অধিকতর শক্তিশালী ও হুমকিতে পরিণত হবার পরেই কেবল মুসলিম

ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের ক্রুসেডসমূহের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছেন. বিজয়ী সালাদিনের কথা স্মরণ করে নস্টালজিয়াগ্রস্ত হয়ে তেমনি এক নেতার আকাঙ্ক্ষা করেছেন. যিনি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের নব্য ক্রুসেড প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন।

সম্প্রসারণ

ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ১০৭০-এ ফাতিমীয়দের কাছ থেকে সেলজুকদের সিরিয়া দখলের ঘটনা। এই অভিযানকালে দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রুগ্ন বাইযানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল তারা। সেলজুকরা যখন সীমান্ত অতিক্রম করে আনাতোলিয়ায় পা রাখে, ১০৭১-এ মানযিকুর্টের যুদ্ধে তারা বাইযানটাইনদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে। এক দশক সময়কালের মধ্যেই তুর্কি যাযাবররা সমগ্র আনাতোলিয়ায় তাদের পশুপাল নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর *আমিরগণ* ছোট ছোট রাষ্ট্রের পত্তন করেন যেগুলোর পরিচালনায় ছিল মুসলিমরা, যারা আনাতোলিয়াকে নতুন সীমান্ত আর সম্ভাবনাময় দেশ বলে মনে করেছিল। তুর্কিদের এই অগ্রযাত্রা প্রতিরোধের ক্ষমতাহীন বাইযানটাইন সম্রাট প্রথম আলেক্সাস কমনেনাস ১০৯১তে পোপের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। আবেদনে সাড়া দিয়ে পোপ দ্বিতীয় আরবান প্রথম ক্রুসেডের আহ্বান জানান। অনাতোলিয়ার অংশবিশেষ ক্রুসেডাররা অধিকার করলেও তাতে করে তুর্কিদের ঐ অঞ্চলে অগ্রাভিযান রুদ্ধ হয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তুর্কিরা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় পৌছে যায়; চতুর্দশ শতাব্দীতে তারা এজিয়ান সাগর অতিক্রম করে; বলকান এলাকায় বসতি গড়ে তোলে এবং পৌছে যায় দানিউব অবধি। অতীতে কখনও কোনও মুসলিম শাসক বাইযানটিয়ামকে এত শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করতে পারেনি, এই সাম্রাজ্যটির প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সম্মানজনক ইতিহাসের পটভূমি ছিল। সুতরাং অহঙ্কার বশতই তুর্কিরা আনাতোলিয়ায় তাদের নতুন রাষ্ট্রটিকে "রাম" (Rum) বা রোম নামে অভিহিত করেছিল। খেলাফতের পতন সত্ত্বেও মুসলিমরা এবার এমন দুটি এলাকায় সম্প্রসারিত হল যা কখনওই দার-আল-ইসলামের অংশ ছিল না – পূর্ব ইউরোপ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটা অংশ– এবং যে এলাকাটি অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত সৃজনশীল অঞ্চলে পরিণত হয়।

খলিফাহ্ আল-নাসির (১১৮০-১২২৫) বাগদাদ এবং এর আশপাশে খেলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের শক্তি উপলব্ধি করে ইসলামের আশ্রয় নেন তিনি। আদিতে খেলাফত শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ শরিয়াহ্‌র আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু আল-নাসির *আলিম* হওয়ার লক্ষ্যে এবার চারটি সুন্নী মতবাদ নিয়েই পড়াশোনায় লিপ্ত হলেন। এক *ফুতুওয়াহ্* সংগঠনেও যোগ

দিয়েছিলেন তিনি, উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে বাগদাদের সকল *ফুতুওয়াহ*র মহাগুরু (Grand Master) হিসাবে গড়ে তোলা। আল-নাসিরের পরলোকগমনের পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এই নীতিমালা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। অচিরেই ইসলামী জগৎ এক মহাবিপর্যয়ের মুখে পড়ে, যা শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় খেলাফতের সহিংস ও করুণ পরিসমাপ্তি ডেকে এনেছিল।

মঙ্গোল (১২২০-১৫০০)

দূরপ্রাচ্যে মঙ্গোল গোত্র অধিপতি জেংঘিস খান এক বিশ্ব-সাম্রাজ্য গড়ে তুলছিলেন, ইসলামী জগতের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ছিল অনিবার্য। সেলজুকদের বিপরীতে তিনি তাঁর যাযাবর বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাদের এমন এক যুদ্ধবাজ যন্ত্রে পরিণত করেন যে তাদের মত ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার অধিকারী বাহিনী বিশ্ব এর আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। কোনও শাসক যদি অবিলম্বে এই মঙ্গোল গোত্রপতির কাছে নতি স্বীকার না করতেন, অনায়াসে ধরে নেয়া যেত যে তাঁর রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ভূমিস্মাৎ হয়ে গেছে, হত্যাযজ্ঞে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অধিবাসীরা। মঙ্গোলদের হিংস্রতা পরিকল্পিত কৌশল ছিল বটে; কিন্তু তা নাগরিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাযাবর গোষ্ঠীর তীব্র অসন্তোষেরও পরিচায়ক। খয়ারাযমিয়ান তুর্কিদের শাহ্ মুহাম্মদ(১২০০-১২২০) যখন ইরান এবং ওক্সাস অঞ্চলে নিজস্ব মুসলিম খেলাফত গড়ে তোলার প্রয়াস পান, মঙ্গোল সেনাপতি হুলেগু (Hulegu) বেপরোয়া ঔদ্ধত্য বলে ধরে নেন একে। ১২১৯ থেকে ১২২৯ পর্যন্ত মঙ্গোলরা মুহাম্মদ এবং তাঁর পুত্র জালাল আল-দিনকে গোটা ইরান থেকে আযেরবাইজান হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে ধাওয়া করে বেরিয়েছে। ১২৩১-এ নতুন করে আবার উপর্যুপরি হামলার সূচনা ঘটে। একের পর এক মুসলিম নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধূলিসাৎ হয়ে যায় বুখারা, একমাত্র যুদ্ধে পতন ঘটে বগদাদের, সেই সঙ্গে অবসান ঘটে মৃত্যুপথযাত্রী খেলাফতের: পথে পথে লাশের স্তূপ পড়েছিল, শরণার্থীরা পালিয়ে গিয়েছিল সিরিয়া, ইরাক আর ভারতে। আলামূতের ইসমায়েলিদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয় এবং যদিও রামে সেলজুকদের নতুন রাজবংশ দ্রুত মঙ্গোলদের কাছে নতি স্বীকার করেছিল, কিন্তু তা আর কখনওই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। প্রথম যে মুসলিম শাসক মঙ্গোলদের ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হন তিনি হলেন তুর্কি দাস বাহিনী শাসিত নতুন মিশরীয় রাষ্ট্রের সুলতান বায়বরস। মামলুকরা (দাস) সালাদিন প্রবর্তিত আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল: ১২৫০-এ মামলুক *আমিরগণ* আইয়ুবীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সফল অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে নিকট প্রাচ্যে নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৬০-এ উত্তর প্যালেস্টাইনের আইন জালুটে বায়বরস মঙ্গোল সেনাবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ভারতে পরিচালিত

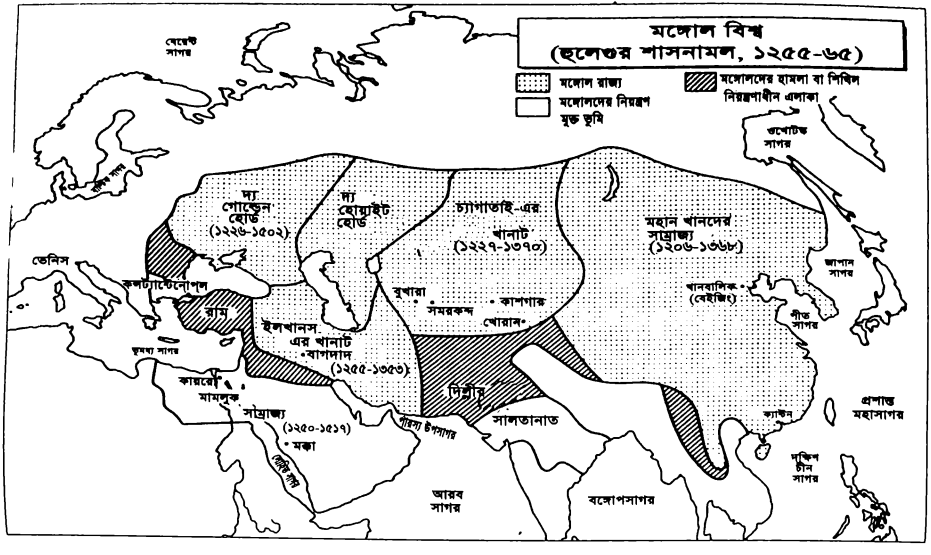

মঙ্গোল বিশ্ব
(হুলেগুর শাসনামল, ১২৫৫-৬৫)
মঙ্গোল রাজ্য
মঙ্গোলদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ভূমি
মঙ্গোলদের হামলা বা শিথিল নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা
বেরেন্ট সাগর
ওখোটস্ক সাগর
দ্য গোল্ডেন হোর্ড (১২২৬-১৫০২)
দ্য হোয়াইট হোর্ড
চ্যাগাতাই-এর খানাট (১২২৭-১৩৭০)
মহান খানদের সাম্রাজ্য (১২০৬-১৩৬৮)
ভেনিস
কনস্ট্যান্টিনোপল
রূম
বুখারা
সমরকন্দ
কাশগার
খোতান
খানবালিক (বেইজিং)
জাপান সাগর
পীত সাগর
ইলখানস-এর খানাট
বাগদাদ
(১২৫৫-১৩৫৩)
ভূমধ্য সাগর
কায়রো
মামলুক সাম্রাজ্য (১২৫০-১৫১৭)
মক্কা
পারস্য উপসাগর
দিল্লীর সালতানাত
ক্যান্টন
প্রশান্ত মহাসাগর
দক্ষিণ চীন সাগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর

আক্রমণ দিল্লীর নয়া সালতানাত ঠেকিয়ে দেয়ার পর মঙ্গোলরা বিজয়ের ফল ভোগ করার উদ্দেশ্যে স্থির হয়, চীনে অবস্থানরত মঙ্গোল খান কুবলাইয়ের অনুগত ইসলামী জগতের কেন্দ্রভূমিতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তারা।

মঙ্গোলরা চারটি বৃহদাকার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ছিল। ইল-খানস্ নামে পরিচিত (মহাশক্তিধর খানের প্রতিনিধি) হুলেগুর বংশধররা প্রথমে তাদের পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মানতে চাননি, দামাস্কাস ধ্বংস করার পর অবশেষে ক্ষান্ত হন তাঁরা এবং টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস উপত্যকা আর ইরানের পার্বত্য অঞ্চলে আপন সাম্রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। চ্যাঘাতাই মঙ্গোলরা সির-ওক্সাস বেসিনে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, অন্যদিকে হোয়াইট হোর্ডরা (White Horde) আরটিশ (Irtish) এলাকায় আর গোল্ডেন হোর্ডরা (Golden Horde) ভলগা নদীর আশেপাশে বসতি গড়ে। সপ্তম শতাব্দীর আরবীয় আগ্রাসনের পর এটাই ছিল মধ্যপ্রাচ্যে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন; কিন্তু আরব মুসলিমদের বিপরীতে মঙ্গোলরা সঙ্গে করে কোনও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আসেনি। অবশ্য তারা সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিল, যদিও ঝোঁক ছিল বুদ্ধ মতবাদের দিকে। তাদের আইন কাঠামো, ইয়াসা (Yasa) যা স্বয়ং জেংঘিস খানের অবদান, ছিল একেবারেই সামরিক ব্যবস্থা, যা সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করেনি। মঙ্গোলদের নীতি ছিল কোনও এলাকা কুক্ষিগত করার পর সেখানকার স্থানীয় ট্র্যাডিশনের অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া, ফলে এয়োদশ শতাব্দীর শেষ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু নাগাদ চারটি মঙ্গোল সাম্রাজ্যই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

তো মঙ্গোলরা কেন্দ্রীয় ইসলামী মূল এলাকার প্রধান মুসলিম শক্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য যাই হোক না কেন তাদের রাষ্ট্রীয় মূল আদর্শ ছিল "মঙ্গোলিজম" যা মঙ্গোলদের সাম্রাজ্যবাদী এবং সামরিক শক্তিকে মহিমান্বিত করেছে আর বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছে। গোটা রাজ্য সামরিক কায়দায় পরিচালিত হত। সম্রাট ছিলেন সর্বাধিনায়ক এবং তিনি স্বয়ং সেনাদলের নেতৃত্ব দেবেন বলে প্রত্যাশিত ছিল, অভিযানের দায়িত্ব সহকারীদের ওপর ছেড়ে দেবেন না। এই কারণে গোড়ার দিকে কোনও রাজধানী ছিল না। খান এবং তাঁর সেনাবাহিনী যখন যেখানে শিবির স্থাপন করতেন সে জায়গাই রাজধানীতে পরিণত হত। রাজ্যের পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেনাবাহিনীর মত পরিচালিত হত, প্রশাসন সেনাবাহিনীর সঙ্গে অভিযানে যোগ দিত। জটিল শিবির সংস্কৃতি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে। প্রধান দুটো রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল: বিশ্ব শাসন আর শাসক রাজবংশের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ, যে জন্যে সবরকম নিষ্ঠুরতাই বৈধ। এই আদর্শের সঙ্গে প্রাচীন অ্যাবসোলিউটিস্ট পলিটির সাদৃশ্য আছে, যেখানে বিশ্বাস করা হত যে শাসনকর্তার ক্ষমতা যত বেশী হবে রাজ্যের শান্তি আর নিরাপত্তাও তত দৃঢ় হবে। কোনও রাজবংশের সকল সম্রাটের জারি করা আদেশ পরিবার যতদিন ক্ষমতাসীন থাকত ততদিন কার্যকর বলে বিবেচিত হত, ফলে অন্য সব আইনগত

ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ত। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সকল দায়িত্ব পরিবারের সদস্য আর স্থানীয় ক্লায়েন্ট ও আশ্রিতদের মাঝে বণ্টন করা হত, যাদের সবাইকে রাজ্যের কেন্দ্রে বিশাল যাযাবর বাহিনীর অনুগামীতে পরিণত করা হত।

ইসলামের সাম্যবাদী চেতনার সঙ্গে এমন ব্যাপক পার্থক্য আর কিছু হতে পারে না; কিন্তু এক অর্থে এটা ছিল আব্বাসীয় খেলাফতের শেষ পর্যায়ে সংঘটিত সমাজ ব্যবস্থার সামরিকীকরণেরই ধারাবাহিকতা, যেখানে *আমিরগণ* গ্যারিসনে অবস্থান করে শাসন কাজ চালাতেন আর সাধারণ মানুষ ও *উলেমাগণ* চলতেন তাদের নিজস্ব ইসলামী ব্যবস্থায়। কোনও *আমির* স্থিতিশীলতার অনুরূপ কিছু অর্জনে সক্ষম হলে নাগরিক জীবনে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রবল সম্ভাবনা সবসময়ই রয়ে যেত। মঙ্গোল শাসকদের অধীনে একটা পর্যায় পর্যন্ত এমনটি ঘটেছে, যারা *উলেমাদের* ওপর নতুন নতুন বিধিনিষেধ আরোপের মত যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শরিয়াহকে আর সম্ভাব্য রাজদ্রোহী আইন থাকতে দেয়া হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ ঐকামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে *উলেমাগণ* আর নিজস্ব স্বাধীন বিবেচনা বোধ (*ইজতিহাদ*) প্রয়োগ করে আইন নির্মাণ করতে পারবেন না; বলা হয় যে "*ইজতিহাদের* দ্বার" বন্ধ হয়ে গেছে। মুসলিমরা অতীতের কর্তৃপক্ষের বিধিবিধান মেনে নিতে বাধ্য হল। নীতিগতভাবে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের একটা ব্যবস্থায় পরিণত হল, যা শাসক পরিবারের অধিকতর গতিশীল বংশগত আইনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না।

মুসলিম জীবনে মঙ্গোল হস্তক্ষেপ ছিল বেদনাদায়ক। মঙ্গোলরা তাদের পেছনে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী আর লাইব্রেরির ভস্মস্তূপ রেখে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বভাব। কিন্তু বিজয় অর্জন করার পর মঙ্গোলরা ধ্বংস করা নগরীগুলোকে চোখ ধাঁধানো রূপে পুনর্নির্মাণ করে। জাঁকাল দরবারও প্রতিষ্ঠা করে তারা যেখানে বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইতিহাস আর অতীন্দ্রিয়বাদ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। মঙ্গোলদের ধ্বংস ভয়াবহ হলেও, মঙ্গোল শাসকরা মুসলিম প্রজাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ছিলেন। তাদের রাজনৈতিক কাঠামোগুলো নীরব স্থায়ীত্ব পেয়েছে এবং আমরা লক্ষ্য করব, পরবর্তীকালের মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মঙ্গোলদের ক্ষমতা নতুন দিগন্তের আভাস দিয়েছিল। তারা যেন গোটা বিশ্ব জয় করবে বলে মনে হয়েছিল। এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ছিল তারা যা প্রবল ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে যোগ করেছিল বিশ্ব শাসনের সম্ভাবনা। তাদের সাম্রাজ্যের জাঁকজমকে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তারা মুসলিমদের পূর্ব-ধারণাকে বিনষ্ট করলেও মুসলিমরা কিন্তু তাদের প্রত্যক্ষ করা হিংস্রতায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি, কিংবা এইসব মঙ্গোলরাজ্যগুলোর তুলে ধরা রাজনৈতিক পরাজয় হতদ্যোম করেনি তাদের। ইসলাম একটি স্থিতিস্থাপক ধর্ম। মুসলিমরা তাদের ইতিহাসে বারবার বিপর্যয়ের প্রতি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং নতুন ধর্মীয় দর্শন (insight) পাবার লক্ষ্যে গঠনমূলকভাবে একে ব্যবহার করেছে। তো মঙ্গোল-আগ্রাসনের পরেও তাই

ঘটেছে: মানুষ তখন অনুভব করল যে তাদের চেনা জগতের অবসান ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু আবার একেবারে নতুন এক বৈশ্বিক ব্যবস্থাও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

সুফি অতীন্দ্রিয়বাদী জালাল আল-দিন রুমির (১২০৭-৭৩) দর্শনে এ ব্যাপারটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে। নিজে মঙ্গোলদের শিকার ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর শিক্ষা মঙ্গোলদের বয়ে আনা সীমাহীন সম্ভাবনার বোধটিকেই তুলে ধরে। রুমির জন্ম হয়েছিল খুরাসানে, তাঁর পিতা ছিলেন একজন *আলিম* এবং সুফিগুরু। রুমি স্বয়ং ফিকহ, থিয়োলজি, আরবী এবং পারসিয়ান সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু অগ্রসরমান মঙ্গোল অশ্বারোহীবাহিনীর কবল থেকে রক্ষা পেতে তাঁর পরিবার পালাতে বাধ্য হয়। তাঁরা আনাতোলিয়ায় রাম সালতানাতের রাজধানী কোনিয়ায় শরণার্থী হিসাবে আসেন। রুমির আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টির গৃহহীনতা আর ঐশী উৎস ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। মানুষের উপর নেমে আসা সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ভাগ্য হল, জোর দিয়ে বলেছেন রুমি, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা অনুভব না করা, যা নারী বা পুরুষকে ধর্মীয় অনুসন্ধানে তাড়িত করে। আমাদের অবশ্যই নিজের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করতে হবে, বুঝতে হবে যে আমাদের আত্মবোধ এক মায়া। আমাদের অহম বাস্তবতাকে আড়াল করে রাখে এবং অহমবোধ ও স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দেয়ার ভেতর দিয়ে আমরা আবিষ্কার করব যে একমাত্র ঈশ্বরই অস্তিত্ববান।

রুমি ছিলেন "মাতাল সুফি" (Drunken Sufi)। তাঁর আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিজীবন বিভিন্ন চরম আবেগের পর্যায় স্পর্শ করেছে; নৃত্য, সঙ্গীত, কবিতা এবং গানে পরমানন্দের (ecstacy) অনুসন্ধান করেছেন তিনি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সদস্যদের প্রায়ই তাদের অনন্য ঘূর্ণি-নৃত্যের কারণে "ঘূর্ণায়মান দরবেশ" (Whirling Dervishes) বলে অভিহিত করা হয়: এই নাচ অতিলৌকিকের এক ঘোরলাগা অবস্থার সৃষ্টি করে। রুমি তাঁর স্পষ্ট অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও জীবৎকালে অনুসারীদের কাছে মাওলানাহ্ (আমাদের প্রভু) হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং আজও তার্কিতে তাঁর মাওলানাহ্ ব্যবস্থার বিপুল প্রভাব রয়েছে। তাঁর প্রধান রচনা *মাসনাবি* (Mathnawi) সুফি ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। ইবন আল-আরাবি যেখানে মননশীলদের জন্যে লেখালেখি করেছেন রুমি সেখানে সমগ্র মানব জাতিকে নিজেদের উর্ধ্বে ওঠার আহবান জানিয়েছেন, দৈনন্দিন জীবনের নৈমিত্তিকতাকে ছাড়িয়ে যেতে বলেছেন। *মাসনাবি* সুফি জীবনধারাকে বিধি-সম্মত করে তোলে যা যে-কাউকে স্বর্গলোক এবং আত্মার মাঝে চিরন্তন যুদ্ধে অপরাজেয় বীরে রূপান্তরিত করতে পারে। মঙ্গোল অগ্রাসনসমূহ এক অতীন্দ্রিয়বাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, জনগণকে তাদের মনের গভীরে অনুভূত বিপর্যয় সামলে ওঠার শক্তি জুগিয়েছে তা এবং রুমি ছিলেন এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত নতুন সুফি *তরিকাহ্*সমূহ মানবজীবনের সীমাহীন সম্ভাবনার ওপর জোর দিয়েছে। মঙ্গোলরা জাগতিক রাজনীতিতে যা অর্জন করেছিল সুফিগণ সেটাই আধ্যাত্মিক পর্যায়ে অনুভব করতে পারে।

অন্যরা এসময়ের উত্থান-পতনে ভিন্নভাবে সাড়া প্রদান করেছিল। আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ, যখন অনেক কিছুই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, এক ধরনের রক্ষণশীলতার জন্ম দিয়েছিল, কৃষিভিত্তিক সমাজের যা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। সীমিত সম্পদ যখন থাকে তখন, আধুনিক পাশ্চাত্যে যেমন পারি আমরা, তেমনিভাবে আবিষ্কার বা মৌলিক উদ্ভাবনে উৎসাহ জোগানো সম্ভব হয় না। পাশ্চাত্যে আমরা আমাদের পিতা-মাতার প্রজন্মের চেয়ে আরও বেশী জানতে চাই এবং আমাদের সন্তানরা আরও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ ভোগ করবে বলে আশা করি। আমাদের পূর্ববর্তী কোনও সমাজের এভাবে বর্তমান কালের উদ্ভাবনের দাবী অনুযায়ী কর্মীদের লাগাতারভাবে পুন:প্রশিক্ষণ আর অবকাঠামোর পরিবর্তন আনার সাধ্য ছিল না। পরিণামস্বরূপ, প্রাক-আধুনিক সকল সমাজে, কৃষিভিত্তিক ইউরোপসহ, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিমধ্যে যা কিছু অর্জিত হয়েছে তাকে টিকিয়ে রাখা এবং ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও কৌতূহলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, যেন সমাজ বা গোষ্ঠীর স্থিতিশীলতা বিনষ্ট না হয়। কেননা, ওই সামজের নবনব ধারণার সংহতি ও প্রয়োগ করার কোনও উপায় ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, *মাদ্রাসাসমূহে* ছাত্ররা প্রাচীন বিবরণ ও টীকাভাষ্য মন দিয়ে মুখস্থ করেছে এবং শিক্ষার উপাদান ছিল একটি মান-গ্রন্থের শাব্দিক ব্যাখ্যা। পণ্ডিতদের মধ্যে প্রকাশ্য বিতর্কের ক্ষেত্রে ধরেই নেয়া হত যে বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের একজন সঠিক ও অন্যজন অসঠিক। প্রশ্নোত্তরমূলক ধরনের পাঠে বিপরীতমুখী দুটি পক্ষের মাঝে বিরোধের ভেতর দিয়ে কোনও নতুন সিন্থেসিস বের করে আনার ভাবনা ছিল না। এভাবে *মাদ্রাসাসমূহ* সেইসব ধ্যান-ধারণার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়াস পেয়েছে যেগুলোর সাহায্যে সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে এবং ধর্ম বিরোধী ধ্যান ধারণাকে চাপা দেয়া যাবে, যেন বিরোধ সৃষ্টির ফলে মানুষ সরল পথ ত্যাগ করে আপন পথ বেছে না নেয়।

চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ একমাত্র শরিয়াহ্‌র পাঠ ও পালনই সুন্নী, শিয়া, সুফি এবং ফায়লাসুফ– অর্থাৎ সকল মুসলিমের গৃহীত ধার্মিকতার রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ের *উলেমারা* বিশ্বাস করতে থাকেন যে ইসলামী ইতিহাসের একেবারে সূচনাকাল থেকেই এসব আইনের অস্তিত্ব রয়েছে। এভাবে রুমির মত কিছু সুফি যখন নতুন দিগন্তের দিকে তাকানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, *উলেমাদের* অনেকেই তখন বিশ্বাস করছিলেন যে কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। এ কারণে "*ইজতিহাদের দ্বার*" রুদ্ধ হওয়ায় সন্তুষ্ট ছিলেন তাঁরা। অতীতের শিক্ষার ব্যাপক ক্ষতি, পাণ্ডুলিপির বিনাশ এবং জ্ঞানী-গুণীদের নির্বিচারে হত্যার পর সম্পদের পুনরুদ্ধারই নতুন কোনও পরিবর্তন আনার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মঙ্গোল সামরিক আইনে সাধারণ নাগরিকদের বিষয়ে কোনও বিধিব্যবস্থা না থাকায় *উলেমারা* বিশ্বাসীদের জীবনধরন পরিচালনা অব্যাহত রাখেন এবং তাঁদের প্রভাব রক্ষণশীলতার দিকে ধাবিত হয়। রুমির মত সুফিরা যেখানে সকল ধর্মকেই বৈধ বলে বিশ্বাস করেছেন, চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ *উলেমাগণ* সেখানে কুরানের বহুত্ব মতবাদকে কঠিন সাম্প্রদায়িকতায় রূপ দিয়েছেন, যেখানে অন্য ট্র্যাডিশনসমূহকে অতীতের মূল্যহীন নজীর হিসাবে

দেখা হয়। অমুসলিমদের জন্যে এই সময় পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা সফর নিষিদ্ধ হয়ে যায়, আর পয়গম্বর মুহাম্মদ(স:) সম্পর্কে কোনও আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ পরিণত হয় মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই, অগ্রাসনের যাতনা মুসলিমদের মাঝে নিরাপত্তাহীনতার বোধ জাগিয়েছিল। ভিনদেশীরা কেবল সন্দেহভাজনই নয়, তারা মঙ্গোলদের মতই ভয়ঙ্কর হতে পারে।

কিন্তু "*ইজতিহাদের* দ্বার" রুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী *উলেমা*গণও ছিলেন। সমগ্র ইসলামী ইতিহাস জুড়ে, রাজনৈতিক সংকটের সময় –বিশেষ করে বিদেশী দখলদারিত্বের সময়– একজন সংস্কারক (*মুজদাদিদ*) প্রায়শ বিশ্বাসের জাগরণ ঘটান যাতে তা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। এইসব সংস্কারক সাধারণত একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে থাকেন। এগুলো রক্ষণশীল, কেননা একেবারে নতুন সমাধান সৃষ্টির বদলে তা মূলে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পায়। কিন্তু কুরান ও *সুন্নাহ*র আদি ইসলামে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে সংস্কারকারকগণ প্রায়শই পবিত্র বলে বিবেচিত পরবর্তী মধ্যযুগীয় সকল পরিবর্তনকে প্রতিমা পূজার বিরোধিতার মত বিতাড়ন করতে চান। এঁরা বিদেশী প্রভাবের বেলায়ও সন্দিহান হন এবং ভিনদেশী সংযোগও– যা তাঁদের দৃষ্টিতে ধর্মবিশ্বাসের খাঁটিত্বকে বিনষ্ট করে। এধরনের সংস্কারকগণ মুসলিম সমাজের একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছেন। আমাদের বর্তমান সময়ে যাদের "মুসলিম মৌলবাদী" বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাদের অনেকেই *মুজদাদিদ*দের রেখে যাওয়া পুরনো প্যাটার্নই হুবহু বেছে নিয়েছে।

মঙ্গোল পরবর্তীকালের পৃথিবীর যুগ-শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন আহমাদ ইবন তাঈমিয়াহ্ (১২৬৩-১৩২৮)। দামাস্কাসের *আলিম* ছিলেন তিনি, মঙ্গোলদের চরম ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিল নগরীটি। হানবালি *মাযহাবের* অনুসারী এক প্রাচীন *উলেমা* পরিবারে ইবন তাঈমিয়াহ্র জন্ম, শরিয়াহ্র মূল্যবোধ সুসংহত করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদিও মঙ্গোলরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু আসলে তারা অপশক্তি এবং ধর্মত্যাগী, কেননা তারা শরিয়াহ্র পরিবর্তে ইয়াসা জারি করেছে। একজন প্রকৃত সংস্কারকের মতই পয়গম্বর ও *রাশিদুন* পরবর্তী যুগে ইসলামের বিকাশকে –যেমন শিয়াবাদ, সুফিবাদ এবং ফালসাফাহ্– মেকি হিসাবে আক্রমণ করেছেন তিনি,। তবে তাঁর একটা ইতিবাচক কর্মসূচীও ছিল। পরিবর্তিত এই সময়ে মুসলিমদের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার স্বার্থে শরিয়াহ্কে সময়োপযোগী করতে হবে, সেজন্যে যদি কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা *ফিক্হ*'র বেশীরভাগ বিসর্জনও দিতে হয়। সুতরাং শরিয়াহ্র চেতনামুখী বৈধ সমাধান আবিষ্কারের লক্ষ্যে জুরিস্টদের জন্যে *ইজতিহাদের* প্রয়োগ আবশ্যক, যদি তাতে সাম্প্রতিককালে যেভাবে আইনের ভাষ্য নেয়া হচ্ছে তার লঙ্ঘনও ঘটে। প্রশাসনের জন্যে উদ্বেগজনক ব্যক্তি ছিলেন ইবন তাঈমিয়াহ্। কুরান ও *সুন্নাহ*'য় তাঁর প্রত্যাবর্তন এবং ইসলামের সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের বেশীরভাগেরই প্রত্যাখ্যান হয়ত প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল, কিন্তু আবার

বিপ্লবীও। রক্ষণশীল *উলেমাদের* খেপিয়ে তুলেছিলেন তিনি, যাঁরা গ্রন্থভুক্ত জবাব আঁকড়ে ছিলেন; সিরিয়ার মামলুক সরকারেরও সমালোচনা করেছেন তিনি, তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামী আইনবিরোধী আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করার কারণে। ইবন তাঈমিয়াহ্‌কে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং বলা হয় যে মনের দুঃখে মারা গেছেন তিনি, কারণ আটককারীরা তাঁকে লেখালেখির অনুমতি দেয়নি। কিন্তু দামাস্কাসের সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালোবেসেছিল, কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাঁর শরিয়াহ্‌র সংস্কার উদারপন্থী ছিল এবং তিনি মনেপ্রাণে তাদের প্রয়োজনের কথা ভেবেছেন। তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানটি গণস্বীকৃতির এক বিশাল প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছিল।

পরিবর্তন উত্তেজনাকর হতে পারে, আবার বিব্রতকরও। টিউনিসে আব্দ আল-রাহমান ইবন খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) ইসলামী জগতের পশ্চিম প্রান্ত, মাগরিবে একের পর এক রাজবংশের পতন প্রত্যক্ষ করেছেন। প্লেগ মহামারিতে ধ্বংস হয়ে গেছে অসংখ্য জনবসতি। যাযাবর গোত্রগুলো মিশর থেকে উত্তর আফ্রিকায় এসে ব্যাপক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেই সঙ্গে যোগ হয় ঐতিহ্যবাহী বারবার (Berbar) সমাজের নিম্নমুখী যাত্রা। ইবন খালদুন স্বয়ং টিউনিসিয়ায় এসেছিলেন স্পেন থেকে যেখানে ক্রিশ্চানরা মুসলিম এলাকায় এক সফল *রিকনকুইস্টা* (*reconquista*) পরিচালনা করে ১২৩৬-এ কর্ডোভা এবং ১২৪৮-এ সেভিল দখল করে নিয়েছিল। সমৃদ্ধ মুসলিম রাজ্য আল-আন্দালুসের বাকি রয়ে গিয়েছিল কেবল নগর-রাজ্য গ্রানাডা, যা ১৪৯২তে ক্রিশ্চানদের কাছে পরাস্ত হয়, কিন্তু তার আগেই চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অনন্যসাধারণ আলহাম্বরা প্রাসাদ নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতই সঙ্কটে নিপতিত ছিল ইসলাম। "যখন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে," বলেছেন ইবন খালদুন, "সেটা যেন গোটা সৃষ্টি বদলে যাওয়া, বদলে যাওয়া গোটা বিশ্বেরই, যেন নতুন করে সৃষ্টি ঘটছে, এক পুনর্জন্ম, নতুন করে অস্তিত্ব পেয়েছে জগৎ।"[৩]

ইবন খালদুন এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণগুলো আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত: তিনি ছিলেন সর্বশেষ প্রধান স্প্যানিশ ফায়লাসুফ; তাঁর অসাধারণ উদ্ভাবন ছিল ইতিহাসের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিক যুক্তিবাদের নীতিমালার প্রয়োগ, এর আগে পর্যন্ত যা দার্শনিকদের মনোযোগের বাইরে ছিল বলে মনে করা হয়, কেননা এটা চিরন্তন সত্যের পরিবর্তে কেবল অস্থায়ী, অনিশ্চিত ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করে। কিন্তু ইবন খালদুন বিশ্বাস করতেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের অন্তরালে বিশ্বজনীন আইন সমাজের ভাগ্যকে পরিচালিত করে। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে দলীয় সংহতির (*আসিবীয়াহ্-asibiyyah*) প্রবল বোধই কোনও জাতিকে টিকে থাকতে সক্ষম করে তোলে এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে অন্য জাতিকে বশীভূত করা যায়। এই অধিকার বোঝায় যে প্রভাবশালী দলটি অধীনের লোকদের সম্পদ আত্মীকরণ করে সংস্কৃতি আর জটিল নাগরিক জীবন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু শাসকশ্রেণী যখন বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, আত্মপ্রসাদ জাঁকিয়ে বসে তখন এবং তারা তাদের প্রাণশক্তি হারাতে শুরু করে। তারা আর

তখন প্রজাদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেয় না, নিজেদের মাঝে ঈর্ষা আর কোন্দল শুরু হয়ে যায়; অর্থনীতি নিম্নগামী হতে শুরু করে। এভাবে রাষ্ট্রটি এক নয়া গোত্রীয় বা যাযাবর বাহিনীর কাছে, যারা তাদের নিজস্ব *আসিবীয়াহ্‌র* প্রথম পর্যায়ে, নাজুক হয়ে পড়ে এবং আবার চক্রটির সূচনা ঘটে। ইবন খালদুনের প্রধান রচনা *আল-মাকাদ্দিমাহ্‌: অ্যান ইনট্রোডাকশন টু হিস্ট্রি* ইসলামের ইতিহাসে এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়েছে, যা পরবর্তী বছরগুলোয় মুসলিম সাম্রাজ্য নির্মাণকারীগণ ও উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ নিবিষ্ট মনে পাঠ করেছেন। ইবন খালদুনকে ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখেছেন এঁরা।

চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মঙ্গোল রাজ্যগুলোর পতন প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন ইবন খালদুন, যা তাঁর তত্ত্বকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। তাদের আদি *আসিবীয়াহ্‌* চরমে পৌঁছেছিল, আত্মপ্রসাদ জাঁকিয়ে বসেছিল, এবং মঞ্চ তৈরি হয়ে গিয়েছিল অন্য প্রভাবশালী দলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার। এটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল যে নতুন নেতাদের আগমন ঘটবে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র থেকে নয় বরং মুসলিম বিশ্বের প্রান্তবর্তী এলাকা থেকে, যা মঙ্গোল শাসনাধীন ছিল না। ইতিমধ্যে মিশর ও সিরিয়ায় মামলুক সাম্রাজ্যেরও পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তুঙ্গ সময়ে মামলুকরা শক্তিশালী esprit de corps এর এক বিকাশমান সংস্কৃতিক প্রাণবন্ত সমাজ নির্মাণ করেছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ যেকোনও কৃষিভিত্তিক রাজ্যের মত সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যটি ধসে পড়তে শুরু করে।

সময়ের চেতনা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে শাসক, তিনি সির (Syr) উপত্যকাবাসী এক তুর্কি, সমরকন্দে মঙ্গোল চ্যাঘাতাই রাজ্যে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি এবং মঙ্গোল আদর্শের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল ছিলেন। টিমুর (১৩৩৬-১৪০৫), যিনি টিমুর ল্যাঙ্ক (খোঁড়া টিমুর) নামে পরিচিত, কারণ স্পষ্ট খুঁড়িয়ে চলতেন তিনি, পাশ্চাত্য যার পরিচয় টাম্বুর লেইন, পতনোন্মুখ চ্যাঘাটাই সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে নিজেকে মঙ্গোল বংশোদ্ভূত দাবী করেন এবং অতীতের হামলাগুলোর মতই একই রকম বর্বরতায় পুরনো মঙ্গোল এলাকা পুনর্দখলে নামেন। টিমুর তাঁর সাফল্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর ধ্বংসলীলার প্রতি আকর্ষণকে ইসলামের প্রতি আবেগের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিলেন, আর যেহেতু তিনি তাঁর সময়ের চেতনাকে-নিখুঁতভাবে ধারণ করেছেন, একজন লোকনায়কে পরিণত হন তিনি। সমরকন্দে দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে বসতেন। তাঁর ইসলামের– গোঁড়ামিপূর্ণ, নিষ্ঠুর এবং সহিংস –সঙ্গে *উলেমাদের* রক্ষণশীল ধার্মিকতা বা সুফিদের ভালোবাসার মতবাদের সামান্যই মিল ছিল। নিজেকে আল্লাহর শাস্তিদূত হিসাবে দেখেছেন তিনি, মুসলিম *আমিরদের* অন্যায় আচার অনুষ্ঠানের কারণে শাস্তি দিতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং দুষ্টের দমন; যদিও প্রজারা টিমুরের নিষ্ঠুরতাকে ভয় পেত, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর বিচ্ছিন্নতার পর তাঁর শক্তিশালী সরকারের গুণও গেয়েছে। পূর্বসূরী মঙ্গোলদের মত টিমুরকেও অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল এবং একসময় ধারণা জন্মেছিল যে তিনি বিশ্ব

জয় করতে যাচ্ছেন। ১৩৮৭ নাগাদ গোটা ইরানি উঁচু অঞ্চল এবং মেসোপটেমিয়ার সমভূমি অধিকার করে নেন তিনি। ১৩৯৫তে রাশিয়ায় গোল্ডেন হোর্ড দখল করেন এবং ১৩৯৮তে চড়াও হন ভারতের ওপর, এখানে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করেন, ধ্বংস করে দেন দিল্লী। এর দু'বছর পর আনাতোলিয়া জয় করেন তিনি, দামাস্কাসকে কুক্ষিগত করেন এবং এক হত্যাযজ্ঞ চালান বাগদাদে। অবশেষে ১৪০৪-এ চীনের দিকে অগ্রসর হন তিনি, পরের বছর নিহত হন সেখানে।

কেউই টিমুরের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে পারেনি। বিশ্ব জয় তখনও এক অসম্ভব স্বপ্ন রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে গানপাউডারের আবিষ্কার মুসলিম শাসকদের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃহৎ কিন্তু অধিকতর নিয়ন্ত্রণযোগ্য সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সফল করে তুলেছিল। এখানেও ইসলামের সঙ্গে মঙ্গোল আদর্শের মিশ্রণের প্রয়াস ছিল। এসব নতুন সাম্রাজ্য ভারত, আযেরবাইজান এবং আনাতোলিয়ায় ভিত্তি পেয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুদূর রেঙ্গুন পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় ইসলাম ভালোভাবেই শেকড় গেড়ে বসে। পার্বত্য এলাকা সমূহের নগণ্য সংখ্যক হিন্দু রাজপুত, ভারতীয় শাসক শ্রেণী, দূরত্ব বজায় রেখেছিল, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মুসলিম আধিপত্য মেনে নেয়। যেমন মনে হয়, ব্যাপারটা ততটা বিস্ময়কর ছিল না। জাতপ্রথা রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুশীলন মুষ্টিমেয়ে পরিবারের হাতে সীমিত রেখেছিল এবং এই পরিবারগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর হিন্দুরা তাদের জায়গায় যেকাউকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল, যদি তাতে তাদের জাতপ্রথার বিধিবিধান লঙ্ঘিত না হয়। বহিরাগত হিসাবে মুসলিমরা এসব বিধিনিষেধ অনুসরণে বাধ্য ছিল না, এবং তাদের পেছনে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সমাজের শক্তি ছিল। মুসলিমরা ভারতে সংখ্যালঘু রয়ে যায়। নিম্নবর্ণের কিছু হিন্দু, অস্পৃশ্যদের একটা অংশসহ, মূলত সুফি *পির*দের প্রচারণার ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের হিন্দু, বুদ্ধ এবং জৈন আনুগত্য বজায় রাখে। একথা ঠিক নয় যে, যেমনটি জোরের সঙ্গে বলা হয়ে থাকে, মুসলিমরা ভারতে বুদ্ধধর্ম ধ্বংস করেছে। মাত্র একটা মঠে আক্রমণের একমাত্র প্রমাণ আছে, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের সমর্থনসূচক কোনও অকাট্য দলিল বা তথ্য নেই। ১৩৩০ নাগাদ উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশ দিল্লীর সালতানাতের কর্তৃত্ব মেনে নেয়, কিন্তু সুলতানদের পক্ষের অবিবেচক সরকার মুসলিম *আমির*দের মাঝে বিদ্রোহ জাগিয়ে দেয় এবং এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে একজন ব্যক্তির শাসনের পক্ষে সালতানাতের আকার অনেক বড়। স্বাভাবিকভাবেই, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ভেঙে পড়ে এবং *আমির*গণ *উলেমা*দের সাহায্যে যাঁর যাঁর রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। গানপাউডার আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত দিল্লীর সালতানাত মুসলিম ভারতের অনেক শক্তির মাঝে অন্যতম ছিল।

মঙ্গোল রাজাসমূহের প্রান্তবর্তী এলাকায় *গাজী* যোদ্ধাদের তাদের নিজস্ব আমিরাত পরিচালনা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল, মঙ্গোল শাসকদের অধিরাজ বলে

স্বীকার করে নিয়েছিল তারা। *গাজীরা* সাধারণভাবে ধার্মিক এবং সুফিবাদের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে ছিল। আযেরবাইজান ও আনাতোলিয়ায় বিভিন্ন *তরিকাহ্* গড়ে উঠেছিল যেগুলো সুফিবাদের কোনও কোনও চরমপন্থী ধরনের সঙ্গে প্রাচীন বিপ্লবাত্মক শিয়া বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছিল। তারা "চরমপন্থী" *ঘুলুউ* (*ghuluww*) ধর্মতত্ত্বের পুনর্জাগরণ ঘটায় যা প্রাথমিক যুগের শিয়াদের অনুপ্রাণিত করেছিল, এই মত অনুযায়ী আলীকে ঈশ্বরের অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়, এরা বিশ্বাস করত যে, পরলোকগত *আমিরগণ* "ঊর্ধ্বগামী" (Occultation) হয়েছেন এবং প্রায়শঃ নেতাদের মাহ্দি হিসাবে শ্রদ্ধা জানাত, যিনি ন্যায়-বিচারের নবযুগের সূচনা ঘটাতে ফিরে এসেছেন। আনাতোলিয়ার বক্তাশি দরবেশদের (Bekhtashe dervishes) ব্যাপক অনুসারী ছিল; তারা অত্যাসন্ন নতুন ব্যবস্থার কথা বলত যা প্রাচীন ধর্মীয় নিয়মকানুন ঝেড়ে বিদায় করবে। আযেরবাইজানের সাফাভিয়াহ্ ব্যবস্থাও একই রকম গোঁড়া বিশ্বাসের অনুসারী ছিল। সুন্নী *তরিকাহ্* হিসাবে সূচিত হলেও পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ তা *ঘুলুউ* ধ্যানধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয়, এই মতাবলম্বীরা নিজেদের দ্বাদশবাদী শিয়া বলে আখ্যায়িত করত। নেতাকে তারা সপ্তম ইমামের বংশধর হিসাবে বিশ্বাস করত; সেকারণে তিনিই মুসলিম *উম্মাহ্র* একমাত্র বৈধ নেতা। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই মতবাদের *পির* ইসমায়েল, যিনি হয়ত নিজেকে গুপ্ত ইমামের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন, ইরানে এক শিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মঙ্গোল রাজ্যসমূহের পতন ঘটলে, সমগ্র আনাতোলিয়া ছোট ছোট স্বাধীন *গাজী* রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়, যেগুলো আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষপর্যায় থেকে পতনশীল বাইযানটাইন সাম্রাজ্যের শহর আর গ্রামাঞ্চল ছিনিয়ে নিতে শুরু করে। এই রাজ্যগুলোর অন্যতম ক্ষুদ্র রাজ্য শাসিত হচ্ছিল ওসমানলি পরিবারের হাতে; যা চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্রমবর্ধমান হারে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৩২৬-এ ওসমানলি বা অটোমানরা বাসরাহ্ দখল করে নেয়, যা তাদের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৩২৯-এ তারা ইয্নিক ছিনিয়ে নেয় এবং ১৩৭২ নাগাদ বাইযানটিয়ামের বৃহত্তর এলাকা দখল করে। এডিরনে (অ্যাড্রিয়ানোপল) এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে তারা এবং বাইযানটাইন সম্রাটকে নির্ভরশীল মিত্রে পরিণত করে। অটোমানদের সাফল্যের রহস্য ছিল তাদের প্রশিক্ষিত পদাতিক বাহিনীর শৃঙ্খলা; এ বাহিনী "নয়া বাহিনী" (*yeni-cheri* বা Janissary) নামে পরিচিত এক দাসবাহিনী। প্রথম মুরাদ (১৩৬০-৮৯) সবচেয়ে শক্তিশালী পশ্চিমা মুসলিম শাসকে পরিণত হন। ১৩৭২-এ বলকান এলাকায় অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান তিনি, বলকান পেনিনসূলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি স্বাধীন বুলগার এবং সারবিয়া রাজ্যে আক্রমণ চালান। ১৩৮৯তে অটোমানরা মধ্য সার্বিয়ায় কসোভো যুদ্ধক্ষেত্রে সার্বীয় সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। মুরাদ নিহত হন, কিন্তু সারবীয় যুবরাজ হ্রেলবেলিয়ানোভিচ লাযার (Hrevlbeljanovic Lazar) কে বন্দী ও পরে হত্যা করা হয়। এর সঙ্গে সমাপ্তি ঘটে সারবিয়ার স্বাধীনতার এবং আজও সাবরিয়রা যুবরাজ

লায়ারকে একজন শহীদ এবং জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে থাকে; ইসলামের প্রতি গভীর ঘৃণা পোষণ করে তারা। কিন্তু অটোমানদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং তা কোনওভাবেই বাইযানটাইন প্রজাসাধারণের সিংহভাগের কাছে অজনপ্রিয় ছিল না। বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিপতিত ছিল পুরানো সাম্রাজ্য; অটোমানরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে, চাঙা করে তোলে অর্থনীতি; আর জনগণের অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৪০২তে অ্যাংরায় টিমুর তাদের সেনাদলকে পরাজিত করলে অটোমানরা প্রথম বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, কিন্তু টিমুরের মৃত্যুর পর তারা আবার শক্তি সংহত করতে সক্ষম হয়; এবং ১৪৫৩তে দ্বিতীয় মেহমেদ (১৪৫১-৮১) খোদ কনস্ট্যান্টিনোপলই অধিকার করে নিতে সক্ষম হন– নতুন গানপাউডার অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী বাইযানটাইন সাম্রাজ্য, মুসলিমরা যাকে "রাম" (রোম) বলে অভিহিত করত, ইসলামকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। একের পর এক খলিফাহ্ পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এবার "মেহমেদ দ্য কনকোয়েরার" পুরনো স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিলেন। এক নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে এসে পৌছাল তখন মুসলিমরা। মঙ্গোল-বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে নতুন এক শক্তির সন্ধান পেল তারা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইসলামী জগৎ বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব-ইউরোপে ঢুকে পড়েছিল তা, মুসলিম বণিকদের সুবাদে ইউরেশিয়ান প্রান্তরে আর সাব-সাহারান আফ্রিকায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম বণিকগণ পূর্ব-আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল, দক্ষিণ আরব এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উকূলবর্তী এলাকায়ও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। মুসলিম বণিকগণ, প্রত্যেকেই ধর্মের একেকজন প্রচারক, এমন একটা সময়ে মালয়ে বসতি করে যখন সেখানে বুদ্ধদের বাণিজ্য ভেঙে পড়েছিল, অচিরেই তারা যারপরনাই মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। সুফি ধর্মপ্রচারকগণ ব্যবসায়ীদের অনুসরণ করে এবং চতুদর্শ ও পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ মালয় মুসলিম আধিপত্যের দেশে পরিণত হয়। গোটা বিশ্বই ইসলামী হতে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল: এমনকি যারা মুসলিম শাসনাধীনে ছিল না তারাও আবিষ্কার করেছিল যে মুসলিমরা মহাসাগরগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে, এবং নিজের দেশ ছেড়ে বের হতে গেলেই ইসলামী রাজ্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর সূচনার দিকে ইউরোপীয় নাবিকরা যখন বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো করছে, তখনও তারা মুসলিমদের সাগরপথ থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। ইসলামকে অপরাজেয় মনে হয়েছে যেন। মুসলিমরা এখন নয়া সাম্রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত, যা হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সর্বাধুনিক।

৪
বিজয়ী ইসলাম

রাজকীয় ইসলাম (১৫০০-১৭০০)

গানপাউডারের আবিষ্কার এবং এর ব্যবহার সামরিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায় যার ফলে শাসকরা আগের চেয়ে বেশী প্রজাদের ওপর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। আরও বৃহত্তর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন তাঁরা, যদি দক্ষ পরীক্ষিত প্রশাসনের ব্যবস্থা করতে পারতেন। আব্বাসীয় ক্ষমতার অবনতির সময় থেকে ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ানো সামরিক রাষ্ট্র এবার অস্তিত্ব পেল। ইউরোপেও রাজারা বিশাল কেন্দ্রীকৃত রাজ্য এবং পরম রাজতন্ত্র গড়ে তুলতে শুরু করছিলেন, যেখানে আরও সুসমন্বিত সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনটি প্রধান ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে: ইরানে সাফাভীয় সাম্রাজ্য, ভারতে মোঘুল সাম্রাজ্য এবং আনাতোলিয়া, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও আরবে অটোমান সাম্রাজ্য। অপরাপর আকর্ষণীয় রাজনীতিও আবির্ভূত হয়েছিল। সির-ওক্সাস বেসিনের উযবেকিস্তানে এক বিরাট মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর মরোক্কোয় গঠিত হয়েছিল শিয়া প্রাধান্য বিশিষ্ট আরেকটি রাজ্য। যদিও এই সময়ে মুসলিমরা মালয়ী আর্কিপলেগোর বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে চীনা, জাপানি, হিন্দু ও বুদ্ধ ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলিমরাই আধিপত্য বিস্তার করে।

সুতরাং বিজয়ের একটা পর্ব ছিল এটা। তিনটি প্রধান সাম্রাজ্যই যেন ইসলামের সাম্যবাদী ঐতিহ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলে মনে হয়েছে এবং তারা পরম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি দিক পরিচালিত হত আমলাতান্ত্রিক নির্ভুলতার সঙ্গে আর সাম্রাজ্যগুলো গড়ে তুলেছিল এক অসাধারণ প্রশাসন যন্ত্র। তারা সবাই মঙ্গোলদের সমর রাষ্ট্রের ধারণায় প্রভাবিত ছিল, তবে সাধারণ মানুষকেও তাদের রাজকীয় নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যাতে রাজবংশ তৃণ-মূল পর্যায়ে সমর্থন লাভ করতে পারে। কিন্তু একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে এই সাম্রাজ্যগুলো পুরনো আব্বাসীয় রাষ্ট্রের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আব্বাসীয় খলিফাহ্‌গণ এবং তাদের রাজদরবার কখনওই প্রকৃত অর্থে ইসলামী প্রতিষ্ঠান ছিল না। শরীয়াহ্ আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন না তাঁরা, নিজস্ব আলাদা জাগতিক নীতিমালা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন সাম্রাজ্যগুলোর শক্ত ইসলামী মুখীনতা ছিল, খোদ শাসকগণই যাকে উৎসাহিত করেছেন। সাফাভীয় ইরানে শিয়া মতবাদ

রাষ্ট্র-ধর্মে পরিণত হয়; মোঘুল নীতিমালায় ফালসাফাহ্ ও সুফিবাদের প্রবল প্রভাব ছিল; অন্যদিকে অটোমান সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে সম্পূর্ণও শরিয়াহ্ অনুযায়ী।

কিন্তু পুরনো সমস্যা রয়েই যায়। চরম অধিপতিকে যত ধার্মিক বলেই মনে হোক না কেন, এই ধরনের একনায়কতন্ত্র মৌলিকভাবে কুরানের চেতনা বিরোধী। অধিকাংশ লোক তখনও চরম দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস করত এবং কৃষিভিত্তিক সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনাচার-অবিচারের শিকার ছিল তারা। নতুন নতুন সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। মোঘুল ভারত এবং অটোমান সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র আনাতোলিয়া, এ দুই জায়গাতেই মুসলিমরা আপেক্ষিকভাবে নবাগত ছিল। উভয়েরই তাদের অমুসলিম প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি শেখার প্রয়োজন ছিল, যারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। শিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সুন্নী ও শিয়াদের মাঝে এক নতুন ও অনতিক্রম্য ভাঙন সৃষ্টি করে, জন্ম দেয় অসহিষ্ণুতা আর আক্রমণাত্মক সাম্প্রদায়িকতাবাদের যা ইসলামী জগতে ছিল নজীরবিহীন– একই সময়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের তিক্ত বিরোধের অনুরূপ। খোদ ইউরোপের চ্যালেঞ্জও ছিল, এতদিন পর্যন্ত মুসলিমদের চোখে যা ছিল পশ্চাদপদ এলাকা, আগ্রহ জাগানোর অনুপযুক্ত। ইউরোপ অবশ্য কৃষিভিত্তিক সমাজের সকল সমস্যা হতে মুক্ত সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সমাজ গঠন করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল মাত্র, যা শেষপর্যন্ত পাশ্চাত্যকে কেবল ইসলামী বিশ্বকে অতিক্রমই নয় বরং বশীভূত করায় সক্ষম করে তুলেছিল। নতুন ইউরোপ পেশীশক্তি পরখ করছিল কেবল, তবে ষোড়শ শতাব্দীতে তখনও প্রকৃত হুমকি হয়ে ওঠেনি। রাশানরা যখন মুসলিম কাযান ও অস্ত্রাখানে আক্রমণ চালিয়ে (১৫৫২-৫৬) সেখানে খ্রিষ্টধর্ম চাপিয়ে দেয়, উত্তর ইউরোপে নতুন বাণিজ্য পথ খোলার মাধ্যমে লাভবান হয়েছিল মুসলিমরা। ১৪৯২-তে যে ইবারীয় (Iberian) পর্যটকরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল, পৃথিবীর চারপাশে খুলে দিয়েছিল নতুন নতুন নৌপথ, পর্তুগিজ বণিকদের চলিষ্ণুতা বাড়িয়ে দেয় তারা। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লোহিত সাগরীয় এলাকায় নিও-ক্রুসেড পরিচালনার মাধ্যম তারা দক্ষিণ সাগরে মুসলিম বাণিজ্য ধ্বংস করার প্রয়াস পায়। পর্তুগিজদের এসব হামলা পাশ্চাত্যের কাছে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইসলামী জগতে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। ইরানে শিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারেই মুসলিমরা বেশী আগ্রহী ছিল, প্রাথমিক সাফাভীয়দের অসাধারণ সাফল্য সুন্নী প্রত্যাশার ওপর এক বিরাট আঘাত ছিল। কয়েক শতাব্দী সময়কালের মধ্যে প্রথমবারের মত ইসলামী রাজ্যের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে এক স্থিতিশীল, শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী শিয়া রাষ্ট্রের পত্তন ঘটেছিল।

সাফাভীয় সাম্রাজ্য

দ্বাদশবাদী শিয়া মতবাদ গ্রহণকারী আযেরবাইজানের সাফাভীয় সুফি ধারার অনুসারীরা কিছুদিন ধরেই জর্জিয়া ও ককেসাসের ক্রিশ্চান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে *ঘাযু* (*Ghazu*) হামলা চালিয়ে আসছিল, কিন্তু তারা মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিম ইরানের *আমির*দের ক্রোধেরও শিকার হয়েছিল। ১৫০০তে ষোল বছর বয়স্ক ইসমায়েল এই ব্যবস্থার *পির* পদে অধিষ্ঠিত হয়ে *আমির*দের হাতে নিহত পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস পান। ১৫০১-এ অভিযানের এক পর্যায়ে তাব্রিয অধিকার করেন ইসমায়েল এবং পরবর্তী এক দশক সময়কালে ইরানের বাকি অংশ অধিকার করে চলেন। তিনি দ্বাদশবাদী শিয়াবাদ তাঁর নতুন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম হবে বলে ঘোষণা দেন।

বিস্ময়কর পরিবর্তন ছিল এটা। এর আগ পর্যন্ত অধিকাংশ শিয়াই ছিল আরব। ইরানের রাঈ, কাশান, খুরাসান ও পুরনো গ্যারিসন শহর কুম-এ শিয়া কেন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু সিংহভাগ ইরানিই ছিল সুন্নী। তো ইরান থেকে সুন্নী মতবাদ নিশ্চিহ্ন করার কাজে নামেন ইসমায়েল: সুফি *তরিকাহ্* সমূহকে দমন করা হয়: *উলেমা*দের হত্যা করা হয় নয়ত পাঠানো হয় নির্বাসনে। প্রশাসনের সদস্যদের জন্যে প্রথম তিন *রাশিদুন*কে অভিশম্পাত দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে–যাঁরা বৈধভাবে আলীকে প্রদত্ত ক্ষমতা "জোর করে ছিনিয়ে" নিয়েছিলেন। অতীতে কখনও কোন শিয়া শাসক এমন ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্যাতনের এক নতুন ক্ষমতার যোগান দিচ্ছিল। পূর্ববর্তী দুশো বছর ধরে শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে একটা আঁতাত ছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে শিয়াবাদ ছিল গোপন অতীন্দ্রিয়বাদী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যারা গোপন ইমামের অনুপস্থিতিতে কোনও সরকার বৈধ হতে পারে না বিশ্বাস করে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। কীভাবে একটা "রাষ্ট্রীয় শিয়াবাদে"র অস্তিত্ব থাকতে পারে? কিন্তু শাহ্ ইসমায়েল এই যুক্তিতে টলেননি। সম্ভবতঃ দ্বাদশবাদী অর্থোডক্সি সম্পর্কে বেশী কিছু জানতেন না তিনি, কেননা তিনি *তরিকাহ্*সমূহের চরমপন্থী ঘুলুউ শিয়াবাদের লোক-গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, যারা বিশ্বাস করত মেসিয়ানিক কল্পরাজ্য সমাসন্ন। অনুসারীদের কাছে নিজেকে হয়ত গোপন ইমাম হিসাবেই তুলে ধরেছিলেন তিনি. শেষ জমানার যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে ফিরে এসেছেন। সুন্নী ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাঁর

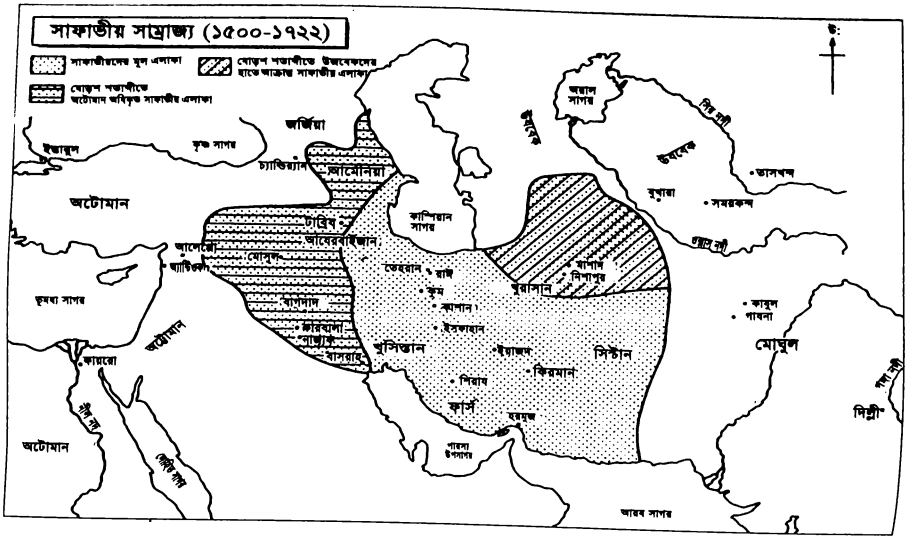

সাফাভীয় সাম্রাজ্য (১৫০০-১৭২২)
সাফাভীদের মূল এলাকা
ষোড়শ শতাব্দীতে উজবেকদের হাতে আক্রান্ত সাফাভীয় এলাকা
ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমান অধিকৃত সাফাভীয় এলাকা
উ:
জর্জিয়া
ইস্তাম্বুল
কৃষ্ণ সাগর
চ্যাল্ডিরান
আর্মেনিয়া
অটোমান
তাব্রিজ
আজেরবাইজান
আলেপ্পো
মোসুল
অ্যান্টিওক
ভূমধ্য সাগর
বাগদাদ
কারবালা
নাজাফ
বাসরাহ
অটোমান
কায়রো
নীল নদ
লোহিত সাগর
অটোমান
কাস্পিয়ান সাগর
তেহরান
রাই
কুম
কাশান
ইস্ফাহান
খুসিস্তান
ইয়াজদ
কিরমান
শিরাজ
ফার্স
হরমুজ
পারস্য উপসাগর
সিস্তান
খুরাসান
মাশাদ
নিশাপুর
উজবেক
আরাল সাগর
সির নদী
উজবেক
তাসখন্দ
বুখারা
সমরকন্দ
আমু নদী
কাবুল
গজনা
মোগুল
গঙ্গা নদী
দিল্লী
আরব সাগর

জিহাদ ইরানেই শেষ হয়নি। ১৫১০-এ তিনি সুন্নী উযবেকদের খুরাসান থেকে বিতাড়ন করেন এবং তাদের ওক্সাসের উত্তরে ঠেলে দেন; সুন্নী অটোমানদেরও আক্রমণ করেন তিনি, কিন্তু ১৫১৪-তে চ্যাল্ডিরানের যুদ্ধে সুলতান প্রথম সেলিমের কাছে পরাস্ত হন। আপন রাজ্যের বাইরে সুন্নীদের ধ্বংস করার তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়, কিন্তু ইরানের অভ্যন্তরে তাঁর আক্রমণ সফল হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অধিকাংশ ইরানি প্রবলভাবে শিয়া হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্তও তাই আছে।

শাহ্ ইসমায়েল এক সামরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের ওপর দারুণ আস্থা ছিল তাঁর, যারা প্রশাসন পরিচালনা করত। অতীতের স্যাসানীয় ও আব্বাসীয় সম্রাটদের মত শাহ্কে "পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া" হিসাবে অভিহিত করা হত; কিন্তু সাফাভীয় বৈধতার ভিত্তি ছিল ইসমায়েলের নিজেকে ইমামদের বংশধর হিসাবে দাবী। অবশ্য সাফাভীয়দের এটা উপলব্ধি করতে সময় লাগেনি যে প্রতিপক্ষদের মাঝে বিপ্লবী উদ্দীপনা জাগিয়ে দেয়া তাদের চরমপন্থী আদর্শ সরকারের আসীন হবার পর আর তেমন একটা কাজে আসবে না। শাহ্ প্রথম আব্বাস (১৫৮৮-১৬২৯) *ঘুলুউ* আদর্শে অনুপ্রাণিত আমলাদের বাদ দিয়ে জনগণকে দ্বাদশবাদী শিয়া মতবাদের অধিকতর অর্থোডক্স রূপ শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিদেশ থেকে আরব শিয়া *উলেমা*দের আমদানি করেন, তাদের জন্যে *মদ্রাসা* নির্মাণ করেন, মুক্ত হাতে আর্থিক সমর্থন দেন তাদের। আব্বাসের অধীনে সাম্রাজ্য এর তুঙ্গ অবস্থায় পৌছে যায়। অটোমানদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত বিজয় অর্জন করেন তিনি এবং তাঁর রাজধানী ইসফাহান এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করে, যা সম্প্রতি ইউরোপে সংঘটিত ইটালীয় রেনেসাঁর মত ওই অঞ্চলের পৌত্তলিক অতীত হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল; ইরানের বেলায় এর মানে ছিল প্রাক-ইসলাম যুগের পারসিয়ান সংস্কৃতি। এটা ছিল সেইসব মহান সাফাভীয় চিত্রশিল্পী বিহ্যাদ (Bihzad মৃত্যু: ১৫৩৫) এবং রিযা-ই-আব্বারি (Riza-i-Abbari, মৃত্যু : ১৬৩৫)-দের সময়, যাঁদের হাতে সৃষ্টি হয়েছিল আলোকোজ্জ্বল ও স্বপ্নীল নানা মিনিয়াত। ইসফাহান পরিণত হয়েছিল আকর্ষণীয় মসজিদ আর *মদ্রাসা*সহ পার্ক, প্রাসাদ আর বিশাল সব খোলা ময়দানের এক অনন্য সাধারণ নগরীতে।

অবশ্য অভিবাসী নতুন *উলেমা*গণ পড়েছিলেন এক অদ্ভুত অবস্থায়। প্রাইভেট গ্রুপ হিসাবে তাঁরা কখনও নিজস্ব শিয়া *মদ্রাসা* পাননি, বরং গবেষণা ও আলোচনার জন্যে পরস্পরের বাড়িতে মিলিত হতেন। নীতিগতভাবে তাঁরা সবসময় সরকারের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন; কিন্তু এবার তাঁদের ইরানের শিক্ষা ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিল, কাঁধে চাপল সরকারের অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রমও। শাহ্ তাদের উদার হাতে উপহার আর মঞ্জুরী দান করেন যার কল্যাণে আর্থিক দিক দিয়ে শেষমেষ স্বাধীন হয়ে যান তাঁরা। ধর্ম বিশ্বাসকে তুলে ধরার এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না বলে ভাবলেন তাঁরা, কিন্তু তখনও রাষ্ট্র সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, সরকারী পদপদবী প্রত্যাখ্যান

করেছেন, প্রজ্ঞা হিসাবে পরিগণিত হতে চাননি। তাদের অবস্থান ছিল সম্ভাবনাময়ভাবে শক্তিশালী। দ্বাদশবাদী অর্থোডক্সি অনুযায়ী শাহ্‌গণ নন, বরং *উলেমাগণই* গোপন ইমামের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাফাভীয়রা *উলেমাদের* সামাল দিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, সমগ্র ইরানবাসী শিয়া মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা পুরোপুরিভাবে নিজেদের অবস্থানের ফায়দা ওঠাতে পারেননি। কিন্তু তাঁদের নতুন ক্ষমতার মানে ছিল দ্বাদশবাদী শিয়া মতবাদের আকর্ষণীয় কিছু বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে যাওয়া। নিজেদের গভীর অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যাখ্যা অনুসরণ করার পরিবর্তে তাঁদের কেউ কেউ বরং অক্ষরমুখী হয়ে উঠেছিলেন। মুহাম্মদ বাকির মজলিসি (মৃত্যু: ১৭০০) সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ *উলেমায়* পরিণত হয়েছেন, কিন্তু এক নতুন শিয়া গোঁড়ামি প্রদর্শন করে গেছেন তিনি। *উলেমাদের* কেবল *ফিক্‌হ'র* ওপরই জোর দিতে হবে। মজলিসি ইরানি শিয়াবাদের অতীন্দ্রিয়বাদ ও দর্শনের প্রতি এমন এক অনাস্থা যোগ করেন, যা আজও টিকে আছে।

সমবেত *জিকর* এবং সুফি সাধকদের কাল্ট-এর মত পুরোনো সুফি ভক্তিবাদের স্থান দখল করার জন্যে মজলিসি জনগণকে শিয়া মূল্যবোধ ও ধার্মিকতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কারবালায় শাহাদাৎবরণকারী হুসেইনের সম্মানে পালিত আচার অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেন। সুবিশাল মিছিল আর আবেগময় শোকসঙ্গীত গাওয়া হত, মানুষ বিলাপ আর কান্নায় মত্ত হত তখন। এসব আচার ইরানের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কারবালার করুণ ঘটনা তুলে ধরা আবেগময় নাটক *'তাজিয়াহ্‌'র* প্রচলন ঘটে যেখানে জনগণ আর নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নয়, বরং আবেগময় সাড়া প্রদান করে তারা বুক চাপড়ে কাঁদে, ইমাম হুসেইনের দুর্ভোগের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তোলে। এইসব আচার এক গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা কবচের কাজ করেছে। যখন তারা কাঁদে, কপাল চাপড়ায়, বেসামাল হয়ে কাঁদে, নিজেদের মাঝে শিয়া ধর্মানুরাগের মূল আকাঙ্ক্ষা ন্যায়-বিচারের প্রসঙ্গ জাগিয়ে তোলে দর্শকরা, নিজেদের প্রশ্ন করে *কেন* সব সময়ই ভালো মানুষেরাই দুর্ভোগের শিকার বলে মনে হয় আর খারাপ বা অশুভ কেন টিকে থাকে। কিন্তু মজলিসি এবং শাহ্‌গণ এই আচার অনুষ্ঠানের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে যত্নের সঙ্গে চাপা দিয়েছেন। আপন গৃহে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হওয়ার বদলে জনগণকে সুন্নী ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে হুসেইনকে অনুসরণ করার শপথ গ্রহণের পরিবর্তে মানুষকে বলা হয়েছে তাঁকে একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দেখার জন্যে যিনি তাদের স্বর্গলাভ নিশ্চিত করতে পারবেন। আনুষ্ঠানিকতাকে এভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উপায় বানানো হয়েছিল। জনগণকে তাগিদ দেয়া হয়েছে ক্ষমতাবানদের তোষামোদ আর কেবল নিজেদের স্বার্থের কথা ভাববার। ইরানি বিপ্লব (১৯৭৮-৭৯) অনুষ্ঠিত হবার আগে আর কাল্ট দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত জনগণের ক্ষোভ প্রকাশের উপায় হতে পারেনি।

কিন্তু *উলেমা*দের কেউ কেউ পুরনো শিয়া ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গিয়েছিলেন; তাদের ধ্যান-ধারণা বর্তমান কালেও, কেবল ইরানে নয়, বরং গোটা বিশ্বের সংস্কারক ও বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা জোগায়। মির দিমাদ (মৃত্যু: ১৬৩১) এবং তাঁর শিষ্য মোল্লা সদরা (মৃত্যু: ১৬৪০) ইসফাহানে অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের এক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মজলিসি এর দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছেন। দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাকে একত্রিত করার সুহ্‌রাওয়ার্দির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন তাঁরা; অনুসারীদের অতীন্দ্রিয়বাদী অনুশীলন শিক্ষা দিয়েছেন যাতে করে তারা *আলম আল-মিথাল* এবং আধ্যাত্মিক জগতের অনুভূতি লাভে সফল হয়ে উঠতে পারে। দু'জনই জোর দিয়ে বলেছেন যে, একজন দার্শনিককে অবশ্য অবশ্য অ্যারিস্টটলের মত যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার অনুসারী হতে হবে, কিন্তু তাকে আবার সত্য আবিষ্কারে কল্পনানির্ভর, সজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে তুলতে হবে। *উলেমা*দের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার ব্যাপারে দু'জনই দারুণ বিরূপ ছিলেন, একে তাঁরা ধর্মের বিকৃতি হিসাবে দেখেছেন। শক্তির দ্বারা সত্য আরোপ করা যায় না এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমরূপতাবাদ (Intellectual Conformism) প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বেমানান। মোল্লা সদরা রাজনৈতিক সংস্কারকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হিসাবেই দেখেছেন। তাঁর প্রধান রচনা *আল-আফসান আল-আরবাহ্* (*দ্য ফোরফোল্ড জার্নি- The fourfold Journey*)-তে তিনি জাগতিক পৃথিবীকে পরিবর্তনের প্রয়াস নেয়ার আগে একজন নেতার যেসব অতীন্দ্রিয়বাদী প্রশিক্ষণ নেয়া আবশ্যক সেসবের বর্ণনা দিয়েছেন। সবার আগে তাঁকে অবশ্যই অহমবোধ *ঝেড়ে* ফেলতে হবে, স্বর্গীয় আলোক গ্রহণ করতে হবে আর অর্জন করতে হবে ঈশ্বরর অতীন্দ্রিয় বোধ। এই পথে তাঁরা শিয়া *ইমামদের* মত, যদিও একই মাত্রার নয়, একই রকম আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারবে। আয়াতোল্লাহ্ খোমিনি (১৯০২-৮৯) মোল্লা সদরার শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং পরলোকগমনের আগে জাতির উদ্দেশে দেয়া শেষ ভাষণে তিনি জনগণকে *ইরফানের* গবেষণা ও অনুশীলন অব্যাহত রাখার আবেদন জানিয়েছেন, কেননা আধ্যাত্মিক সংস্কার ছাড়া প্রকৃত অর্থে কোনও ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না।

ইরানের *উলেমা*দের মাঝে ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকা একেবারে নতুন এক ধারণার কারণে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন মোল্লা সদরা, আমাদের বর্তমান কালেও যার চরম রাজনৈতিক পরিণাম রয়ে গেছে। নিজেদের উসুলি বলে দাবীকারী একটা দল বিশ্বাস করত যে সাধারণ মুসলিমরা নিজেরা ধর্মবিশ্বাসের মৌল নীতিমালা (*উসুল*) ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তাদের উচিত জ্ঞানী শিক্ষিত *উলেমার* সন্ধান করা এবং তাঁর আইনি বিধান অনুসরণ করা, যেহেতু একমাত্র তারাই গোপন ইমামের কর্তৃত্ব ধারণ করেন। শিয়া *উলেমা*গণ কখনওই সুন্নীদের মত "*ইজতিহাদের* দ্বার" রুদ্ধ করতে রাজি হননি; প্রকৃতপক্ষে, নেতৃস্থানীয় জুরিস্টকে তারা *মুজতাহিদ* বলে অভিহিত করতেন। *মুজতাহিদ*– যিনি ইসলামী আইন

প্রণয়নের ক্ষেত্রে "স্বাধীন বিচার বুদ্ধি" প্রয়োগের অধিকার লাভ করেছেন। *উসুলিদের* শিক্ষা ছিল, এমনকি শাহ্‌কেও *মুজতাহিদ* প্রদত্ত *ফাতওয়াহ্‌* মানতে হবে, যাঁকে তিনি মন্ত্রণাদাতা হিসাবে মনোনীত করেছেন, কেননা তাঁর আইনি পরামর্শ শাহ্‌র প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীতে উসুলিরা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করতে পারেনি, কিন্তু শতাব্দীর শেষ নাগাদ, যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে সাফাভীয় সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছে, তাদের অবস্থান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের দুর্বলতার পরিপূরক হিসাবে একটা শক্তিশালী আইনি কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

সাম্রাজ্য ইতিমধ্যে যে কোনও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভাগ্যই বরণ করে নিয়েছিল, নিজের দায়িত্ব পালন করে উঠতে পারছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল, বিরাজ করছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা আর শেষ দিকের শাহ্‌রা ছিলেন অনুপযুক্ত। ১৭২২-এ যখন আফগান গোত্রগুলো ইসফাহানে হামলা চালায়, অপমানজনকভাবে আত্মসমর্পণ করে নগরী। এক সাফাভীয় যুবরাজ হত্যাযজ্ঞ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মেধাবী অথচ নিষ্ঠুর কমান্ডার নাদির খানের সহায়তায় হানাদারদের বিতাড়িত করেন। বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে নাদির খান, যিনি সাফাভীয় সহকর্মীকে বাদ দিয়ে নিজেকে শাহ্‌ ঘোষণা করেছিলেন, ইরানকে আবার একত্রিত করেন এবং উল্লেখ্যযোগ্য সামরিক বিজয় অর্জন করেন। কিন্তু নির্দয় নিষ্ঠুর মানুষ ছিলেন তিনি এবং ১৭৪৮-এ আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। এই সময়কালে দুটো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ইরানের *উলেমাদের* এমন এক নজীরবিহীন ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে মুসলিম বিশ্বে যা আর কখনও দেখা যায়নি। প্রথমত: নাদির খান যখন অসফলভাবে ইরানে সুন্নী ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, নেতৃস্থানীয় *উলেমাগণ* তখন সাম্রাজ্য ত্যাগ করে নাজাফ ও কারবালা এ দুই পবিত্র শিয়া নগরীতে গিয়ে ওঠেন (যথাক্রমে আলী ও হুসেইনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত)। গোড়াতে একে এক বিপর্যয় বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু অটোমান ইরাকের অন্তর্গত নাজাফ ও কারবালায় একটা ভিত্তি পেয়েছিলেন তাঁরা। যেখান থেকে তাঁরা ইরানের জাগতিক শাসকের নাগালের বাইরে থেকে জনগণকে নির্দেশনা দিতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, নাদির খানের মৃত্যুর পরবর্তী অন্তর্বর্তী সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে, ইরানে যখন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বলে কিছুই নেই, *উলেমাগণ* ক্ষমতার শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসেন– ১৭৭৯-এ তুরকোমান কাজার গোত্রের আকা মুহাম্মদ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে কাজার বংশ প্রতিষ্ঠা করার পর আবার সেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উসুলিদের অবস্থান অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দেখায়, যে *উলেমাগণ* যেকোনও শাহ্‌র চেয়ে কার্যকরভাবে ইরানি জনগণের ভক্তি আর আনুগত্য আদায় করতে পেরেছিলেন।

মোঘুল সাম্রাজ্য

সুন্নী ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত শাহ্ ইসমায়েলের শিয়া *জিহাদের* ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা ভারতে নতুন মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে অংশতঃ দায়ী ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা বাবুর (মৃত্যুঃ ১৫৩০) ইসমায়েলের মিত্র ছিলেন। সাফাভীয় এবং উযবেকদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের সময় তিনি শরণার্থী হিসাবে আফগান পার্বত্য অঞ্চলের কাবুলে পালিয়ে যান, সেখানে টিমুর লেঙ্ক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অবশিষ্টাংশের নিয়ন্ত্রণভার নিজ হাতে তুলে নেন। এরপর উত্তর ভারতে ক্ষমতার একটা ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হন তিনি, টিমুরের পছন্দ মঙ্গোল কৌশলে অঞ্চলটি পরিচালনার প্রয়াস পান। তাঁর রাজ্যটি টেকেনি এবং ১৫৫৫ অবধি আফগান *আমির*দের মাঝে উপদলীয় সংঘাত বজায় থাকে, তখন বাবুরের সবচেয়ে সক্ষম বংশধর হুমায়ুন সিংহাসন দখল করে নেন এবং যদিও এর পরপরই মৃত্যু ঘটেছিল তাঁর, একজন নির্ভরযোগ্য রিজেন্ট ১৫৬০-এ হুমায়ুনের পুত্র আকবর (১৫৪২-১৬০৫) সাবলকত্ব লাভের আগ পর্যন্ত "মঙ্গোল" (বা "মোঘুল") ক্ষমতা অটুট রাখেন। উত্তর ভারতে একটি সংহত রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন আকবর, এখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি। সরাসরি সুলতানের অধীনে এক সেনাবাহিনীর আদলে মঙ্গোলদের অনুসরণে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা কৌশল ধরে রেখেছিলেন তিনি। দক্ষ আমলাতন্ত্র গড়ে তোলেন তিনি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে অন্য মুসলিম শাসকদের সর্বনাশ করে তাঁর মোঘুল সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটাতে শুরু করেন, যতক্ষণ না হিন্দুস্তান, পাঞ্জাব, মালভা এবং দক্ষিণাত্য তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

অবশ্য ইসমায়েলের বিপরীতে আকবর প্রজাদের দমন বা তাদের ওপর নির্যাতন চালাননি, কিংবা তাদের আপন ধর্ম বিশ্বাসে দীক্ষা দেয়ার প্রয়াসও পাননি। যদি তা করতেন, তাঁর সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারত না। মুসলিমরা এমন এক দেশে সংখ্যালঘু শাসক ছিল সেখানে কখনও ধর্মীয় একরূপতা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলেনি। প্রত্যেক হিন্দুবর্গের নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছিল এবং বুদ্ধ, জ্যাকবাইট, ইহুদি, জৈন, ক্রিশ্চান, যরোস্ট্রিয়, সুন্নী মুসলিম এবং ইসমায়েলিরা কোনও রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই উপাসনা করার অনুমতি পেয়ে আসছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সকল বর্গের হিন্দু, এবং এমনকি কিছু সংখ্যক মুসলিমও একেশ্বরবাদের এক আধ্যাত্মবাদী ধ্যানধর্মী ধরন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছিল,

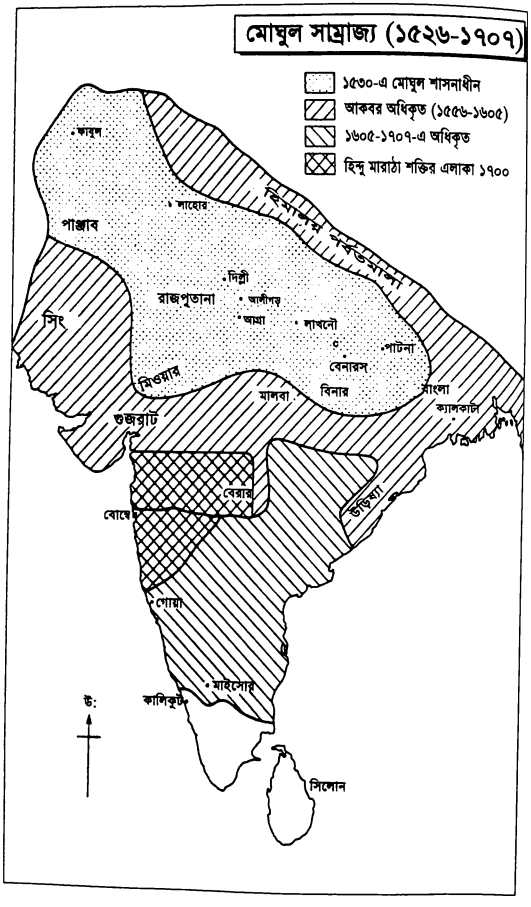

মোঘুল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৭০৭)
১৫৩০-এ মোঘুল শাসনাধীন
আকবর অধিকৃত (১৫৫৬-১৬০৫)
১৬০৫-১৭০৭-এ অধিকৃত
হিন্দু মারাঠা শক্তির এলাকা ১৭০০
কাবুল
লাহোর
পাঞ্জাব
হিমালয় পর্বতমালা
দিল্লী
রাজপুতানা
আলীগড়
আগ্রা
লাখনৌ
পাটনা
বেনারস
সিং
মিওয়ার
গুজরাট
মালবা
বিনার
বাংলা
ক্যালকাটা
বেরার
বোম্বে
উড়িষ্যা
গোয়া
মাইসোর
কালিকুট
উ:
সিলোন

যেখানে সবরকম সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতাকে ত্যাগ করা হয়। গুরু নানক (মৃত্যু: ১৪৬৯) প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্ম এইসব গোষ্ঠী হতে গড়ে উঠেছিল, এখানে হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের ঐক্য ও সংহতির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অবশ্য আক্রমণাত্মক বিরোধিতার একটা সম্ভাবনা সবসময়ই ছিল। ভারতে বিশ্বজনীনতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কোনও অসহিষ্ণু নীতি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলসুর বিরোধী হয়ে দাঁড়াত। মুসলিম শাসকগণ এটা আগে থেকেই জানতেন, সেজন্য তাঁরা সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনে হিন্দুদের নিয়োগ দিয়েছেন। আকবর এই ঐতিহ্যকে আরও জোরদার করে তোলেন। তিনি *জিম্মি*দের ক্ষেত্রে শরিয়াহ্ কর্তৃক জারি করা *জিযিয়াহ্* কর বাতিল করে দেন, হিন্দু অনুভূতিকে আঘাত না করার জন্যে নিরামিষ-ভোজীতে পরিণত হন এবং শিকারে ইস্তফা দেন (এ ক্রীড়াটি দারুণ উপভোগ্য ছিল তাঁর)। আকবর সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন। হিন্দুদের জন্যে মন্দির নির্মাণ করেছেন তিনি। ১৫৭৫-এ তিনি এক "উপাসনা গৃহ" স্থাপন করেছিলেন যেখানে সকল ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আলোচনার উদ্দেশ্যে মিলিত হতে পারতেন। "স্বর্গীয় একেশ্বরবাদের" (devine monotheism *তাওহীদ-ই ইলাহী*) প্রতি নিবেদিত নিজস্ব সুফি মতবাদও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, যা কুরানের একজন মাত্র ঈশ্বর সঠিকভাবে পরিচালিত যেকোনও ধর্মে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

যদিও নিঃসন্দেহে এটা কুরানের চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, কিন্তু আকবরের বহুত্ববাদ (Pluralism) কোনও কোনও শরিয়াহ্ গোষ্ঠীর মাঝে গড়ে ওঠা কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের একেবারে বিপরীত ছিল এবং সাম্প্রতিক শিয়া/সুন্নী বিরোধের গোঁড়ামির তুলনায় কয়েক আলোকবর্ষ দূরবর্তী। কিন্তু অন্য যেকোনও নীতি ভারতে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াত। রাজত্বের গোড়ার দিকে *উলেমা*দের প্রশ্রয় দিয়েছেন আকবর, কিন্তু তিনি কখনওই শরিয়াহ্র ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব ঝোঁক ছিল সুফিবাদ ও ফালসাফাহ্র দিকে, এ দুটোই ঝুঁকে ছিল এক বিশ্বজনীন দর্শনের প্রতি। ফায়লাসুফদের বর্ণিত আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আকবর। তাঁর জীবনীকার সুফি ঐতিহাসিক আবদুলফযল আল্লামি (১৫৫১-১৬০২) আকবরকে একজন আদর্শ দার্শনিক-রাজা হিসাবে দেখেছেন। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে তিনি (আকবর) ছিলেন আদর্শ মানুষ (Perfect Man), সুফিদের ধারণানুযায়ী *উম্মাহ্*কে ঐশী নির্দেশনা দেয়ার জন্য যিনি প্রতি প্রজন্মের মাঝে অবস্থান করেন। আকবর এমন এক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা, যুক্তি দেখিয়েছেন আল্লামি, মানুষকে এমন এক উদার চেতনাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করত যার ফলে বিবাদ-বিসম্বাদ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। এই নীতি সুফি আদর্শ *সুহল-ই কুল* ("বিশ্বজনীন শান্তি") প্রকাশ করে, এটা *মাহব্বাত-ই কুল*, "বিশ্বজনীন ভালোবাসার" সূচনা মাত্র, মানবজাতির জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সন্ধান করবে যা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গোঁড়ামি অর্থহীন; আকবরের মত আদর্শ ফায়লাসুফ রাজা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে।

মুসলিমদের কেউ কেউ অবশ্য আকবরের ধর্মীয় বহুত্ববাদে আক্রান্ত বোধ করেছে। আহ্‌মাদ সিরহিন্দি (মৃত্যু: ১৬২৫), যিনি নিজেও সুফি ছিলেন, মনে করেছেন বিশ্বজনীনতা (যার জন্যে ইবন আল-আরাবিকে দায়ী করেন তিনি) বিপজ্জনক। সিরহিন্দি ঘোষণা করেন যে, আকবর নন, বরং তিনিই যুগের আদর্শ মানব (Perfect Man)। একমাত্র তখনই ঈশ্বরের নৈকট্য পাওয়া যাবে মানুষ যখন নির্বেদিতভাবে শরিয়াহ্‌র আইন মেনে চলবে, এই পর্যায়ে যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আরও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছিল। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতের স্বল্প সংখ্যকে মুসলিমই সিরহিন্দির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন জুগিয়েছিল। আকবরের পৌত্র শাহ্ জিহান, যিনি ১৬২৭ থেকে ১৬৫৮ পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেছেন, আকবরের নীতি বজায় রাখেন। তাঁর তাজমহল হিন্দুদের স্থাপত্য কৌশলের সঙ্গে মুসলিমদের স্থাপত্য কলার মিশ্রণের পিতামহের ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছে। রাজদরবারে তিনি হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন আর মুসলিম বৈজ্ঞানিক রচনাবলী সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু সুফিবাদের প্রতি বৈরী ছিলেন শাহ্ জিহান, তাঁর ধর্মানুরাগ আকবরের তুলনায় অনেক বেশী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ছিল।

তিনি এক ক্রান্তিকালীন চরিত্র হিসাবে প্রমাণিত হয়েছেন। শতাব্দীর শেষ দিকে এসে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মোঘুল সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়েছে। সেনাবাহিনী এবং দরবার দুটোই অতিমাত্রায় ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছিল; সম্রাটগণ তখনও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছিলেন, কিন্তু কৃষির প্রতি প্রয়োজনীয় নজর দেননি, যার ওপর তাঁদের সম্পদ নির্ভরশীল ছিল। আউরেঙজিবের শাসনামলে (১৬৫৮-১৭০৭) অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে। তাঁর বিশ্বাস ছিল মুসলিম সমাজের বৃহত্তর শৃঙ্খলার মাঝে সমাধান নিহিত। মুসলিম "ভিন্ন মতাবলম্বী"দের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও ভয়ঙ্কর ঘৃণাবোধের মাঝে তাঁর নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। সিরহিন্দির মত মুসলিম, যাঁরা পুরনো ধর্মীয় বহুত্ববাদে অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে সাম্প্রদায়িক নীতির পক্ষে সমর্থন পান তিনি। ভারতে হুসেইনের সম্মানে শিয়াদের উৎসব উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, আইন করে সুরাপান নিষিদ্ধ করা হয় (যা হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা কঠিন করে তোলে) এবং হিন্দু অনুষ্ঠানাদিতে সম্রাটের অংশগ্রহণের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস করা হয়। *জিযিয়াহ্* পুনর্বহাল করা হয় এবং হিন্দু বণিকদের ওপর দ্বিগুণ হয়ে যায় করের হার। সবচেয়ে মারাত্মক, সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করা হয়। প্রতিক্রিয়া দেখায় যে পূর্ববর্তী সহিষ্ণুতা কত প্রাজ্ঞ ছিল। হিন্দুগোত্রপ্রধান আর শিখদের নেতৃত্বে মারাত্মক বিদ্রোহ পরিচালিত হয়, শিখরা পাঞ্জাবে নিজস্ব স্বদেশের জন্যে আন্দোলন শুরু করে। আউরেঙজিবের পরলোকগমনের পর টালমাতাল অবস্থায় পড়ে সাম্রাজ্য এবং আর কখনও সামলে উঠতে পারেনি। উত্তরাধিকারীগণ তাঁর সাম্প্রদায়িক নীতি পরিহার করেন, কিন্তু ক্ষতি যা হবার আগেই হয়ে গিয়েছিল। এমনকি মুসলিমরা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে

পড়েছিল, শরিয়াহ্‌র প্রতি আউরেঙজিবের উৎসাহে প্রকৃতপক্ষে ইসলামী কিছু ছিল না; শরিয়াহ্ সবার জন্যে ন্যায়বিচারের কথা বলে–*জিম্মিরা* সহ। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল এবং স্থানীয় মুসলিম কর্মকর্তারা স্বায়ত্তশাসিত একক হিসাবে যার যার এলাকা নিয়ন্ত্রণ শুরু করে।

অবশ্য ১৭৩৯ পর্যন্ত মোঘলরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজদরবারে হিন্দু ও মুসলিমদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, পরস্পরের ভাষায় কথা বলতে শেখে তারা এবং ইউরোপ থেকে আসা বইপত্র একসঙ্গে পাঠ ও অনুবাদ করে। কিন্তু শিখ ও পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দু গোত্রপতিরা শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখে এবং উত্তর-পশ্চিমে ইরানের সাফাভীয় সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনা আফগান গোত্রগুলো ভারতে একটা মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। ভারতীয় মুসলিমরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করে; তাদের সমস্যাদি আধুনিক কালের মুসলিমদের সামনে এসে দাঁড়ানো বহু অসুবিধা ও বিতর্কের পূর্বাভাস হিসাবে কাজ করেছে। তারা অনুভব করতে শুরু করে যে এমন এক দেশের বিচ্ছিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তারা যেটি অটোমান সাম্রাজ্যের আনাতোলিয় কেন্দ্রভূমির সীমান্তবর্তী এলাকা নয়; বরং সভ্য জগতের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। কেবল হিন্দু এবং শিখদের মোকাবিলা করছে না তারা, ব্রিটিশরাও শক্তিশালী বাণিজ্যিক অস্তিত্ব গড়ে তুলছে, যা উপমহাদেশে ক্রমবর্ধমানহারে রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছিল। প্রথমবারের মত মুসলিমরা শয়তান কর্তৃক শাসিত হবার আশঙ্কার মুখোমুখি হল। ইসলামী ধার্মিকতার ক্ষেত্রে *উম্মাহ্‌র* গুরুত্বের বিচারে এটা ছিল গভীর উদ্বেগজনক। কেবল রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল না এটা, বরং তাদের অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশ স্পর্শ করেছিল। ভারতে মুসলিমদের জীবনে এক নয়া নিরাপত্তাহীনতার বোধ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম কী তবে স্রেফ আরেকটি হিন্দু বর্ণ হয়ে দাঁড়াবে? মুসলিমরা কী তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলবে এবং ইসলামের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে আলাদা ভিন্নদেশী সংস্কৃতির তোড়ে ভেসে যাবে? তবে কী শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ চ্যুত হয়েছে তারা?

সুফি চিন্তাবিদ শাহ্ ওয়ালি-উল্লাহ্ (১৭০৩-৬২) বিশ্বাস করতেন, সমাধান নিহিত রয়েছে সিরহিন্দির প্রস্তাবনায় এবং তাঁর মতামত ভারতের মুসলিমদের ওপর একেবারে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। নতুন সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিকে মুসলিমরা যখন তাদের ক্ষমতা বিশ্বের অন্য অংশে চলে যাচ্ছে ভেবে ইসলামের টিকে থাকার প্রশ্নে একই রকম শঙ্কা অনুভব করছিল, দার্শনিক ও সংস্কারকগণও সমরূপ উপসংহার পৌঁছেছেন। প্রথমতঃ মুসলিমদের অবশ্যই গোত্রীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রণাঙ্গনে দাঁড়াতে হবে। উপমহাদেশের বিশেষ পরিস্থিতির দাবী মেটাতে শরিয়াহ্‌কে অবশ্যই পরিমার্জনা করতে হবে এবং হিন্দুকরণ প্রতিরোধের উপায়ে পরিণত হতে হবে একে। সামরিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখা

মুসলিমদের জন্যে অত্যাবশ্যক। শাহ্ ওয়ালি-উল্লাহ্ এত বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি এমনকি মুসলিম শক্তির পুনর্জাগরণের স্বার্থে ধ্বংসাত্মক আফগান প্রয়াসেও সমর্থন দিয়েছিলেন। মুসলিমদের চিন্তা জগতে একটা আত্মরক্ষামূলক চাপ যোগ হয়েছিল এবং তা আধুনিক যুগের মুসলিমদের ধার্মিকতার একটা বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে।

অটোমান সাম্রাজ্য

১৪৫৩তে অটোমানরা যখন কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে নেয় (যা এখন ইসতাম্বুল নামে পরিচিত), একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মত অবস্থানে পৌঁছে যায় তারা; আস্তে আস্তে সাম্রাজ্যটি গড়ে উঠতে পেরেছিল বলে অন্যান্য সাম্রাজ্যের তুলনায় এর ভিত্তি ছিল অনেক দৃঢ়, ফলে তা সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত এবং স্থায়ী হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ের অটোমান গোত্রপতিরা আর পাঁচজন *গাজী* শাসকদের মতই ছিলেন, কিন্তু ইস্তাম্বুলে সুলতানগণ বাইযানটাইনদের আদলে রাজদরবারের ব্যাপক আনুষ্ঠানিকতা বিশিষ্ট এক চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য রাষ্ট্রের কাঠামোর ভিত্তি ছিল প্রধানত পুরনো মঙ্গোল আদর্শ, সুলতানের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন বিশাল সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীয়ক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করা হত। মেহমেদ, দ্য কনকোয়েরার-এর ক্ষমতার ভিত্তি ছিল বলকান অভিজাত গোষ্ঠীর সমর্থন– যাদের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল; আর পদাতিক বাহিনী–"নয়া সেনাদল" (ইয়েনি চেরি-*yeni cheri*)– গানপাউডার আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। বহিরাগত হিসাবে ধর্মান্তরিত ক্রীতদাস জোনিসারিদের জমিজমার প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না, ফলে তারা সুলতানদের নিরেট প্রতিরক্ষা বুহ্য হিসাবে এক স্বাধীন বাহিনীতে পরিণত হয়। অটোমানরা তাদের পুরনো আদর্শের বৈশিষ্ট্যও বজায় রেখেছিল: নিজেদের তারা ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে *জিহাদে* নিবেদিত এক সীমান্ত রাজ্যের কর্মী দল হিসাবে দেখেছে। পশ্চিমে তাদের সামনে ছিল ক্রিশ্চান জগৎ আর পুবে শিয়া সাফাভীয়রা। অটোমানরাও সাফাভীয়দের মত তীব্র সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে, অটোমান সাম্রাজ্যে বসবাসরত শিয়াদের বিরুদ্ধে গণহত্যার ঘটনা ঘটে।

জিহাদ ছিল বিস্ময়করভাবে সফল। সাফাভীয়দের বিরুদ্ধে প্রথম সেলিমের (১৪৬৭-১৫২০) অভিযান যা ইরানি অগ্রযাত্রাকে থমকে দিয়েছিল –এক বিজয়মণ্ডিত যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয় যার ফলে সমগ্র সিরিয়া এবং মিশর অটোমান শাসনের আওতায় চলে আসে। আরব এবং উত্তর আফ্রিকা সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমে, অটোমান সেনাবাহিনী ইউরোপ অধিকার অব্যাহত রাখে এবং ১৫৩০-এ পৌঁছে যায় ভিয়েনার দোরগোড়ায়। সুলতানগণ অসাধারণ আমলাতান্ত্রিক দক্ষতার সঙ্গে এমন এক সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেছেন, এ সময়ের আর কোনও

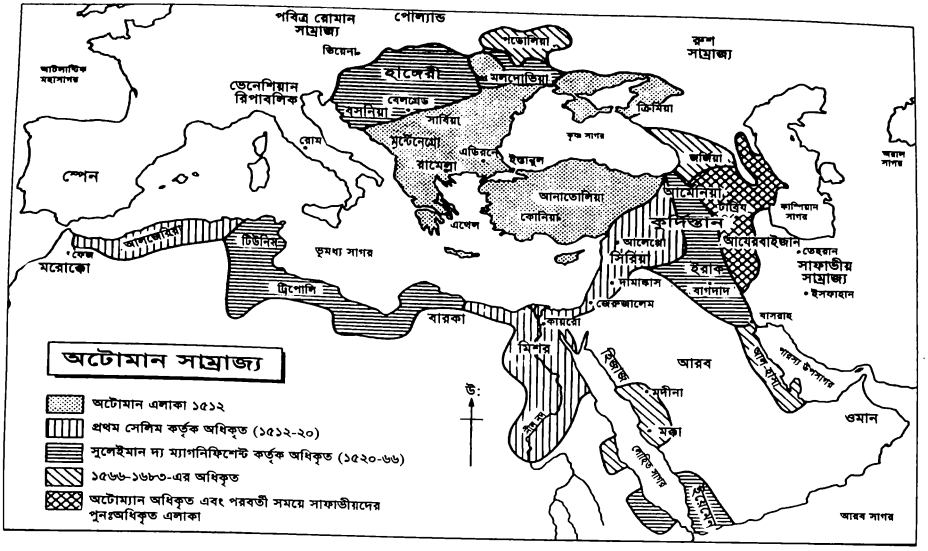

অটোমান সাম্রাজ্য
অটোমান এলাকা ১৫১২
প্রথম সেলিম কর্তৃক অধিকৃত (১৫১২-২০)
সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট কর্তৃক অধিকৃত (১৫২০-৬৬)
১৫৬৬-১৬৮৩-এর অধিকৃত
অটোম্যান অধিকৃত এবং পরবর্তী সময়ে সাফাভীয়দের পুনঃঅধিকৃত এলাকা
পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য
পোল্যান্ড
রুশ সাম্রাজ্য
ভিয়েনা
আটলান্টিক মহাসাগর
ভেনেশিয়ান রিপাবলিক
হাঙ্গেরী
মলদোভিয়া
পডোলিয়া
বেলগ্রেড
বসনিয়া
সার্বিয়া
ক্রিমিয়া
রোম
মন্টেনেগ্রো
রামেলিয়া
এডিরনে
ইস্তাম্বুল
কৃষ্ণ সাগর
জর্জিয়া
স্পেন
আনাতোলিয়া
আর্মেনিয়া
তাব্রিজ
কাস্পিয়ান সাগর
আরাল সাগর
কোনিয়া
কুর্দিস্তান
এথেন্স
আলজেরিয়া
টিউনিস
আলেপ্পো
আযেরবাইজান
তেহরান
ফেজ
মরোক্কো
ভূমধ্য সাগর
সিরিয়া
ইরাক
সাফাভীয় সাম্রাজ্য
ত্রিপোলি
দামাস্কাস
বাগদাদ
ইসফাহান
জেরুজালেম
বারকা
কায়রো
বাসরাহ
মিশর
হিজাজ
আরব
পারস্য উপসাগর
উ:
মদীনা
মক্কা
ওমান
লোহিত সাগর
ইয়েমেন
আরব সাগর

রাষ্ট্র এর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনি। সুলতান তাঁর প্রজাদের ওপর একরূপতা চাপিয়ে দেননি বা সাম্রাজ্যের অসদৃশ উপাদানসমূহকে একটা বিরাট দলে টানতে চাননি। সরকার কেবল এমন একটা কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে যা বিভিন্ন গ্রুপকে –ক্রিশ্চান, ইহুদি, আরব, তুর্কী, বারবার বণিক, *উলেমা*, *তরিকাহ্* আর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী– শান্তিময় পরিবেশে বসবাস সক্ষম করে তুলেছিল, প্রত্যেকে যার যার অবদান রেখেছে, নিজ নিজ বিশ্বাস আর রীতি পালন করেছে। এভাবে সাম্রাজ্যে ছিল বিছিন্ন গোষ্ঠীর এক মিশেল, যার প্রতিটি এর সদস্যদের প্রত্যক্ষ বিশ্বস্ততা দাবী করত। একজন গভর্নর (*পাশা*) কর্তৃক শাসিত, দুটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল সাম্রাজ্য, যিনি সরাসরি ইস্তাম্বুলের কাছে জবাবদিহি করতেন।

সুলেইমান আল-কানুনির ("দ্য ল-গিভার") (১৫২০-৬৬) শাসনামলে সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। পাশ্চাত্যে ইনি সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট নামে খ্যাত। তাঁর শাসনাধীনে সাম্রাজ্য এর সম্প্রসারণের সর্বশেষ সীমায় পৌছে যায়। ইস্তাম্বুল এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করেছিল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্যসাধারণ স্থাপত্য কর্ম, বিশেষ করে দরবারী স্থাপতি সিনান পাশার (মৃত্যু: ১৫৭৮) স্থাপত্য কর্ম। গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে নির্মিত অটোমান মসজিদগুলোর সুস্পষ্ট ভিন্ন স্টাইল ছিল: ওগুলো ছিল খোলামেলা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ছিল সেখানে, নিচু গম্বুজ আর সুউচ্চ মিনার ছিল ওগুলোর। চিত্রকলা, ইতিহাস আর চিকিৎসাবিজ্ঞানকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বেশ উঁচু পর্যায়ে পৌছে দেয় দরবার; ১৫৭৯-তে একটা মানমন্দির নির্মিত হয়; আর নৌপথ ও ভৌগলিক ক্ষেত্রে নতুন ইউরোপীয় আবিষ্কারে আলোড়িত হয়েছে। সম্প্রসারণের এই বছরগুলোয় পাশ্চাত্যের সঙ্গে তথ্যের আন্তরিক আদান-প্রদান ঘটে, তখন ইউরোপের বিভিন্ন সাফল্য সত্ত্বেও অটোমান সাম্রাজ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি ছিল।

অন্য দু'টি সাম্রাজ্যের মত অটোমানরাও তাদের রাজ্যকে একটা বিশেষ ইসলামী পরিচয় দিয়েছিল। সুলেইমানের অধীনে অতীতের যেকোনও মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনায় শরিয়াহ্ অনেক বেশী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল মুসলিমের জন্যে সরকারি আইনে পরিণত হয় তা। অটোমানরাই প্রথম শরিয়াহ্ আদালতে নিয়মিত হাজিরা দিয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞগণ– *কাজিগণ*, যারা আদালতে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতেন; তাদের পরামর্শক (*মুফতি*), যারা আইনের ব্যাখ্যা দিতেন; এবং *মাদ্রাসার* শিক্ষকগণ –সরকারি বাহিনীতে পরিণত হন। সুলতানের সঙ্গে প্রজা সাধারণের নৈতিক ও ধর্মীয় যোগসূত্র গড়ে তোলেন এঁরা। আরব প্রদেশগুলোয় এটা সবিশেষ মূল্যবান ছিল, যেখানে রাষ্ট্র ও *উলেমা*দের মধ্যকার অংশীদারি জনগণকে তুর্কি শাসন মেনে নিতে সাহায্য করেছিল। *উলেমা*দের কেবল পবিত্র আইনের সমর্থনই ছিল না –যা শাসকদের বৈধতা দিয়েছিল বরং প্রায়শ এমনটি ঘটতে দেখা গেছে যে, নির্দিষ্ট প্রদেশের স্থানীয় অধিবাসী *উলেমাগণ*, স্বদেশী জনতা এবং তুর্কি গভর্নরের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছেন।

অটোমানদের প্রজাসাধারণ প্রধানত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক রাজ্যের সদস্য হিসাবে গর্বিত ছিল। কুরান শিক্ষা দিয়েছে যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী বসবাসকারী *উম্মাহ্* সমৃদ্ধি লাভ করবে, কেননা তা অস্তিত্বের মৌলনীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাথমিক অটোমানদের বিস্ময়কর সাফল্য, যাদের বৈধতা ব্যাপকভাবে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট আইনের প্রতি আনুগত্যের ওপর দাঁড়িয়েছিল, এই বিশ্বাসের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। *উলেমাগণও* এটাও অনুভব করেছিলেন যে এই সাম্রাজ্য *তাঁদেরই* রাজ্য আর অটোমানগণ রাষ্ট্রীয় নীতি এবং মুসলিম বিবেকের এক বিরল সমন্বয় অর্জন করেছে। কিন্তু এই অংশীদারির আবার– ফলপ্রসূ ছিল বটে– নেতিবাচক দিকও ছিল, কেননা এটা *উলেমাদের* ক্ষমতায়নের পরিবর্তে শেষ অবধি তাদের কণ্ঠরোধ, এমনকি অপমানিত করেছে। শরিয়াহ্‌র সূচনা হয়েছিল প্রতিবাদ আন্দোলন হিসাবে এবং এর গতিশীলতার অধিকাংশের মূলে ছিল বিরোধী অবস্থান। অটোমান ব্যবস্থার অধীনে অনিবার্যভাবে তা হারিয়ে গিয়েছিল। *উলেমাগণ* রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে, সুলতান এবং তাঁর *পাশাগণ* ভর্তুকি প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে– করেছেনও– তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। আবু আল-সুন্দ খোলা চেলেবি (১৪৯০-১৫৭৪), যিনি অটোমান-*উলেমা* মৈত্রীর নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন, স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে *কাজিগণ* শরিয়াহ্‌র অভিভাবক সুলতানের তরফ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করে থাকেন সুতরাং তাঁরা তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রয়োগে বাধ্য। এভাবে শরিয়াহ্‌কে চরম রাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয় (যা আগের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল) –মূলত যার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই সূচনা ঘটেছিল এর।

ইরানের শিয়া *উলেমাগণ* রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। জনগণের সমর্থন লাভ করেন তাঁরা। ইরানি *উলেমাদের* অনেকেই পরবর্তীকালে নিবেদিত প্রাণ সংস্কারকে পরিণত হন এবং অত্যাচারী শাহ্‌দের বিরুদ্ধে জনগণকে কার্যকর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক *উলেমা* আধুনিককালের গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণা গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যে *উলেমাগণ* হীনবল হয়ে পড়েছিলেন, রাজনৈতিক সুবিধা বঞ্চিত হওয়ায় রক্ষণশীল হয়ে পড়েন তাঁরা এবং ফলে যেকোনও পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন। সুলেইমানের শাসনকাল শেষ হবার পর *মদ্রাসাসমূহের* পাঠ্যক্রম আরও সংকীর্ণ রূপ নেয়। কালসাফাহ্‌র পাঠ বাদ দেয়া হয়, জোর দেয়া হয় *ফিক্‌হর* প্রতি অধিকতর মনোযোগের ওপর। অটোমান সাম্রাজ্যের ইসলামী অবস্থান, এক বিশাল *গাজী* রাজ্য, ছিল সাম্প্রদায়িক ও গোত্রবাদী। মুসলিমরা মনে করেছে তারা চারদিক থেকে চেপে আসা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অর্থোডক্সির পতাকাবাহী। *উলেমাগণ*, এমনকি সৃষ্টিগণও এই মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন; তারপর যখন সাম্রাজ্যের দুর্বলতার লক্ষণগুলো প্রথমবারের মত ফুটে ওঠে, এই প্রবণতা আরও প্রবল চেহারা নেয়। যদিও রাজদরবার তখনও ইউরোপ থেকে আগত নতুন নতুন ধ্যান-ধারণাকে স্বাগত জানাচ্ছে, কিন্তু *মদ্রাসাগুলো* হয়ে দাঁড়াল ইউরোপীয় অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে নেয়া

যেকোনও পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরোধিতার প্রধান কেন্দ্র। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ, *উলেমাগণ* ইসলামী বই পুস্তকের মুদ্রণের বিরোধিতা করেছেন। সাম্রাজ্যের ক্রিশ্চান জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন তাঁরা, যাদের অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই নতুন পশ্চিমের দিকে তাকিয়েছিল। জনগণের ওপর *উলেমাদের* প্রভাব অটোমান সমাজের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে ওঠে এবং মানুষ এমন এক সময়ে পরিবর্তনের ধারণার প্রতি বৈরী হয়ে পড়ে যখন পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। *উলেমাগণ* পুরনো ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে থাকায় মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্যের আধুনিকতা হানা দেয়ার পর তাদের পক্ষে জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। ফলে পথনির্দেশের জন্যে অন্যত্র চোখ ফেরাতে হয়েছে তাদের।

এমনকি মহাপরাক্রমশালী অটোমান সাম্রাজ্যও কৃষিভিত্তিক সমাজের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে যথাযথ ছিল না, সম্প্রসারণের গতির সঙ্গে যা তাল মেলাতে পারেনি। সামরিক শৃঙ্খলা দুর্বল হয়ে পড়ায় সুলতানগণ আবিষ্কার করলেন, তাঁরা আর চরম ক্ষমতা ভোগ করতে পারছেন না। অর্থনীতির দুরবস্থা দুর্নীতি আর কর ফাঁকির প্রবণতা সৃষ্টি করে। উচ্চবিত্তের লোকেরা বিলাসী জীবনযাপন করতে থাকে, হ্রাস পেয়ে চলে রাজস্ব আয়; অধিকতর কার্যকর ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার কারণে বাণিজ্যে অবনতি ঘটে, আর স্থানীয় সরকারগুলো নিজের তহবিল সামলাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েনি, বরং পুরো সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক জীবন ধরে রেখেছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ পতন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে –বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। স্থানীয় সংস্কারকগণ ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পান।

আরবীয় পেনিনসূলায় মুহাম্মদ ইবন আবদ আল-ওয়াহ্হাব (১৭০৩-৯২) ইস্তাম্বুল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সক্ষম হন এবং মধ্য আরব ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইবন তাঈমিয়াহ্র ঐতিহ্য অনুযায়ী টিপিক্যাল সংস্কারক ছিলেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল কুরান এবং *সুন্নাহ্য়* মৌলবাদী প্রত্যাবর্তন এবং পরবর্তী কালের সকল সংযোজনের জঙ্গী প্রত্যাখ্যান– যেখানে মধ্যযুগীয় ফিকহ্, অতীন্দ্রিয়বাদ, ফালসাফাহ্ অন্তর্ভুক্ত এবং অধিকাংশ মুসলিম এগুলোকে স্বাভাবিকই মনে করত– দ্বারা চলমান সঙ্কট সর্বোত্তম উপায়ে মোকাবিলা করা সম্ভব। অটোমান সুলতানগণ যেহেতু প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য মেনে নেননি, আব্দ আল-ওয়াহ্হাব তাদের ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা দেন, মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য বলে দাবী করেন। পরিবর্তে তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম *উম্মাহ্* আদর্শের ওপর ভিত্তি করে নিখাদ বিশ্বাসের এক ছিটমহল সৃষ্টির প্রয়াস পান। তাঁর আগ্রাসী কৌশল সমূহের কিছু কিছু বিংশ শতাব্দীতেও– আরও ব্যাপক পরিবর্তন ও অস্থিরতারকাল– কিছু মৌলবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হবে। ওয়াহ্হাবিবাদ ইসলামের একটি রূপ যা আজও সৌদি আরবে অনুসৃত হচ্ছে। ঐশী গ্রন্থের কঠোর আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং গোড়ার দিকের ইসলামী ট্র্যাডিশনভিত্তিক এক পিউরিটান ধর্ম।

মরোক্কোয় সুফি সংস্কারক আহমাদ ইবন ইদরিস (১৭৮০-১৮৩৬) ভিন্নভাবে সমস্যার মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর সমাধান ছিল জনগণকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে আরও ভালো মুসলিমে পরিণত করা। উত্তর আফ্রিকা ও ইয়েমেনে ব্যাপক সফর করেছেন তিনি, সাধারণ মানুষকে তাদের নিজস্ব ভাষায় নির্দেশনা দিয়েছেন, আর *সালাতের* মত মৌল প্রার্থনার আচার কীভাবে সঠিকভাবে সারা যায় সে শিক্ষা দান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে *উলেমা*গণ তাঁদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, *মাদ্রাসা*সমূহে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন নিজেদের, কেবল *ফিকহ*'র সূক্ষ্ম বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, আর জনগণকে আপন বোধ-বুদ্ধি অনুযায়ী চলার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য নব্য সুফিগণ, এই সংস্কারকদের এনামেই অভিহিত করা হয়, আলজিরিয়া ও মদীনায় একই ধরনের দায়িত্ব পালন করেন। মুহাম্মদ ইবন আলী আল-সানুসি (মৃত্যু:১৮৩২) সানুসিয়াইয়াহ্ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন যা আজও লিবিয়ায় ইসলামের প্রভাবশালী রূপ হিসাবে টিকে আছে। নব্য-সুফিগণের নতুন পশ্চিম সম্পর্কে কোনও আগ্রহ বা জ্ঞান ছিল না, কিন্তু তারা তাঁদের নিজস্ব অতীন্দ্রিয়বাদী ঐতিহ্যের মাধ্যমেই ইউরোপীয় আলোকনপর্বে (Enlightenment) আবিষ্কৃত ধারণার অনুরূপ ধারণা গড়ে তুলেছিল। তারা জোর দিয়ে বলেছে যে *উলেমা*দের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে মানুষকে তাদের নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হবে। ইবন ইদরিস এমনকি পয়গম্বর বাদে আর সমস্ত মুসলিম চিন্তাবিদের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যানের কথাও বলেছেন। এভাবে তিনি মুসলিমদের বিভেদের অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে, অতীত ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকার বদলে নতুনকে মূল্য দিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তার অতীন্দ্রিয়বাদের ভিত্তি হচ্ছেন ব্যক্তি পয়গম্বর, মানুষকে তিনি দূরবর্তী ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষায় না থেকে নিজেদের আদর্শ মানব সন্তান হিসাবে পড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছেন, অনেকটা ভক্তিমূলক মানবতাবাদের আদলে।

সুতরাং, নতুন ইউরোপের বৈশিষ্ট্য প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের পক্ষে নিরেট কোনও যুক্তি ছিল না। বহু শতাব্দী ধরে এমন কিছু মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়েছে তারা যেগুলো আধুনিক পশ্চিমের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হবে: সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তীব্র আবেগ, এক সাম্যবাদী রাজনীতি, বাক স্বাধীনতা এবং *তাওহীদে*র আদর্শ সত্ত্বেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে যা (শিয়াবাদের ক্ষেত্রে) ধর্ম ও রাজনীতির নীতিগত বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অধিকাংশ সচেতন মুসলিম মানতে বাধ্য হয় যে ইউরোপ তাদের ছাড়িয়ে গেছে। গোড়ার দিকে অটোমানরা ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে নাস্তানাবুদ করেছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে তারা আর তাদের সামনে দাঁড়াতেই পারছিল না, সমানে সমানে লড়তেও পারছিল না তারা. ষোড়শ শতাব্দীতে সুলেইমান ইউরোপীয় বণিকদের কূটনৈতিক নিরাপত্তা (Immunity) দান করেন। এই চুক্তিগুলো ক্যাপিটুলেশনস (কারণ এগুলো প্রণীত হয়েছিল capita : শিরোনামের নিচে) নামে পরিচিত ছিল যার সারকথা ছিল এই যে অটোমান এলাকায় বাসকারী ইউরোপীয় বণিকদের দেশীয় আইন মেনে চলার

আবশ্যকতা নেই; তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী নিজেদের আদালতে তাদের অপরাধের বিচার হত, যেখানে সভাপতিত্ব করতেন তাদের নিজস্ব কনসাল। সুলেইমান সমপর্যায়ে থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে এইসব চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ক্যাপিটুলেশনগুলো অটোমানদের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে দিচ্ছে, বিশেষ করে ১৭৪০-এ যখন সাম্রাজ্যের ক্রিশ্চান মিল্লেটদের (millets) জন্যে পরিবর্তিত হল, ইউরোপীয় বিদেশীদের মতই "নিরাপত্তার অধিকারী" (Protected) হয়ে উঠল তারা, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রইল না আর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অংশে এসে অটোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও অবনতি ঘটে; অরবীয় প্রদেশগুলোর বেদুঈন গোত্রগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়; আর স্থানীয় *পাশাগণ* আর ইস্তাম্বুলের যাথাযথ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেন না, প্রায়শ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা, জনগণকে শোষণ করতে থাকেন। এদিকে পাশ্চাত্য অবশ্য একের পর এক জয় লাভ করে যাচ্ছিল। কিন্তু অটোমানগণ অযথা উদ্বিগ্ন বোধ করেনি। সুলতান তৃতীয় সেলিম ইউরোপকে অনুসরণ করার প্রয়াস পান, তিনি ভেবেছিলেন পশ্চিমা কায়দায় সেনাবাহিনীর সংস্কার করা গেলে শক্তির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যাবে। ১৭৮৯তে তিনি ফরাসি ইন্সট্রাকটরদের নিয়ে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, যেখানে ছাত্ররা ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা আর আধুনিক মার্শাল-আর্টের পাশাপাশি নতুন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যায়ন করে। কিন্তু পশ্চিমের হুমকি মোকাবিলার জন্যে এসব যথেষ্ট ছিল না। মুসলিমরা বুঝে উঠতে পারেনি যে অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ইউরোপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক সমাজের বিকাশ ঘটিয়েছে, এবং এখন অপ্রতিরোধ্যভাবে ইসলামী বিশ্বকে অতিক্রম করে গেছে– অচিরেই বিশ্ব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে তারা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তিনটি বিশাল সাম্রাজ্যই পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এর কারণ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অযোগ্যতা বা অদৃষ্টবাদ নয়, যেমনটি ইউরোপীয়রা প্রায়ই উদ্ধতভাবে মনে করে থাকে। যেকোনও কৃষিনির্ভর রাজনীতির আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ এবং এই মুসলিম রাজ্যগুলো, যা কৃষিভিত্তিক আদর্শের চূড়ান্ত বিকাশের প্রতিভূ ছিল, স্রেফ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য সমাপ্তির মুখোমুখি হয়েছে। প্রাক-আধুনিক যুগে পশ্চিমা ও ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যও উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছে। ইসলামী রজ্যেও ইতিপূর্বে পতন ঘটেছে; প্রতিবারই মুসলিমরা ভস্মস্তূপ থেকে ফিনিক্সের মত পুনরুজ্জীবিত হতে পেরেছে এবং এগিয়ে গেছে উত্তরোত্তর ব্যাপক সাফল্যের দিকে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলিমদের দুর্বলতা আর পাশ্চাত্যের একেবারে ভিন্ন ধরনের সভ্যতা সমসাময়িক হয়ে দাঁড়ায় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা অনেক বেশী দুরূহ বলে আবিষ্কার করবে মুসলিম বিশ্ব।

৫

প্রতিরুদ্ধ ইসলাম

পশ্চিমের আবির্ভাব (১৭৫০-২০০০)

পাশ্চাত্যের উত্থান বিশ্বের ইতিহাসে নজীর বিহীন। আল্পসের উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলো শত শত বছর ধরে পশ্চাদপদ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছিল, দক্ষিণের গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত রেখেছিল নিজেদের। এবং ক্রমশ নিজস্ব ভিন্ন রূপের খ্রিস্টধর্ম এবং নিজস্ব ধরনের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। পশ্চিম ইউরোপ ক্রিশ্চান বাইযানটাইন সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল, ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য ধসে পড়লেও সেখানে সেরকম ঘটেনি। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ পশ্চিম ইউরোপীয় এই দেশগুলো অন্যান্য প্রধান সংস্কৃতিক সঙ্গে তাল মেলাতে শুরু করেছিল মাত্র এবং ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এক ব্যাপক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে যা পাশ্চাত্যকে অবশিষ্ট বিশ্বকে আপন প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসার যোগ্য করে তুলেছে। একটা আউটগ্রুপের পক্ষে এমন উর্ধ্বারোহণের সাফল্য অসাধারণ ব্যাপার। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী কালে আরব মুসলিমদের প্রধান পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। কিন্তু মুসলিমরা বিশ্ব শাসনের অধিকার অর্জন করতে পারেনি, বা নতুন ধরনের সভ্যতারও বিকাশ ঘটায়নি যেমনটি ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল।

অটোমানরা যখন ইউরোপের হুমকি মোকাবিলায় আবার তাদের সেনাবাহিনীকে পূর্নগঠনের প্রয়াস পেয়েছিল তখন তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণ সেটা ছিল কেবল উপরিতলের পরিবর্তন। ইউরোপকে তার নিজের খেলায় হারানোর জন্যে প্রচলিত কৃষিভিত্তিক সমাজের আপাদমস্তক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং মননশীলতার গোটা কাঠামোর পুনর্নির্মাণের এবং সেটা করা উচিত ছিল খুব দ্রুততার সঙ্গে; যা ছিল অসম্ভব একটা কাজ, কেননা এই পরিবর্তন অর্জনের পেছনে পাশ্চাত্যের তিনশো বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল।

ইউরোপ এবং এর আমেরিকান কলোনিগুলোর নতুন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপন্নের ওপর নির্ভর না করে বিশেষ প্রযুক্তি এবং পুঁজি বিনিয়োগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা: পাশ্চাত্যকে যা এর সম্পদ সীমাহীন মাত্রায় পুনরুৎপাদনে সক্ষম করে তুলেছিল, যার ফলে পাশ্চাত্য সমাজ আর কৃষিভিত্তিক সমাজের সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতার ফাঁদে বাধা পড়েনি। বাস্তবিকপক্ষে এই

প্রধান বিপ্লব দ্বিতীয়রারের মত অ্যাক্সিয়াল যুগের সৃষ্টি করেছিল, যার দাবী ছিল একই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রাতিনীতির ব্যাপক অদলবদল: রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক। আগেভাগে চিন্তা করা হয়নি এসব বা কোনও পরিকল্পনাও ছিল না, বরং তা এক জটিল প্রক্রিয়ারই পরিণতি যার ফলে জন্ম নিয়েছে গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার সামাজিক কাঠামো। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব অর্জন করে ইউরোপীয়রা যা তাদের পরিবেশের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম করে তোলে, এর আগে কেউ যা পারেনি। চিকিৎসাবিজ্ঞান, নৌযাত্রা, কৃষিক্ষেত্র আর শিল্পজগতে নতুন নতুন আবিষ্কার আর উদ্ভাবন ঘটে। এগুলোর কোনওটিই বিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনে সক্ষম নয়, কিন্তু এগুলোর সমন্বিত ফলাফল ছিল মারাত্মক। ১৬০০ সাল নাগাদ উদ্ভাবনের মাত্রা এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে প্রগতিকে মনে হয়েছে অপ্রতিরোধ্য; কোনও একটি ক্ষেত্রে কোনও একটি আবিষ্কার অন্যক্ষেত্রে আনকোরা নতুন দর্শনের দ্বার খুলে দিয়েছে। বিশ্বকে অপরিবর্তনীয় আইনের অধীন হিসাবে না দেখে ইউরোপীয়রা আবিষ্কার করল যে তারা প্রকৃতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি-সৃষ্ট রক্ষণশীল সমাজের যেখানে এধরনের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা ছিল না, ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ সেখানে আরও বেশী মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিল। তারা এবার অবিরাম প্রগতি আর বাণিজ্যের অব্যাহত উন্নয়নের দৃঢ় আশা নিয়ে পুঁজির বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। এই সময় নাগাদ সমাজের প্রযুক্তিকরণের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব জন্ম লাভ করে, পাশ্চাত্য এমনই আত্মবিশ্বাস বোধ করতে শুরু করে যে অনুপ্রেরণার আশায় তাদের আর অতীতের মুখাপেক্ষী থাকার প্রয়োজন পড়েনি –যেমনটি কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি বা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়– বরং তারা তাকিয়েছে ভবিষ্যতের দিকে।

সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন জড়িত। দক্ষতাই হচ্ছে মূল কথা, যে কোনও উদ্ভাবন বা রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে কিনা সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়। মানুষের ক্রমবর্ধমান হারে ব্যাপক ভিত্তিতে পরিচালিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প প্রকল্পে অংশ নেয়ার প্রয়োজন পড়েছে– মুদ্রক, কেরানি, কারখানা শ্রমিক– আর নতুন মানদণ্ডের কিঞ্চিৎ অংশীদার হওয়ার জন্য তাদের কোনও না কোনও শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার হয়েছে। ব্যাপক ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্য কেনার জন্যে অধিক সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয়েছে, তো অর্থনীতিকে চালু রাখার স্বার্থে মানুষজনকে ক্রমবর্ধমান হারে জীবনযাত্রার ন্যূনতম পর্যায়ের উর্ধ্বে থাকতে হয়েছে। শ্রমিরা অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত হয়ে ওঠায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের অধিকার দাবী করেছে। কোনও জাতি যদি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর মানবসম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটাতে চায়, তাহলে তাকে এতদিন পর্যন্ত প্রান্তিক পর্যায়ে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করে রাখা গ্রুপগুলোকে যেমন, ইহুদিদের, সাংস্কৃতির মূলধারার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক

হয়ে পড়ে। ধর্মীয় মতপার্থক্য এবং আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহকে অবশ্যই কোনওভাবেই সমাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে দেয়া যাবে না, তো বিজ্ঞানী, রাজা এবং সরকারী কর্মচারীগণ দাবী তুললেন যে তাঁদের গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দিতে হবে। এভাবে গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, সহিষ্ণুতা, মানবাধিকার আর সেক্যুলারিজমের আদর্শগুলো কেবল রাজনীতি-বিজ্ঞানীদের স্বপ্নের সুন্দর সুন্দর আদর্শ স্বপ্নই ছিল না, বরং সেগুলো অন্তত: অংশত: আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনেরই প্রকাশ ছিল। দেখা গেছে যে দক্ষ এবং উৎপাদনশীল হওয়ার জন্যে আধুনিক কোনও জাতিকে সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠিত করা দরকার। আবার এটাও দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সমাজ যদি তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে নয়া যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সংগঠিত করে, তাহলে সেগুলো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে; প্রচলিত কৃষিভিত্তিক সমাজগুলো যার ধারে কাছে আসার যোগ্যতা রাখে না।

ইসলামী জগতের ওপর এর প্রভাব ছিল মারাত্মক। আধুনিক সমাজের প্রগতিশীল প্রকৃতি আর শিল্পায়নকৃত অর্থনীতির মানে ছিল একে অবিরাম সম্প্রসারিত হতে হবে। নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন ছিল এবং একবার অভ্যন্ত রীণ বাজারগুলো সম্পৃক্ত হয়ে গেলে বাইরে বাজার অনুসন্ধান করতে হয়েছে তাদের। সুতরাং পশ্চিমা দেশগুলো নানাভাবে আধুনিক ইউরোপের বাইরে কৃষিভিত্তিক দেশগুলোকে বাণিজ্যিক নেটওঅর্কের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে উপনিবেশে পরিণত করতে শুরু করে। এটাও বেশ জটিল প্রক্রিয়া ছিল। উপনিবেশাধীন দেশগুলো রপ্তানির জন্যে কাঁচামালের যোগান দিয়েছিল যেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ইউরোপীয় শিল্পখাতে। বিনিময়ে সেই দেশ সস্তায় ইউরোপীয় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী লাভ করেছে, যার মানে ছিল সাধারণভাবে স্থানীয় শিল্পখাতের বিনাশ। উপনিবেশকে আবার ইউরোপীয় কায়দায় পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন ছিল, দরকার ছিল এর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জীবনধারাকে যৌক্তিককরণের ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্য ব্যবস্থাধীনে আনার এবং অন্তত "নেটিভদের" একটা অংশের আধুনিক ধ্যান-ধারণা আর রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে হয়েছিল।

এই উপনিবেশ স্থাপন প্রক্রিয়া কৃষিভিত্তিক উপনিবেশগুলো আগ্রাসী, অস্বস্তিকর এবং অচেনা বলে মনে করেছে। আধুনিকীকরণের ব্যাপারটা অনিবার্যভাবে উপরিগত (Superficial) ছিল, কেননা যে প্রক্রিয়াটি ইউরোপে তিন শত বছর ধরে চলেছে– তা দ্রুত গতিতে অর্জন করা জরুরি ছিল। ইউরোপে আধুনিক ধারণাসমূহ যেখানে সমাজের সকল শ্রেণীর কাছে আস্তে আস্তে পৌছানোর সময় পেয়েছিল, উপনিবেশগুলোয় সেখানে নগণ্য সংখ্যক মানুষ, যারা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সদস্য ছিল এবং– তাৎপর্যপূর্ণভাবে– সামরিক বাহিনী, পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে আর আধুনিকতার গতিশীলতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে প্রয়োজনবোধেই প্রাচীন কৃষিভিত্তিক রীতিনীতিতে পচতে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে, ক্রমবর্ধমান হারে পরস্পরকে বুঝতে পারেনি। যাদের আধুনিকীকরণের বাইরে রেখে দেয়া হয়েছিল তারা অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে তাদের দেশ কেমন যেন একেবারেই অচেনা হয়ে যাচ্ছে, যেন রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক কাঠামো বিকৃত হয়ে অপরিচিত হয়ে যাওয়া কোনও বন্ধু। বিদেশী সেক্যুলার আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে তারা যেগুলো ছিল তাদের বোধের অতীত। তাদের শহরগুলো বদলে গিয়েছিল, পশ্চিমা দালানকোঠা শহরগুলোকে "আধুনিক করেছে", প্রায়শ "পুরনো নগরী"গুলোকে রেখে দিয়েছে জাদুঘরের বিষয় হিসাবে, যেগুলো পর্যটকদের আকর্ষণ-বস্তু বা ফেলে আসা সময়ের রেলিক। পশ্চিমা পর্যটকরা প্রায়ই ওরিয়েন্টাল নগরীর আঁকাবাঁকা গলিপথ আর আপাত কোলাহলে দিশাহারা এবং উন্মূল অনুভব করে: তারা এটা সবসময় বুঝতে পারে না যে, দেশীয় অনেকের চোখেও তাদের আধুনিককৃত রাজধানীগুলোকে একই রকম অচেনা মনে হয়। জনগণ নিজের দেশেই নিজেদের ঠিকানাবিহীন মনে করেছে। সর্বোপরি সমাজের সকল শ্রেণীর স্থানীয় জনগণ নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারিয়ে ফেলার কথাটা মেনে নিতে পারেনি। তারা মনে করেছে শেকড়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে, আত্মপরিচয় খোয়ানোর বোধ জেগেছিল তাদের মাঝে।

ইউরোপীয় ও আমেরিকানরা যেখানে তাদের নিজস্ব গতিতে আধুনিকীকরণ এবং নিজস্ব কর্মসূচি স্থির করার সুযোগ পেয়েছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলোর অধিবাসীদের সেখানে অনেক বেশী দ্রুত আধুনিক হতে হয়েছে এবং তাদের ভিন্ন কারও কর্মসূচি পরিপালনে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এমনকি পাশ্চাত্যের জনগণের কাছেও তাদের সমাজের পরিবর্তন বেদনাদায়ক ছিল। প্রায় চারশো বছরব্যাপী রাজনৈতিক এবং প্রায়শ রক্তাক্ত অভ্যুত্থান, সন্ত্রাসের রাজত্ব, গণহত্যা, ধর্মীয় সহিংসতা, গ্রামাঞ্চলের লুণ্ঠন কার্যক্রম, ব্যাপক সামাজিক উত্থান-পতন, কলকারখানায় শোষণ, আধ্যাত্মিক অস্থিরতা আর নতুন মেগাসিটি সমূহের গভীর বৈরিতা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল তাদের। আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অনুরূপ সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা, অভ্যুত্থান এবং দিশাহারা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, যা আধুনিককালে উত্তোরণের যাত্রাকে আরও কঠিন করে তুলছে। একথাও সত্যি যে, পাশ্চাত্যে বিকাশ লাভ করা আধুনিক চেতনা মৌলিকভাবে আলাদা। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এর প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য ছিল: উদ্ভাবন এবং স্বায়ত্তশাসন (ইউরোপ ও আমেরিকায় আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক ফ্রন্টে স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে)। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া স্বায়ত্ত শাসনের অনুগামী হয়নি বরং তা স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। উদ্ভাবনের পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলো কেবল পশ্চিমকে অনুকরণের মাধ্যমে আধুনিক হতে পারে, যা এত বেশী অগ্রসর ছিল যে নাগাল পাওয়ার কোনও আশাই তাদের ছিল না। আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া যেহেতু এক ছিল না, সুতরাং ফলাফল যে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে যা প্রত্যাশিত-ধরণ

সেকরম কিছু হবে, এমন সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। কেকের সঠিক উপাদানসমূহ যদি পাওয়া না যায়– যদি ময়দার বদলে চাল আর তাজা ডিমের বদলে পচা ডিম, চিনির জায়গায় মসলা ব্যবহার করা হয়– রান্নার বইতে দেয়া কেকের বর্ণনার সঙ্গে অনেক তফাৎ থাকবে ফলাফলের। ঔপনিবেশিক দেশগুলোর আধুনিক কেকে একেবারে ভিন্ন রকম উপাদান যোগ হয়েছিল: গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, বহুত্ববাদ এবং অন্যান্য ফলাফল পশ্চিমে যেভাবে বেরিয়ে এসেছিল এই প্রক্রিয়ায় সেরকম কিছু বেরিয়ে আসার কথা নয়।

আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামী বিশ্ব প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছে। বিশ্ব সভ্যতার অন্যতম নেতৃত্বের আসন লাভ করার পরিবর্তে ইসলামী জগৎ দ্রুত এবং স্থায়ীভাবে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর নির্ভরশীল বলয়ে পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশবাদীদের অসন্তোষের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল মুসলিমরা। পশ্চিমারা আধুনিক রীতিনীতিতে এমনভাবে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল যে, প্রায়শ তারা তাদের চোখে মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতা, অদক্ষতা, অদৃষ্টবাদ আর দুর্নীতি প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে গেছে। তারা ধরে নিয়েছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি সবসময়ই প্রাগ্রসর ছিল, তাদের এটা বোঝার মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না যে, কেবল প্রাক-আধুনিক কৃষিভিত্তিক সমাজ দেখছে তারা এবং কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপও একই রকম "পশ্চাদপদ" ছিল। তারা এটা প্রায়ই নিশ্চিতভাবে ধরে নেয় যে, পশ্চিমারা উত্তরাধিকারসূত্রে এবং জাতিগতভাবে "ওরিয়েন্টালদের" তুলনায় উন্নত এবং নানাভাবে তারা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব অস্বাভাবিক ছিল না। পাশ্চাত্যের জনগণ প্রায়ই তাদের সংস্কৃতির প্রতি মুসলিমদের বৈরী অনুভূতি আর বিদ্বেষ লক্ষ্য করে হতবাক হয়ে যায়, যাকে তারা তাদের ভিন্নতর অভিজ্ঞতার কারণে খুবই উদারনৈতিক আর ক্ষমতাপ্রদানকারী বলে মনে করে। কিন্তু মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক নয়; কারণ ইসলামী বিশ্ব এমন সুবিস্তৃত আর কৌশলগতভাবে বিস্তৃত ছিল যে, এবারই প্রথম এক সমন্বিত, পদ্ধতিগত উপায়ে মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, আরব, মালয় এবং আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য অংশ উপনিবেশকরণের প্রক্রিয়ার অধীনে পড়েছিল। এসব অঞ্চলের মুসলিমরা এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার আক্রমণের প্রথম আঁচ টের পেয়েছে। তাদের প্রতিক্রিয়া নতুন পশ্চিমের প্রতি সামান্য *সাড়ামাত্র* ছিল না, বরং তা ছিল *দৃষ্টান্তমূলক* প্রতিক্রিয়া। তারা, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জাপানের মত সাফল্যের সঙ্গে বা মসৃণভাবে আধুনিক যুগে উঠে আসতে পারেনি –জাপান কখনও উপনিবেশে পরিণত হয়নি, জাপানের অর্থনীতি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ অটুট রয়ে গিয়েছিল, যেগুলো শক্তি হারিয়ে পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়নি।

ইসলামী বিশ্বের ওপর ইউরোপীয় আগ্রাসন সবক্ষেত্রে একরকম ছিল না; কিন্তু সেটা ছিল সম্পূর্ণ এবং কার্যকর। সূচনা হয়েছিল মোঘল ভারতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ বণিকের দল রেঙ্গুনে শেকড় গাড়ে এবং সেই সময়, আধুনিকীকরণের

প্রক্রিয়া যখন শিশু অবস্থায়, ব্রিটিশরা হিন্দু ও মুসলিম বণিকদের সমান পর্যায়েই বসবাস করেছে। কিন্তু ব্রিটিশদের এই কার্যকলাপ "বাংলার লুণ্ঠন প্রক্রিয়া" হিসাবে পরিচিতি, কেননা এর ফলে স্থানীয় শিল্পক্ষেত্রগুলো স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কৃষিখাতকে এমনভাবে বদলে দেয় যে, বাঙালীরা তখন আর নিজেদের জন্যে শস্য উৎপাদন করছিল না, উৎপাদন করছিল শিল্পায়িত পশ্চিমা বাজারসমূহের কাঁচামাল। বিশ্বের অর্থনীতিতে বাংলার অবস্থান নেমে এসেছিল দ্বিতীয় কাতারে। আস্তে আস্তে ব্রিটিশরা আরও "আধুনিক" হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে দম্ভ: তাদের হাবভাবে উন্নততর অভিব্যক্তি যোগ হয় এবং তারা ১৭৯৩-তে আগত প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের সমর্থনে ভারতীয়দের "সভ্য" বানাতে উঠেপড়ে লেগে যায়। কিন্তু বাঙালীদের তাদের নিজস্ব সম্পূর্ণ শিল্পায়িত সমাজ গঠনে উৎসাহিত করা হয়নি: ব্রিটিশ প্রশাসকরা আধুনিক প্রযুক্তির কেবল সেইসব উপাদানগুলোই যোগ করেছিল, যাতে করে তাদের প্রাধান্য নিশ্চিত হয় এবং বাংলাকে পরিপূরকের ভূমিকায় রাখা যায়। ব্রিটিশদের দক্ষতা থেকে বাঙালীরা লাভবান হয়েছিল, যা রোগশোক, দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের মত বিপর্যয়গুলোকে দূরে ঠেলে রেখেছিল, এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এতে করে জনসংখ্যাধিক্য ও দারিদ্র্যের সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেহেতু পাশ্চাত্যের মত শহরে অভিবাসী হওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না, সবাইকে যার যার এলাকাতেই রয়ে যেতে হয়েছিল।

অর্থনৈতিকভাবে বাংলার লুণ্ঠন রাজনৈতিক প্রাধান্য ডেকে আনে। ১৭৯৮ এবং ১৮১৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে চুক্তি বা সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে সিন্ধু উপত্যকা বাদে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৪৩ এবং ১৮৪৯ এর মধ্যবর্তী সময়ে পদানত হয় তা। ইতিমধ্যে ফ্রেঞ্চরা নিজস্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিল। ১৭৯৮তে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ব্রিটিশদের ভারতের সঙ্গে নৌযোগাযোগ ব্যাহত করার জন্য সুয়েযে একটা ঘাঁটি স্থাপনের আশায় মিশর দখল করে নেন। সঙ্গে করে পণ্ডিতদের একটা দল, আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যসমৃদ্ধ একটা লাইব্রেরি, একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, আরবী হরফসহ একখানা মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন তিনি। শুরু থেকেই অগ্রসর ইউরোপীয় সংস্কৃতি এক অনন্যসাধারণ দক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়াটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের চোখে আঘাত বিশেষ। মিশর ও সিরিয়ায় নেপোলিয়নের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাশিয়ার সহায়তায় উত্তর দিক থেকে ব্রিটিশভারতে হামলা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তিনি। এতে ইরান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরবর্তী শতাব্দীতে ব্রিটিশরা দেশের দক্ষিণে একটা ঘাঁটি স্থাপন করে, অন্যদিকে রাশিয়া উত্তরের নিয়ন্ত্রণ লাভের প্রয়াস পায়। কেউই ইরানকে পুরোপুরি কলোনি প্রটেক্টরেট বানাতে চায়নি (বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেল আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত), কিন্তু দুটো শক্তিই নয়া কাজার রাজবংশের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, যাতে শাহ্‌গণ অন্তত যেকোনও একজনের সমর্থন ছাড়া আক্রমণ হানার সাহস না পান। বাংলার মত ব্রিটেন এবং

রাশিয়া উভয়েই নিজেদের স্বার্থ হাসিল হবে এমন প্রযুক্তিরই বিকাশ ঘটিয়েছিল আর ইরানি জনগণের উপকারে আসতে পারে এমন ধরনের উদ্ভাবন, যেমন রেলওয়ে, রুদ্ধ করে রেখেছিল তাদের নিজস্ব কৌশলগত অবস্থান হুমকির মুখে পড়ে যাবার আশঙ্কায়।

ইউরোপীয় শক্তিগুলো একের পর এক ইসলামী দেশকে উপনিবেশে পরিণত করে। ১৮৩০-এ আলজেরিয়া দখল করে ফ্রান্স। এবং এর নয় বছর পর অ্যাডেন দখল করে ব্রিটেন। ১৮৮১ তে অধিকৃত হয় টিউনিসিয়া, ১৮৮২তে মিশর, ১৮৮৯তে সুদান এবং ১৯১২তে লিবিয়া ও মরোক্কো। ১৯১৫তে স্বাক্ষরিত সাইকস-পিকো (Sykes-Picot) চুক্তি অনুযায়ী মুমূর্ষু অটোমান সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলো (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষাবলম্বন করেছিল এরা) বিজয়ের প্রত্যাশায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। যুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স যথারীতি সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ট্রান্সজর্ডানে প্রটেক্টরেট এবং ম্যান্ডেট স্থাপন করে। ব্যাপারটাকে ভয়াবহ বিদ্বেষমূলক হিসাবে দেখা হয়েছিল, কেননা ইউরোপীয় শক্তিগুলো অটোমান সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলোকে স্বাধীনতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অটোমান মূলভূমিতে মুস্তাফা কেমাল (Mustafa Kemal), যিনি আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) নামে খ্যাত, ইউরোপীয়দের প্রতিরোধে সক্ষম হন এবং স্বাধীন টার্কি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। বলকান এলাকা, রাশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার মুসলিমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনাধীনে চলে আসে। এসব দেশের কোনও কোনওটিকে পরে স্বাধীনতা দেয়া হলেও পাশ্চাত্য প্রায়শই অর্থনীতি, তেল বা সুয়েয খালের মত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখেছিল। ইউরোপীয় দখলদারি প্রায়ই তিক্তবিরোধের উত্তরাধিকার রেখে গেছে। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ যখন ভারত থেকে প্রত্যাহৃত হয়, ভারতীয় উপমহাদেশ হিন্দু ভারত ও মুসলিম পাকিস্তানের মাঝে ভাগ হয়ে যায়, যারা আজও মারাত্মক বৈরী মনোভাবাপন্ন রয়ে গেছে, পরস্পরের রাজধানীর দিকে পারমানবিক অস্ত্র তাক করে রেখেছে। ১৯৪৮-এ প্যালেস্টাইনের আরবরা যায়নিস্টদের কাছে তাদের আবাসভূমি হারিয়ে বসে। যায়নিস্টরা জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা করে। প্যালেস্টাইন হাতছাড়া হওয়ার ঘটনা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হাতে মুসলিম বিশ্বের অপমানিত হবার জ্বলজ্যান্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, ইউরোপীয় শক্তিগুলো যেন লাখ লাখ প্যালেস্টাইনির আশ্রয়হীন অবস্থা আর স্থায়ী নির্বাসনে এতটুকু বিবেকের তাড়না বোধ করছে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গোড়ার দিকে মুসলিমদের কেউ কেউ পাশ্চাত্যের প্রতি বেশ দুর্বল ছিল। ইরানি বুদ্ধিজীবী মুলকুম খান (১৮৩৩-১৯০৮) এবং আকা খান কিরমানি (১৮৫৩-৯৬) ইরানিদের প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং আধুনিক সেক্যুলার রীতিনীতি বেছে নিয়ে শরিয়াহ্ বাদ দেয়ার আহবান জানিয়েছিলেন এবং একেই প্রগতির পথে অগ্রসর হবার একমাত্র পথ বলে বিবেচনা করেছেন। এই

গোষ্ঠীর সেক্যুলারিস্টরা ১৯০৬-এর সাংবিধানিক বিপ্লবে (Constitutional Revolution) অধিকতর উদারপন্থী *উলেমা*দের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কাজারদের একটি আধুনিক সংবিধান প্রণয়ন, রাজার ক্ষমতা সীমিতকরণ এবং ইরানিদের সংসদে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। নাজাফের অধিকাংশ *মুজতাহিদ* সংবিধান সমর্থন করেন। শেখ মুহাম্মদ হুসেইন নাইনি তাঁর *অ্যাডমোনিশন টু দ্য নেশন* (*Admonition to the Nation*, ১৯০৯)-এ অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন, যেখানে যুক্তি দেখান হয় যে এভাবে স্বেচ্ছাচারিতা সীমিত করা স্পষ্টতই শিয়াদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং পাশ্চাত্য ধাঁচের সাংবিধানিক সরকার গোপন ইমামের প্রত্যাবর্তনের জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ। মিশরীয় লেখক রিফাহ্ আল-তাহ্তাওয়ি(১৮০১-৭৩) ইউরোপীয় আলোকনপর্বের (Enlightenment) ধারণায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, যাদের দর্শন তাঁকে ফালসাফাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। প্যারিসে সবকিছু যেভাবে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেটা পছন্দ করেছেন তিনি। ফরাসি সংস্কৃতির যৌক্তিক নির্ভুলতা দেখে মোহিত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন সাধারণ মানুষের শিক্ষার হার দেখে, এবং উদ্ভাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণে আলোড়িত হয়েছেন। মিশরকে এই সাহসী নতুন জগতে প্রবেশে সাহায্য করার আশা করেছিলেন তিনি। ভারতে সাইয়ীদ আহমেদ খান (১৮১৭-৯৮) ইসলামকে আধুনিক পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন, তিনি দাবী করেছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক আইনসমূহের সঙ্গে কুরান সম্পূর্ণই মানানসই। আলীগড়ে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, যেখানে মুসলিমরা প্রচলিত ইসলামী বিষয়াদির পাশাপাশি বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিমরা যেন নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে ব্রিটিশদের হুবহু অনুকৃতি না হয়ে একটা আধুনিক সমাজে বসবাস করতে পারে।

নিজ নিজ এলাকায় উপনিবেশ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে কোনও কোনও মুসলিম শাসক স্বেচ্ছায় আধুনিকীকরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ১৮২৬-এ জেনিসারিদের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এক টানযিমাট (বিধি) জারি করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে আধুনিক করেন এবং কিছু নতুন প্রযুক্তি যোগ করেন। ১৮৩৯-এ সুলতান আবদুলহামিদ গুলহান (Gulhane) ডিক্রি জারি করেন, যার বলে তাঁর শাসন প্রজাদের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কে পরিণত হয় এবং তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সংস্কারের চিন্তা করেছিলেন। অবশ্য মিশরের আলবেনীয় *পাশা* মুহাম্মদ আলীর (১৭৬৯-১৮৪৯) আধুনিকীকরণ কর্মসূচি ছিল আরও বেশী গতিশীল, তিনি মিশরকে কার্যত ইস্তাম্বুলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ফেলেন এবং বলতে গেলে একাকী এই পশ্চাদপদ প্রদেশটিকে আধুনিক বিশ্বে তুলে আনেন। কিন্তু তাঁর কৌশলের নিষ্ঠুরতা দেখায় যে, এত তীব্র গতিতে আধুনিকীকরণের প্রয়াস কতখানি অসুবিধাজনক। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ধ্বংস

করে দেন তিনি: বলা হয়ে থাকে, মিশরের সেচ আর নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়ে তেইশ হাজার কৃষক প্রাণ দিয়েছিল; অন্য কৃষকরা মুহাম্মদ আলীর আধুনিক সেনাবাহিনীতে যোগদানের ভয়ে এতই শঙ্কিত ছিল যে, তারা নিজেরাই তাদের দেহ বিকৃত করেছে: কেউ হাতের আঙুল কেটেছে, কেউবা অন্ধ হয়ে গেছে। দেশকে সেক্যুলার করার জন্য মুহাম্মদ আলী স্রেফ ধর্মীয় কারণে প্রদত্ত জমিজমা রাজেয়াপ্ত করেন এবং পরিকল্পিতভাবে *উলেমা*দের ক্ষমতাহীন করে তোলেন, কোনও ক্ষমতাই আর তাদের রাখতে দেননি। ফলাফল, আধুনিকতাকে মারাত্মক আঘাত হিসাবে বিবেচনাকারী *উলেমা*গণ আরও বেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং স্বদেশে অস্তিত্বমান নতুন পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। মুহাম্মদ আলীর পৌত্র ইসমায়েল পাশা (১৮০৩-৯৫) ছিলেন আরও বেশী সফল: তিনি সুয়েয খালের নির্মাণ ব্যয় বহন করেন, নয়শো মাইল দীর্ঘ রেল পথ নির্মাণ করেন, এর আগে পর্যন্ত চাষাবাদ অযোগ্য ১৩,৭৩,০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেন, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং কায়রোকে এক আধুনিক নগরীতে পরিবর্তন করেন। দুঃখজনকভাবে, উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি মিশরকে দেউলিয়া করে দেয়, দেশ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয় আর ইউরোপীয় শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৮৮২-তে সামরিক দখলদারি প্রতিষ্ঠার অজুহাত পায় ব্রিটেন। মুহাম্মদ আলী এবং ইসমায়েল মিশরকে আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উল্টো, আধুনিকীকরণের পরিণামে এটা কার্যত স্রেফ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল।

প্রাথমিক সময়ের এই সংস্কারকদের কেউই ইউরোপের পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল ধারণাসমূহ পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারেননি। সুতরাং তাঁদের সংস্কার প্রয়াস ছিল উপরিগত। কিন্তু সাদ্দাম হুসেইন পর্যন্ত পরবর্তীকালের সংস্কারকরা সবাই কেবল সামরিক প্রযুক্তি আর আধুনিক পশ্চিমের বাহ্যিক সৌন্দর্যই অর্জন করার প্রয়াস পেয়েছেন, সমাজের বাকি অংশের ওপর এর প্রভাব নিয়ে একটুও চিন্তা করেননি। অবশ্য বেশ আগে থেকেই কোনও কোনও সংস্কারক এসব বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারণকারীদের অন্যতম হলেন ইরানি রাজনৈতিক কর্মী জামাল-আল-দিন (১৮৩৯-৯৭), নিজেকে যিনি "আল-আফগানি" ("আফগান") বলে অভিহিত করেছিলেন; সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল ইরানি শিয়ার চেয়ে বরং আফগান সুন্নী হিসাবে মুসলিম বিশ্বে অনেক বেশী শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন তিনি। ১৮৫৭তে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু এবং মুসলিমদের মহাবিদ্রোহের সময় ভারতে অবস্থান করেছিলেন তিনি: আরব, মিশর, টার্কি, রাশিয়া কিংবা ইউরোপের যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি পশ্চিমের সর্বব্যাপী ক্ষমতার আঁচ পেয়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, অচিরেই তা মুসলিম বিশ্বের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং ধ্বংস ডেকে আনবে। পাশ্চাত্য ধারার জীবনের অগভীর অনুকরণের বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি এবং ইসলামী বিশ্বের

জনগণের প্রতি ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে একাত্ম হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন; তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের মত করে নতুন বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হবে। সুতরাং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অর্থাৎ ইসলামের বিকাশ ঘটাতে হবে। কিন্তু খোদ ইসলামকেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিয়ে আরও যৌক্তিক ও আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। মুসলিমদের অবশ্যই দীর্ঘদিনব্যাপী "*ইজতিহাদের রুদ্ধ দ্বারের*" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে, এবং স্বাধীন যুক্তির ব্যবহার করতে হবে, যেমনটি কুরান এবং পয়গম্বর নির্দেশ দিয়েছেন।

পাশ্চাত্যের দখলদারিত্ব রাজনীতিকে আবার ইসলামী অনুভূতির কেন্দ্রে নিয়ে আসে। পয়গম্বর মুহাম্মদের(সঃ) আমল থেকেই মুসলিমরা চলমান ঘটনাবলীকে থিওফ্যানি হিসাবে দেখে এসেছে; তারা এমন একজন ঈশ্বরকে দেখেছে যিনি ইতিহাসে উপস্থিত রয়েছেন এবং একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলার স্থায়ী চ্যালেঞ্জ জারি করে রেখেছেন। মুসলিমরা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ঐশী তাৎপর্যের সন্ধান করেছে এবং তাদের ব্যর্থতা আর দুঃখজনক ঘটনাগুলো থিওলজি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের পর মুসলিমরা যখন কুরানের চেতনার অনেক কাছাকাছি এক ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, তখন *উম্মাহ*র রাজনৈতিক স্বাস্থ্য নিয়ে কম উদ্বিগ্ন ছিল তারা। অভ্যন্তরীণ ধার্মিকতার বিকাশ ঘটানোর স্বাধীনতা বোধ করেছিল। কিন্তু তাদের জীবনে পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশ জন্ম দিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় জিজ্ঞাসার। *উম্মাহ*র অপদস্থ হওয়ার ব্যাপারটা কেবল রাজনৈতিক বিপর্যয় নয়, বরং মুসলিমদের একেবারে আত্মায় আঘাত হেনেছিল। নতুন দুর্বলতা ইসলামের ইতিহাসে মারাত্মক কোনও বিচ্যুতি ঘটে যাবারই লক্ষণ। কুরানের প্রতিশ্রুতি ছিল যে ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকারী কোনও সমাজ ব্যর্থ হতে পারে না। মুসলিম ইতিহাস এর সত্যতা প্রমাণ করে। বারবার, যখনই বিপদ নেমে এসেছে, ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে, ধর্মকে নতুন পরিস্থিতিতে বাঙময় করে তুলেছে এবং *উম্মাহ* কেবল পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি বরং সাধারণভাবে আরও ব্যাপক সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছে। সেক্যুলার, ঈশ্বরহীন পাশ্চাত্যের প্রাধান্যে ইসলামী জগৎ কেমন করে ক্রমাগত পতিত হতে পারছে? এই সময় পর্ব হতে মুসলিমরা অধিক সংখ্যায় এইসব প্রশ্নে আলোড়িত হতে থাকে এবং মুসলিম ইতিহাসকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের প্রয়াসকে কখনও কখনও মরিয়া এবং এমনকি হতাশাব্যঞ্জক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আত্মঘাতী বোমারু বিমান– ইসলামী ইতিহাসের প্রায় নজীরবিহীন ঘটনা– দেখায় যে কোনও কোনও মুসলিম ধরে নিয়েছিল যে তারা অনতিক্রম্য বাধার মুখোমুখি হয়েছে।

আল-আফগানির রাজনৈতিক প্রচারণাসমূহ, যেগুলো ছিল প্রায়শই উদ্ভট কিংবা একেবারেই অনৈতিক, এমনি হতাশায় পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৬-তে তাঁর একজন শিষ্য ইরানের শাহকে হত্যা করে। কিন্তু তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মী মিশরীয়

পণ্ডিত মুহাম্মদ আবদু (১৮৪৯-১৯০৫) ছিলেন অধিকতর গভীর এবং পরিমিতি বোধ সম্পন্ন চিন্তাবিদ। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিপ্লব নয়, বরং শিক্ষাই প্রকৃত সমাধান। মিশরে ব্রিটিশ দখলদারিত্বে চরম আঘাত পেয়েছিলেন আবদু, কিন্তু ইউরোপকে তিনি ভালোবাসতেন, ইউরোপীয়দের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন, পশ্চিমা বিজ্ঞান ও দর্শনে প্রচুর লেখাপড়া ছিল তাঁর। আধুনিক পশ্চিমের রাজনৈতিক, আইনসংক্রান্ত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি, কিন্তু এটা মনে করেননি যে সেগুলোকে মিশরের মত গভীরভাবে ধর্মভিত্তিক দেশে পাইকারি হারে রোপণ করা সম্ভব– মিশরে আধুনিকীকরণের হার ছিল তীব্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে পরিকল্পিতভাবেই এর বাইরে রাখা হয়েছিল। আধুনিক আইনগত এবং সাংবিধানিক উদ্ভাবন সমূহকে প্রচলিত ইসলামী ধ্যান ধারণার সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট করা আবশ্যক যেন লোকে বুঝতে পারে। যে সমাজের মানুষ আইন বুঝতে পারে না কার্যতঃ সেটা আইনবিহীন দেশে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, *শুরাহ্* (পরামর্শ)র ইসলামী নীতি মুসলিমদের গণতন্ত্রের অর্থ বুঝতে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষারও সংস্কার প্রয়োজন। *মাদ্রাসার* ছাত্রদের আধুনিক বিজ্ঞান পাঠ করতে হবে যাতে করে তারা ইসলামী প্রেক্ষিতে মুসলিমদের আধুনিক বিশ্বে প্রবেশে সাহায্য করতে পারে, যা তাদের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে। কিন্তু শরিয়াহ্‌কে হালনাগাদ করে তুলতে হবে; এবং আবদু এবং তাঁর বয়কনিষ্ঠ সমসাময়িক সাংবাদিক রশিদ রিদা (১৮৬৫-১৯৩৫) জানতেন এটা এক দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। রিদা আরব বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের ক্রমবর্ধমান সেক্যুলারিজমে শঙ্কিত বোধ করেছিলেন। এঁরা মাঝে মাঝে ইসলামই জনগণকে পেছন দিকে টানছে মনে করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেন: রিদা মনে করেছেন, এতে কেবল *উম্মাহ্* আরও দুর্বল হয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সহজ শিকারে পরিণত হবে। রিদাই হচ্ছেন অন্যতম প্রধান মুসলিম যিনি সম্পূর্ণ আধুনিক অথচ সংস্কৃত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি এমন একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে ছাত্ররা *ফিক্‌হ* শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন, সমাজবিজ্ঞান, বিশ্ব ইতিহাস, ধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে পারবে। এর ফলে প্রকৃত আধুনিক প্রেক্ষিতে ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স উন্নতি লাভ করবে যা পূর্ব ও পশ্চিমের ঐতিহ্যকে একসূত্রে গাঁথবে আর কৃষিভিত্তিক আইন– শরিয়াহ্‌কে পশ্চিমে বিকশিত নতুন ধরনের সমাজের সঙ্গে মানানসই করে তুলবে।

সংস্কারকগণ ক্রমাগত অনুভব করছিলেন যে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের সমালোচনার উত্তর দেয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক বিষয়ের মত ধর্মক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য মুসলিমদের এজেন্ডা স্থির করে দিচ্ছিল। ভারতে কবি-দার্শনিক মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৬-১৩৩৮) জোর দিয়ে বললেন যে ইসলাম যেকোনও পশ্চিমা ব্যবস্থার মতই যুক্তিভিত্তিক। প্রকৃতপক্ষে, এটা প্রচলিত অন্যসব কনফেশনাল ধর্মবিশ্বাসের মাঝে

সবচেয়ে যৌক্তিক এবং প্রাগ্রসর। এর কঠোর একেশ্বরবাদীতা মানব জাতিকে কিংবদন্তী হতে মুক্তি দিয়েছে আর কুরান মুসলিমদের তাগিদ দিয়েছে গভীরভাবে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে, পর্যবেক্ষণের ফল নিয়ে চিন্তা করতে বলেছে আর কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করতে বলেছে। এভাবে আধুনিকতার জন্মদানকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেতনা আসলে ইসলাম থেকেই উদ্ভূত। এটা ছিল ইতিহাসের আংশিক এবং অযথার্থ ব্যাখ্যা, তবে এসময়ে খিষ্টধর্মকে উন্নত ধর্ম এবং ইউরোপকে প্রগতির চিরন্তন ধ্বজাধারী বলে মনে করার পাশ্চাত্য প্রবণতার চেয়ে খুব বেশী পক্ষপাতপূর্ণ নয় মোটেই। ইসলামের যৌক্তিক চেতনার প্রতি ইকবালের গুরুত্ব আরোপ তাঁকে সুফিবাদের নিন্দাবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। নতুন ধারাকে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে ভিন্ন হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন যা মুসলিম বিশ্বে ক্রমাগত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, আধুনিক যুক্তিবাদকেই যেহেতু সামনে এগোনোর একমাত্র উপায় বলে মনে হয়েছে। পশ্চিমা ধ্যান ধারণায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন ইকবাল, লন্ডনে পিএইচ.ডি. করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে পাশ্চাত্য ধারাবাহিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে অগ্রগতিকে বেগবান করেছে; এর সেক্যুলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিত্বের ধারণাকে ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন করে একে বহুঈশ্বরবাদী এবং আশঙ্কাজনকভাবে অশুভ করে তুলেছে। পরিণামে পাশ্চাত্য শেষ পর্যন্ত আপন ধ্বংসকেই ডেকে আনবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এটা উপলব্ধি করা কঠিন কিছু নয়, যাকে ইউরোপের সম্মিলিত আত্মহত্যা হিসাবে দেখা যেতে পারে। সুতরাং মুসলিমদের জগৎসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে নয় বরং শরিয়াহর আদর্শসমূহকে বাস্তবায়িত করতে পারবে এমন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে জীবনে ঐশ্বরিক মাত্রা লক্ষ্য করার এক গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে।

এতক্ষণ আমরা যেসব সংস্কারকদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি তাঁরা প্রধানত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এবং মূলতঃ শিক্ষিত অভিজাতদের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য রেখেছেন। মিশরে তরুণ স্কুলশিক্ষক হাসান আল-বান্না (১৯০৬-৪৯) এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা তাঁদের ধারণাসমূহকে জনগণের কাছে পৌছে দিয়েছে। দ্য সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদার্স গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এক গণআন্দোলনের রূপ নেয় এবং সেটাই ছিল একমাত্র আদর্শবাদ যা সেই সময় সমাজের সকল ক্ষেত্রে আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। আল-বান্না জানতেন, মুসলিমদের পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের সংস্কার সাধন করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য সমাজ সংস্কারকের মত তিনিও বিশ্বাস করেছেন যে একে অবশ্যই আধ্যাত্মিক সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি চলতে হবে। আল-বান্না যখন দেখেন যে ব্রিটিশরা সুয়েয খাল অঞ্চলে বিলাসী জীবনযাপন করছে, তখন মিশরীয় শ্রমিকদের মানবেতর জীবনযাপনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। একে তিনি ধর্মীয় সমস্যা হিসাবে দেখেছেন যার ইসলামী সমাধান প্রয়োজন। ক্রিশ্চানরা যেখানে প্রায়শই মতবাদসমূহের পরিমার্জনার মাধ্যমে

আধুনিকতার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে. মুসলিমরা সেটা করেছে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়াসের (*জিহাদ*) মাধ্যমে। আল-বান্না জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসলাম সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা: ধর্মকে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত রাখা যাবে না, পাশ্চাত্য যেমন চেষ্টা করেছে। তাঁর সোসায়েটি নতুন যুগের চেতনার উপযোগি হওয়ার জন্যে কুরানকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছে. চেষ্টা করেছে ইসলামী জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের: সামাজিক ন্যায়-বিচারের মান-উন্নয়ন. নিরক্ষরতা আর দারিদ্র্য বিমোচন এবং মুসলিমদের জমি বিদেশী আধিপত্যের কবল থেকে উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছে। উপনিবেশবাদীদের অধীনে মুসলিমরা হয়ে পড়েছিল উন্মূল। যতদিন তারা অন্যদের অনুকরণ করে চলবে ততদিন পর্যন্ত তারা সাংস্কৃতিক সংকর হয়ে থাকবে। ব্রাদার এবং সিস্টারদের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা আর কুরান-অনুযায়ী জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি আল-বান্না স্কুল নির্মাণ করেছেন. আধুনিক স্কাউট আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন. শ্রমিকদের জন্যে নৈশ স্কুল আর সরকারী চাকুরির উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে টিউটোরিয়াল কলেজ পরিচালনা করেছেন। দ্য ব্রাদার্স গ্রামাঞ্চলে ক্লিনিক এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে: কারখানা নির্মাণ করেছে. যেখানে মুসলিমরা সরকারী খাতের তুলনায় বেশী হারে বেতন. স্বাস্থ্য বীমা আর ছুটি পেত; এবং মুসলিমদের অধিকার রক্ষায় সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে আধুনিক শ্রম আইন শিক্ষা দিয়েছে।

সোসায়েটির ত্রুটিও ছিল। ছোট একটা গ্রুপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত ছিল যা এর বিলুপ্তি ডেকে এনেছিল প্রায় (যদিও ভিন্ন প্রয়াসের অধীনে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে)। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য –১৯৪৮ নাগাদ যা কয়েক মিলিয়ন মুসলিমে দাঁড়িয়েছিল –এইসব অপকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানত না. তারা তাদের কল্যাণ ও ধর্মীয় কার্যক্রমকে প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচনা করেছে। সোসায়েটির ত্বরিৎ সাফল্য দেখায় যে– যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিশরের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল– সিংহভাগ জনগণ আধুনিক এবং ধার্মিক হতে চায়. বুদ্ধিজীবীগণ বা সেক্যুলার সরকারসমূহ যেমনটিই মনে করুক না কেন। এই ধরনের সামাজিক কার্যক্রম বহু আধুনিক ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যে পরণত হয়েছিল যার অন্যতম হচ্ছে গাযায় শেখ আহমেদ ইয়ামিন প্রতিষ্ঠিত মুজামাহ্ (ইসলামীক কংগ্রেস) যা ১৯৬৭-র জুন মাসে সংঘটিত যুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক দখল করে নেয়া অঞ্চলে প্যালেস্টাইনীদের কাছে আধুনিকতার সুবিধাদি পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামী প্রেক্ষিতে একইরকম কল্যাণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র কী?

ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা এবং ইউরোপের সঙ্গে সংঘাত ইসলামী সমাজকে স্থানচ্যুত করে দিয়েছিল। অপরিবর্তনীয়ভাবে বদলে গিয়েছিল পৃথিবী। পাশ্চাত্যের প্রতি কীভাবে সাড়া দেয়া উচিত মুসলিমদের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কেননা চ্যালেঞ্জটা ছিল নজীরবিহীন। মুসলিমদের যদি আধুনিক বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ অংশীদার হিসাবে অংশগ্রহণ করতে হয় সেক্ষেত্রে তাদের এসব পরিবর্তন আত্মস্থ করতে হত। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য রক্ষণশীল ধর্মের প্রতিবদ্ধকতা হতে সরকার, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে রক্ষা করার জন্যে ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন বলে আবিষ্কার করেছিল। ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ধর্মের প্রতি আনুগত্যের স্থান দখল করেছিল, যা এর সমাজগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে সক্ষম করেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই নিরীক্ষা সমস্যাসঙ্কুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপের জাতি রাষ্ট্রগুলো ১৮৭০-এ এক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় যা শেষ পর্যন্ত দু-দুটো বিশ্ব-যুদ্ধ ডেকে আনে। সেক্যুলার আদর্শসমূহও পুরনো ধর্মীয় গোঁড়ামির মতই মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা নাৎসি হলোকাস্ট আর সোভিয়েত গুলাগে (Gulag) স্পষ্ট হয়ে গেছে। আলোকনপর্বের *ফিলোসোফেদের (Philosophes)* ধারণা ছিল যে মানুষ যত শিক্ষিত হয়ে উঠবে ততই তারা যুক্তিবাদী ও সহিষ্ণু হবে। এ আশা প্রাচীনকালের যেকোনও মেসিয়ানিক কল্পনার মতই শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আধুনিক সমাজ গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে এবং তা মোটামুটিভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের জীবন অনেক বেশী ন্যায়ভিত্তিক এবং সাম্যবাদী করে তুলেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের জনগণ গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে শত শত বছর সময় পেয়েছিল। কিন্তু এখনও প্রবলভাবে কৃষিপ্রধান বা অপরিণত আধুনিক সমাজে আধুনিক পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আধুনিক রাজনৈতিক ডিসকোর্সকে উপলব্ধির অতীত বলে মনে করে।

রাজনীতি কখনওই ক্রিশ্চান ধর্মীয়বোধের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। অন্তত জেসাস বলেছিলেন তাঁর রাজ্য-এ জগতের নয়। শত শত বছর ধরে ইউরোপের ইহুদিরা নীতিগতভাবে রাজনৈতিক সংশ্রব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মুসলিমদের কাছে রাজনীতি গৌণ বিষয় নয়। আমরা দেখেছি বরং এটাই তাদের

ধর্মীয় অনুসন্ধানের নাট্যশালা। মোক্ষলাভের অর্থ পাপের মোচন নয়, বরং ন্যায় বিচারভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে ব্যক্তি অধিকতর সহজভাবে তার সমগ্র সত্তার অস্তিত্ব সমর্পণ করতে পারবে, যা পূর্ণতা বয়ে আনবে। সুতরাং রাজনীতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এবং গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে একটা প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্রমাগত প্রয়াস চালানো হয়েছে। কাজটা সবসময়ই কঠিন ছিল। এটা এমন এক আকাঙ্ক্ষা যার জন্য প্রয়োজন *জিহাদ*–এই সংগ্রাম কোনও সাধারণ ফলাফল বয়ে আনে না।

তাওহীদের আদর্শকে যেন সেক্যুলারিজমের আদর্শের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়েছে, অথচ অতীতে শিয়া ও সুন্নী উভয়েই ধর্ম ও রাজনীতিক পার্থক্য মেনে নিয়েছিল। বাস্তবভিত্তিক রাজনীতি গোলযোগপূর্ণ এবং প্রায়শই নিষ্ঠুর হয়ে থাকে; আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র অনায়াস প্রয়োগযোগ্য কোনও "সহজ বিষয়" নয় বরং রাজনীতির কঠোর বাস্তবতায় কুরানের সমতার আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল মেধা এবং শৃঙ্খলা প্রয়োজন। পশ্চিমারা যেমন কখনও কখনও মনে করে যে, ইসলামই একটি আধুনিক ও সেক্যুলার রাষ্ট্র গড়ে তোলার পথে মুসলিমদের পক্ষে অন্তরায়, কথাটা সত্যি নয়। এটাই বরং সত্যি যে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা মুসলিম বিশ্বে একেবারে ভিন্ন ধরনের ছিল। পাশ্চাত্যে এটা সাধারণভাবে কোমল হিসাবে দেখা বা অনুভূত হয়েছে। গোড়ার দিকে জন লকের (John Locke, ১৬৩২-১৭০৪) মত দার্শনিকগণ একে ধার্মিক হবার নতুন উন্নত পথ হিসাবে কল্পনা করেছিলেন, কেননা এতে করে ধর্ম নিপীড়ক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হয়েছিল এবং ধর্মকে এর আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহের প্রতি আরও বিশ্বস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজম প্রায়শই ধর্ম এবং ধার্মিকের ওপর তীব্র কঠিন আক্রমণের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেমন, উদাহরণস্বরূপ, আতাতুর্ক সকল *মাদ্রাসা* বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সুফি মতবাদ দমন করেছেন, এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে বাধ্য করেছেন আধুনিক পোশাক পরার জন্যে। এ জাতীয় নিপীড়ন সবসময়ই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। টার্কিতে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, স্রেফ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল। মুহাম্মদ আলীও মিশরীয় উলেমাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তাঁদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছেন এবং তাঁদেরকে প্রভাব বঞ্চিত করেছেন। পরে জামাল আবদ আল-নাসের (১৯১৮-৭০) কিছু সময়ের জন্যে পুরোদস্তুর জঙ্গিরূপে অ্যান্টি ইসলামীতে পরিণত হয়েছিলেন, দমন করেছেন মুসলিম ব্রাদারহুডকে। সোসায়েটির সন্ত্রাসী অংশের সঙ্গে জড়িত ব্রাদার্সের একজন সদস্য, নাসেরের জীবননাশের প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু ব্রাদার্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ হাজার হাজার সদস্য আল-নাসেরের নির্যাতন শিবিরে বছরের পর বছর নির্জীব হয়ে পড়লেও লিফলেট বন্টন বা সভা আহবানের প্রয়াসের চেয়ে জ্বালাময়ী কিছু করতে যায়নি তারা। ইরানে পাহ্‌লভী রাজাগণও তাঁদের সেক্যুলারিজমের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর ছিলেন। রেযা শাহ্ পাহ্‌লভী (১৯২১-৪১

পর্যন্ত শাসন করেন) উলেমাদের তাঁদের বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং এক সিভিল ব্যবস্থাকে শরিয়াহ্‌র স্থলাভিষিক্ত করেছেন। হুসেইনের সম্মানে আশুরার উৎসব বাতিল ঘোষণা করেন তিনি এবং ইরানিদের জন্যে হজ্জে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ইসলামী পোশাক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়: রেযার সৈন্যরা বেয়োনেট দিয়ে মহিলাদের বোরখা ছিঁড়ে ফেলত আর রাস্তায় ফেলে টুকরো টুকরো করত। ১৯৩৫-এ মাশাদে অষ্টম ইমামের সমাধিতে প্রতিবাদকারীরা পোশাক-আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেলে সৈন্যরা নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলি বর্ষণ করে, ফলে শত শত প্রাণহানি ঘটে। ইরানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার স্বাদ লাভকারী উলেমাগণ তাঁদের প্রভাব হ্রাস দেখতে বাধ্য হন। কিন্তু সংসদীয় সভায় রেযাকে আক্রমণকারী পুরোহিত আয়াতোল্লাহ্ মুদ্দারিস ১৯৩৭-এ শাসকদলের হাতে নিহত হন, ফলে উলেমাগণ প্রতিবাদের সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। রেযার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ রেযা শাহ্ (১৯৪৪-৭৯ পর্যন্ত শাসন করেন) ইসলামের প্রতি সমান বৈরী আর অসন্তুষ্ট বলে প্রমাণিত হন। শাসকের বিরুদ্ধে সাহস করে প্রতিবাদ বিক্ষোভে নেমে আসা শত শত মাদ্রাসা-ছাত্রকে রাজপথে গুলি করে মারা হয়, মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং উলেমাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়, কারারুদ্ধ কিংবা নির্বাসনেও পাঠানো হয়েছিল তাঁদের। এই সেক্যুলার শাসনে গণতান্ত্রিক বলে কিছু ছিল না। শাহ্'র গুপ্তপুলিশ বাহিনী SAVAK বিনাবিচারে ইরানিদের কারারুদ্ধ করেছে, তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করেছে এবং প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কোনও সম্ভাবনাই সেখানে ছিল না।

জাতীয়তাবাদ, বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে এসে খোদ ইউরোপীয়রাই যা থেকে সরে যেতে শুরু করেছিল, সেটাও সমস্যামূলক বলে দেখা গেছে। উম্মাহ্‌র ঐক্য দীর্ঘদিন ধরে এক মূল্যবান আদর্শ ছিল; এবার মুসলিম বিশ্ব রাজ্য আর প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হয়ে গেল, যাদের সীমান্ত পাশ্চাত্য শক্তিগুলো নিজেদের ইচ্ছা মাফিক স্থির করে দিয়েছিল। মুসলিমরা যেখানে নিজেদের অটোমান নাগরিক এবং দার আল-ইসলামের সদস্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল সেখানে একটা জাতীয় চেতনা গড়ে তোলা সহজ ছিল না। কখনও কখনও জাতীয়তাবাদ হিসাবে যা উপস্থাপিত হতে দেখা যায় সেটা একেবারেই নেতিবাচক একটা রূপ গ্রহণ করে, পাশ্চাত্যেকে বাতিল করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় তা। নতুন গড়ে ওঠা জাতিগুলোর কোনও কোনওটি গঠনই এমন ছিল যে নাগরিকদের মাঝে টানাপোড়েন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুদানের দক্ষিণ অংশ প্রধানত ক্রিশ্চান অধ্যুষিত এলাকা, অন্যদিকে উত্তরাঞ্চল মুসলিম প্রধান। নিজেদের পরিচয় ধর্মের ভিত্তিতে তুলে ধরায় অভ্যস্ত জাতির পক্ষে একটা সাধারণ সুদানিজ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা কঠিনই বটে। এ সমস্যা লেবাননে আরও প্রকট ছিল, এখানে দেশবাসী অন্তত: তিনটি ধর্মীয় গোষ্ঠী– সুন্নী, শিয়া এবং ম্যারোনাইট ক্রিশ্চান-তে বিভক্ত, যারা আবার আগে স্বায়ত্তশাসিত ছিল। ক্ষমতার ভাগাভাগি

অসম্ভব ব্যাপার বলে প্রমাণিত হয়েছে। ডেমোগ্রাফিক টাইম বম্ব গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে গেছে (১৯৭৪-৯০), যার পরিণামে দেশটি দুঃখজনকভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অন্যান্য দেশে, যেমন সিরিয়া, মিশর কিংবা ইরাকে, জাতীয়তাবাদ সংখ্যালঘু অভিজাতদের গৃহীত মতবাদ, অধিকতর রক্ষণশীল জনগণ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি। ইরানে পাহলভীদের জাতীয়তাবাদ সরাসরি ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল, কেননা তা শিয়া মতবাদের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশটিকে প্রাচীন প্রাক-ইসলামী প্যাগান সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছে।

গণতন্ত্রও সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। সংস্কারকদের মাঝে যাঁরা ইসলামী কাঠামোতে আধুনিকতাকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা তুলে ধরেছেন যে গণতন্ত্রের আদর্শ খোদ ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন নয়। ইসলামী আইন *শুরাহ্* (পরামর্শ) এবং *ইজমাহ্*কে উৎসাহিত করে, যেখানে আইন-কানুনকে অবশ্যই *উম্মাহ্*র জনপ্রতিনিধিশীল অংশের "ঐকমত্য" দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। *রাশিদুন*গণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসবই গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে মানানসই। সমস্যার অংশ বিশেষ নিহিত রয়েছে পাশ্চাত্য প্রণীত গণতন্ত্রে যেখানে "সরকার জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্যে"। ইসলামে জনগণ নয়, ঈশ্বর কোনও সরকারের বৈধতা দান করেন। মানুষের উন্নীত অবস্থান বহুঈশ্বরবাদ (*শিরক*) বলে মনে হতে পারে যেহেতু তা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ। কিন্তু পাশ্চাত্য স্লোগানের অনুসরণ না করেও মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়নি। তবে গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবক্ষেত্রে প্রায়শ অপব্যবহৃত হয়েছে। ১৯০৬-এ ইরানি জনগণ সাংবিধানিক বিপ্লবের পর *মজলিস* (সংসদ) গঠন করে, রাশানরা তা রদ করার বেলায় শাহ্‌কে সহযোগিতা দিয়েছিল। পরে, ১৯২০-এর দশকে ব্রিটিশরা যখন ইরানকে প্রটেক্টরেটে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পায়, আমেরিকানরা লক্ষ্য করে যে তারা প্রায়ই নির্বাচনে নিজেদের পক্ষে ফলাফল টানার জন্যে কারচুপির আশ্রয় নিচ্ছে। পরবর্তী সময়ে রেযা শাহ্ যখন তাঁর আধুনিকীকরণ কর্মসূচি কার্যকর করার জন্যে কেবল *মজলিস*ই রদ করেননি, বরং ইরানের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন, তখন তাঁর প্রতি আমেরিকার সমর্থন এই ধারণা দিয়েছে যে গণতন্ত্রের মানবাধিকার নিশ্চিত করার বেলায় ডাবল স্ট্যান্ডার্ড অনুসৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্য এর জনগণের জন্যে সগর্বে গণতন্ত্রের ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু মুসলিমরা নিষ্ঠুর স্বৈরাচারদের কাছে মাথা নত করবে, এটাই আশা করা হয়েছে যেন। মিশরে ১৯২৩ থেকে ১৯৫২ সময়কালের মধ্যে সতেরটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, প্রতিবারই জনপ্রিয় ওয়াফদ্ পার্টি জয় পেয়েছে, কিন্তু ওয়াফদ্ মাত্র পাঁচবার শাসন করার অনুমতি পেয়েছিল। ব্রিটিশ কিংবা মিশরের রাজা তাদের ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করেছিল।

সুতরাং ধর্মকে ব্যক্তিপর্যায়ে ঠেলে দেবে এমন গণতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্র গঠন মুসলিমদের জন্যে কঠিন। অন্য সমাধানগুলোকে খুব সুবিধাজনক মনে হয়নি।

১৯৩২-এ প্রতিষ্ঠিত কিংডম অভ সৌদি আরাবিয়া ওয়াহহাবি আদর্শে বিশ্বাসী। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংবিধান অপ্রয়োজনীয়, কেননা সরকারের ভিত্তি হচ্ছে কুরানের আক্ষরিক পাঠ। কিন্তু কুরানে আইনের পরিমাণ খুবই কম এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর পরিপূরক হিসাবে সব সময়ই জটিল জুরেসপ্রুডেন্স প্রয়োজন বলে দেখা গেছে। সৌদীরা দাবী করে যে তারা আরবীয় পেনিনসূলার আদি ইসলামের উত্তরাধিকারী এবং *উলেমা*গণও রাষ্ট্রের বৈধতা মেনে নিয়েছেন; বিনিময়ে রাজাগণ রক্ষণশীল ধর্মীয় মূল্যবোধ চাপিয়ে দিয়েছেন। নারীদের বোরখার মাধ্যমে আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন রাখা হচ্ছে (যদিও পয়গম্বরের আমলে ব্যাপারটি এমন ছিল না), জুয়া ও অ্যালকোহল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, চুরির অপরাধে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদের মত ঐতিহ্যবাহী শাস্তি আইন ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করা হয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র এবং সংগঠন মনে করে না যে কুরানের প্রতি আনুগত্য রক্ষার জন্যে এধরনের প্রাক-আধুনিক শাস্তি ব্যবস্থার জরুরিত্ব আছে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলিম ব্রাদারহুড একেবারে গোড়া থেকেই সৌদীদের ইসলামী শাস্তি প্রয়োগকে অযথার্থ আর সেকেলে বলে নিন্দা জানিয়েছে, বিশেষ করে যেখানে শাসক গোষ্ঠীর বিপুল সম্পদ আর সম্পদের অসম বন্টন কুরানের আরও গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের বিপক্ষে দাঁড়ায়।

পাকিস্তান ছিল আরেকটি আধুনিক ইসলামী নিরীক্ষা। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮) আধুনিক সেক্যুলার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। সেই আউরেঙজিবের আমল থেকেই ভারতের মুসলিমরা নিরাপত্তাহীনতার বোধে ভুগে আসছিল, অসন্তুষ্ট ছিল তারা: নিজেদের পরিচয় নিয়ে আতঙ্কে ছিল তারা, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ কর্তৃক উপমহাদেশ বিভক্ত হবার পর এ অবস্থা আরও তীব্র হয়ে ওঠে, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখা দেয়, উভয় পক্ষেই হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। জিন্নাহ্ এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন মুসলিমরা যেখানে তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের দ্বারা পরিচিত হবে না বা বাধগ্রস্থ হবে না। কিন্তু ইসলামী প্রতীক ব্যবহারকারী মুসলিম রাষ্ট্র যদি "সেক্যুলার" হতে চায় কী মানে দাঁড়ায় তাহলে? আবুল আলা মাওদুদি (১৯০৩-৭৯) প্রতিষ্ঠিত জামাত-ই ইসলামী শরিয়াহ্ বিধিমালার কঠোর প্রয়োগের জন্যে চাপ দিয়েছিল এবং ১৯৫৬-তে ঘোষিত সংবিধান পাকিস্তানকে অনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী রিপাবলিক পরিচয় দেয়। এক আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেছিল এটা, যাকে এবার দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ধারণ করতে হবে। জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের সরকার ছিল আমাদের ইতিমধ্যে আলোচিত আগ্রাসী সেক্যুলার মতবাদের একটা সাধারণ উদাহরণ। তিনি ধর্মীয় সম্পদ (*ওয়াকফ*) জাতীয়করণ করেন, *মাদ্রাসা* শিক্ষায় বাধানিষেধ আরোপ করেন এবং নিখাদ সেক্যুলার আইনী ব্যবস্থায় উৎসাহ যোগান। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপযোগী সিভিল ধর্মে পরিণত করা, কিন্তু এতে অনিবার্যভাবে ইসলামপন্থীদের সঙ্গে টানাপোড়নের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত খানের পতন ডেকে আনে।

১৯৭০-র দশকে ইসলামপন্থী শক্তিগুলো সরকারের প্রধান বিরোধী পক্ষে পরিণত হয় এবং বামপন্থী সেক্যুলারিস্ট প্রধানমন্ত্রী জুলফাকির আলী ভূট্টো (১৯৭১-৭৭) অ্যালকোহল ও জুয়া নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের শান্ত করার প্রয়াস পান। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। ১৯৭৭-এর জুলাইয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিম মুহাম্মদ যিয়া আল-হক এক সফল অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন এবং অধিকতর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পোশাক পুনর্বহাল করেন, ইসলামী ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক আইন ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট যিয়াও এমনকি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, যেখানে তাঁর নীতিমালা স্পষ্টতই সেক্যুলারিস্ট ছিল। ১৯৮৮-তে এক বিমান দুর্ঘটনার তাঁর মৃত্যুর পর থেকে পাকিস্তানি রাজনীতিতে জাতিগত বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে বৈরিতা আর দুর্নীতি দেখা দেয় এবং প্রভাব হারায় ইসলামপন্থীরা। পাকিস্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে, জনজীবনেও এর উপস্থিতি ব্যাপক; কিন্তু তারপরেও মূল রাজনীতিকে তা প্রভাবিত করতে পারছে না। আপোসের ব্যাপারটি আব্বাসীয় ও মঙ্গোলদের সমাধানেরই স্মারক, যারা ক্ষমতার অনুরূপ বিচ্ছিন্নতা প্রত্যক্ষ করেছিল। রাষ্ট্র যেন ইসলামী শক্তিগুলোকে পথে আনতে বাধ্য করেছে, কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম আদর্শের চেয়ে বহুদূর। ভারতের মত পারমাণবিক অস্ত্রখাতে বেহিসাবী অর্থ ব্যায়িত হচ্ছে যেখানে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সীমাহীন দারিদ্র্যতায় শেষ হয়ে যাচ্ছে– এই পরিস্থিতি প্রকৃত মুসলিম অনুভূতির কাছে ঘৃণ্য। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতিত বোধকারী মুসলিমরা প্রতিবেশী আফগানিস্তানের মৌলবাদী তালিবান সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

মুসলিমরা এখনও বিংশ শতাব্দীর উপযোগী আদর্শ রাজনীতির সন্ধান পায়নি বলে ইসলাম আধুনিকতার সঙ্গে মানানসই বলা যাবে না। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ইসলামী আদর্শকে স্থাপন করা এবং সঠিক নেতৃত্বের সন্ধান মুসলিমদের গোটা ইতিহাস জুড়ে আলোড়িত করে এসেছে। কারণ যেকোনও ধর্মীয় মূল্যবোধের মত প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা দুর্জ্ঞেয়, একে কখনও মানবীয় ভাষায় সঠিকভাবে প্রকাশ করা যাবে না এবং তা সবসময় মানুষের নাজুক ও ত্রুটিময় উপলব্ধির অতীত হয়ে যাবে। ধর্মীয় জীবন কঠিন, আধুনিক সংস্কৃতির সেক্যুলার যুক্তিবাদ অন্য সকল প্রধান ট্র্যাডিশনের মানুষের জন্যে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। রাজনীতির চেয়ে মতবাদসমূহের প্রতি অধিক মনোযোগী ক্রিশ্চানরাও আজকাল আধুনিক ভাবধারায় তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বাঙ্ময় করে তোলার জন্যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে, কেউ কেউ ধর্মের পুরনো নিয়মাচার আঁকড়ে ধরছে, অন্যরা আরও রেডিক্যাল সমাধান খুঁজে নিচ্ছে। কখনও কখনও এইসব আলোচনা যন্ত্রণাদায়ক এমনকি তিক্ততার জন্ম দেয়, কেননা এসব ইস্যু খ্রিস্টীয় দর্শনের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত ধার্মিকতার মর্মমূল স্পর্শ করে। আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে সংগ্রাম এই দোদুল্যমানতার

মুসলিম সমরূপ। সকল ধার্মিক জাতিকে যেকোনও যুগে সেই সময়ের বিশেষ আধুনিকতার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্যে তাদের ট্রাডিশনকে প্রস্তুত করতে হয়। একটি আদর্শ মুসলিম সরকারের অনুসন্ধানকে পথবিচ্যুতি হিসাবে দেখা উচিত হবে না বরং একে অত্যাবশ্যকীয় এবং যথার্থ ধর্মীয় কার্যক্রম বলেই ধরে নিতে হবে।

মৌলবাদ

পশ্চিমা গণমাধ্যম প্রায়শ "মৌলবাদ" হিসাবে পরিচিত যুদ্ধংদেহী এবং কখনও কখনও সহিংস ধার্মিকতাকে একেবারেই ইসলামী ব্যাপার বলে ধারণা দিয়ে থাকে। আসল ব্যাপার তা নয়। মৌলবাদ এক বিশ্বজনীন ব্যাপার এবং আমাদের আধুনিকতার সমস্যাদির প্রতি সাড়া হিসাবে সকল প্রধান ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হয়েছে। মৌলবাদী জুডাইজম যেমন আছে, মৌলবাদী ক্রিশ্চানিটিও আছে, মৌলবাদী হিন্দুধর্মমত, মৌলবাদী বুদ্ধধর্ম, মৌলবাদী শিখধর্ম এবং এমনকি মৌলবাদী কনফুসিয়বাদ পর্যন্ত আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিশ্চান জগতে প্রথম এধরনের ধর্মবিশ্বাস আবির্ভূত হয়েছিল। এটা কোনও ঘটনাচক্রের সংঘটন ছিল না। মৌলবাদ কোনও মনোলিথিক আন্দোলন নয়, মৌলবাদের প্রত্যেকটা রূপ (form), এমনকি একই ট্র্যাডিশনে হলেও, স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়, এর নিজস্ব প্রতীক ও উদ্দীপনা থাকে, কিন্তু এর ভিন্নতর প্রকাশগুলো এক পারিবারিক সাদৃশ্যতা বহন করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পশ্চিমা আধুনিকতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চকিত প্রতিক্রিয়া হিসাবে কোনও মৌলবাদী আন্দোলন সূচিত হয় না, বরং আধুনিকতার ধারা বেশ খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পরই কেবল একটা রূপ নিতে শুরু করে। শুরুতে ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের ট্র্যাডিশনসমূহে সংস্কারের প্রয়াস পায়; আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে সেগুলোর সমন্বয় সাধন করতে চায়: যেমন মুসলিম সংস্কারবাদীদের করতে দেখেছি আমরা। কিন্তু যখন দেখা যায় যে এসব মধ্যপন্থী ব্যবস্থাগুলো ব্যর্থ হয়েছে, কেউ কেউ আরও চরম পন্থার আশ্রয় নেয় এবং এক মৌলবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। পেছনে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই যে আধুনিকতার শো-কেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই মৌলবাদ নিজের অস্তিত্ব প্রথম তুলে ধরবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল; এবং পরবর্তী সময়ে তা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে দেখা দিয়েছে। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের ভেতর প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই সবার শেষে মৌলবাদী ছোপ পড়েছে– ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে যখন মুসলিম বিশ্বে আধুনিক সংস্কৃতি শেকড় ছড়াতে শুরু করেছিল। এই সময়ের মধ্যে ক্রিশ্চান ও ইহুদিদের ভেতর মৌলবাদ বেশ ভালোভাবেই জাঁকিয়ে বসেছিল, যাদের আধুনিকতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ছিল দীর্ঘ সংস্রব।

সকল ধর্মবিশ্বাসের মৌলবাদী আন্দোলনের কতগুলো সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষায় ব্যর্থ আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি গভীর নৈরাশ্য আর মোহমুক্তির প্রকাশ ঘটায়। এগুলো প্রকৃত আতঙ্কও তুলে ধরে। আমার পর্যালোচিত প্রতিটি মৌলবাদী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সেক্যুলার প্রশাসন ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। সবসময় এটা অমূলক প্রতিক্রিয়া নয়। আমরা দেখেছি যে মুসলিম বিশ্বে খুবই আক্রমণাত্মকভাবে সেক্যুলারিজম আরোপ করা হয়েছে। মৌলবাদীরা অনুপ্রেরণা পাবার জন্যে আধুনিকতার হামলা-পূর্ব কালীন এক "স্বর্ণযুগে"র শরণাপন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু তারা পূর্বানুবৃত্তিমূলকভাবে (atavistically) মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করে না। সবগুলোই সহজাতভাবেই আধুনিক আন্দোলন এবং আমাদের কাল ছাড়া অন্য কোনও যুগে আবির্ভূত হবার উপায় নেই তাদের। সবগুলোই উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ধর্মের পুনঃব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রায়ই চরমপন্থী। সুতরাং মৌলবাদ আধুনিক প্রেক্ষাপটের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিকতা যখনই শেকড় ছড়ায়, একটা না একটা মৌলবাদী আন্দোলন তার সচেতন প্রতিক্রিয়া হিসাবেই পাশাপাশি উত্থিত হতে পারে। মৌলবাদীরা প্রায়ই তাদের ঐতিহ্যের সেইসব উপাদানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক কোনও পরিবর্তনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে যেগুলো এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। এরা সবাই–এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও–গণতন্ত্র এবং সেক্যুলারিজমের তীব্র সমালোচক। নারী-মুক্তি যেহেতু আধুনিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, মৌলবাদীরা প্রচলিত কৃষিভিত্তিক লিঙ্গ-ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে নারীদের অবগুণ্ঠনের আড়ালে ঘরে আটকে রাখতে চায়। মৌলবাদী গোষ্ঠীকে এভাবে আধুনিকতার ছায়া হিসাবে দেখা যেতে পারে; আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকও তুলে ধরতে পারে এটা।

সুতরাং মৌলবাদ এক প্রতীকী সম্পর্কের ভেতর দিয়ে নিপীড়ক সেক্যুলাজিমের সঙ্গে সহাবস্থান করে। মৌলবাদীরা সব সময়ই উদারনৈতিক বা আধুনিকীকরণ প্রশাসনের দ্বারা আক্রান্ত বোধ করে এবং পরিণামে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর আচরণ আরও চরম হয়ে ওঠে। টেনেসির বিখ্যাত স্কোপস ট্রায়ালের (১৯২৫) পর যখন প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা সরকারী স্কুলগুলোয় বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেয়া বন্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিল, সেক্যুলারিস্ট পত্রিকাগুলো তখন এমনভাবে তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করে যে তাদের থিওলজি আরও প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রবলভাবে আক্ষরিক হয়ে ওঠে এবং তারা রাজনৈতিক বলয়ের চরম বামপন্থী থেকে চরম ডানপন্থী দিকে সরে যায়। সেক্যুলারিস্ট আক্রমণ যখন অধিকতর সহিংস হয়ে উঠেছে, মৌলবাদী প্রতিক্রিয়ারও আরও তীব্র হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। মৌলবাদীরা, সুতরাং, সমাজের একটা ফাটল প্রকাশ করে, সেক্যুলার সংস্কৃতি উপভোগকারী এবং একে আতঙ্কের সঙ্গে বিবেচনাকারীদের মাঝখানে যা দেখা দেয়। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই শিবির ক্রমবর্ধমান হারে পরস্পরকে বুঝে উঠতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এভাবে

মৌলবাদ অভ্যন্তরীণ বিরোধ হিসাবে সূচিত হয়– কারও *নিজস্ব* সংস্কৃতি বা জাতির মধ্যকার উদারপন্থী বা সেক্যুলারিস্টদের সঙ্গে। প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম মৌলবাদীরা প্রায়শ পাশ্চাত্য বা ইসরায়েলের মত বহিঃশত্রুর বিরোধিতার চেয়ে স্বদেশবাসী বা সতীর্থ মুসলিমদের আধুনিকতা সম্পর্কে অধিকতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের বিরোধিতা করবে। ঝাঁটি ধর্মবিশ্বাসের একটা ছিটমহল সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলবাদীরা প্রায়ই প্রথমে সংস্কৃতির মূলধারা হতে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, জেরুজালেম বা নিউ ইয়র্কে আল্ট্রা-অর্থোডক্স ইহুদি জনগোষ্ঠীর ভেতর)। এরপর তারা কখনও কখনও মূলধারাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে পুনঃপবিত্রকরণের লক্ষ্যে এমন এক আক্রমণ পরিচালনার প্রয়াস পায় যার রূপ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মৌলবাদীদের সবার বিশ্বাস তারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই লড়ছে। এবং তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে বলে তারা মনে করতে পারে যে অচলাবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে লড়াই ছাড়া গত্যন্তর নেই তাদের। মানসিকতার এমন একটা পর্যায়ে, বিরল ক্ষেত্রে, কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় না, কিন্তু তারা অধিকতর প্রচলিত বৈধ উপায়ে ধর্মবিশ্বাসের পুনর্জাগরণের প্রয়াস পায় মাত্র।

ধর্মকে সাইডলাইন থেকে আবার মধ্যমঞ্চে ঠেলে আনার ব্যাপারে সফল হয়েছে মৌলবাদ, যার ফলে এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রধান ভূমিকা পালন করছে এটা। এমন একটা অবস্থা বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ছিল অচিন্তনীয়, যখন সেক্যুলারিজমকে অপ্রতিরোধ্য ঠেকেছিল। ১৯৭০-এর দশক থেকে ইসলামী বিশ্বে নিঃসন্দেহে এটাই ঘটেছে। কিন্তু মৌলবাদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনে ধর্মকে "ব্যবহার" করার সামান্য উপায়মাত্র নয়। এগুলো অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সেক্যুলারিস্টদের দ্বারা মানুষের জীবন থেকে ঈশ্বরের বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আধুনিক বিশ্বে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহের প্রাধান্য বিস্তারের পৌনঃপুনিক মরিয়া প্রয়াস। কিন্তু মৌলবাদকে উস্কে দেয়া হতাশা আর আতঙ্ক ধর্মীয় ট্র্যাডিশনকেও বিকৃত করতে চায় এবং সহিষ্ণুতা এবং সমন্বয়ের পক্ষাবলম্বনকারীদের বাদ দিয়ে অধিকতর আক্রমণাত্মক দিকগুলোকে উচ্চকিত করে তোলে।

মুসলিম মৌলবাদ এইসব সাধারণ বৈশিষ্টাবলীর সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং এটা কল্পনা করে নেয়া ঠিক হবে না যে ইসলামের অভ্যন্তরেই এক জঙ্গী ধর্মান্ধতার উপাদান রয়েছে মুসলিমদের যা আধুনিকতাকে প্রবল এবং সহিংসভাবে প্রত্যাখ্যানে প্ররোচিত করে। বিশ্বের অন্য সকল ধর্মবিশ্বাসের মৌলবাদীদের সঙ্গে মুসলিমদেরও মিল আছে, যারা আধুনিক সেক্যুলার সংস্কৃতির প্রতি তাদের গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে। একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিমরা মৌলবাদ (Fundamentalism) শব্দটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সঠিক যুক্তিতেই আপত্তি উত্থাপন করে থাকে যে আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরা গর্বের প্রতীক হিসাবে এর উৎপত্তি

ঘটিয়েছিল এবং সাধারণভাবে এ শব্দের আরবী অনুবাদ করা যায় না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, *উসূল* ইসলামী জুরেসপ্রুডেন্সের মৌলনীতিমালার কথা বলে এবং সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত, সকল মুসলিমই *উসূলিয়াহ'য়* (মৌলবাদ) বিশ্বাসী বলে মত দেয়া যেতে পারে। তা সত্ত্বেও, "মৌলবাদ"-এর সকল দুর্বলতা ছাপিয়ে এই শব্দটি প্রয়োগ করেই কেবল আমরা রণসজ্জিত ধর্মীয় আন্দোলনের সদস্যটির বর্ণনা দিতে পারি। এর চেয়ে সন্তোষজনক কোনও বিকল্প শব্দ উদ্ভাবন বেশ কঠিনই বটে।

মৌলবাদী আদর্শবাদীদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন পাকিস্তানে জামাত-ই ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওদুদি। তিনি দেখেছেন পাশ্চাত্যের প্রবল শক্তি ইসলাম ধ্বংসের লক্ষ্যে শক্তি সঞ্চয় করছে। মুসলিমদের উচিত, যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, এই আধিপত্যবাদী সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে অবশ্য অবশ্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা, যদি তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মুসলিমরা আগেও বৈরী সমাজের মোকাবিলা করেছে, ধ্বংসলীলা দেখেছে, কিন্তু আফগানির পর থেকে ইসলামী আলোচনায় (discourse) একটা নতুন সুর ঢুকে পড়েছিল। পাশ্চাত্যের হুমকি প্রথমবারের মত মুসলিমদের আত্মরক্ষার পর্যায়ে *ঠেলে* দিয়েছিল। মাওদুদি সব সেক্যুলারিস্ট নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেছেন: একটা ইসলামী মুক্তির থিওলজির প্রস্তাবনা রাখছিলেন তিনি। একমাত্র ঈশ্বরই যেহেতু সার্বভৌম, সুতরাং মানুষের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে কেউই বাধ্য নয়। ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল অধিকার বা ন্যায়সঙ্গত নয়, বরং তা অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। মাওদুদি এক বিশ্বজনীন *জিহাদের* আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঠিক পয়গম্বর যেমন করে *জাহিলিয়াহ'র* (প্রাক-ইসলামী কালের "অজ্ঞতা" ও বর্বরতা) বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, মুসলিমদেরও ঠিক সেভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিক *জাহিলিয়াহ* অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। মাওদুদি উল্লেখ করেছেন যে, *জিহাদই* ইসলামের মূলকথা (tenet)। এক নতুন উদ্ভাবন ছিল এটা। এর আগে কেউ কখনও দাবী করেনি যে *জিহাদ* ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের সমতুল্য, কিন্তু মাওদুদি মনে করেছেন যে বর্তমান জরুরি অবস্থায় এই উদ্ভাবন যুক্তিসঙ্গত। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অস্তিত্বহীনতার চাপ ও আতঙ্ক ধর্মকে অধিকতর চরম এবং সহিংস বিকৃতির দিকে *ঠেলে* দিয়েছে।

কিন্তু সুন্নী বিশ্বে ইসলামী মৌলবাদের প্রকৃত জন্মদাতা হলেন সায়ীদ কুতব (১৯০৬-৬৬), তাঁর ওপর মাওদুদির সীমাহীন প্রভাব ছিল। কিন্তু আদিতে চরমপন্থী ছিলেন না তিনি বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং সেক্যুলার রাজনীতির প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল তাঁর। এমনকি ১৯৫৩তে মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগ দেয়ার পরেও একজন সংস্কারকই রয়ে গিয়েছিলেন, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ইসলামী রূপ দেয়ার আশা করেছিলেন যাতে পূর্ণাঙ্গ সেক্যুলারিস্ট আদর্শবাদের বাড়তি উপাদানগুলো এড়ানো যায়। কিন্তু ব্রাদারহুডের সদস্য হওয়ার কারণে ১৯৫৬তে আল-নাসের কর্তৃক কারারুদ্ধ হন তিনি; এরপর নির্যাতন শিবিরে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে যান যে ধার্মিক ব্যক্তি আর সেক্যুলারিস্টদের পক্ষে একই সমাজে বসবাস সম্ভব নয়। ব্রাদার্স-এর

সদস্যদের ওপর চালানো নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ড এবং মিশরে ধর্মকে প্রান্তিক পর্যায়ে *ঠেলে* দেয়ার আল-নাসেরের অঙ্গীকার প্রত্যক্ষ করার সময় তিনি *জাহিলিয়াহ্‌র* সকল বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করেছেন, যাকে তিনি ধর্ম বিশ্বাসের চিরন্তন প্রতিপক্ষ বর্বরতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন; এজন্যে পয়গম্বর মুহাম্মদের(সঃ) অনুসরণে মুসলিমদের আমৃত্যু যুদ্ধ করা আবশ্যক। কুতব মাওদুদি থেকে আরও অগ্রসর হয়েছেন, কেবল অমুসলিম সমাজকেই *জাহিলি* হিসাবে দেখেছিলেন তিনি (মাওদুদি)। কুতব আরবের প্রাক-ইসলামী পর্যায়কে বর্ণনা করার জন্যে প্রচলিত মুসলিম ইতিহাস শাস্ত্রে ব্যবহৃত *জাহিলিয়াহ্‌* শব্দকে সমসাময়িক মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করেছেন। যদিও আল-নাসেরের মত একজন শাসক উপরে উপরে ইসলামের কথা বলেন, কিন্তু তাঁর কথা এবং কাজে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি একজন ধর্মত্যাগী, এবং মুহাম্মদ(সঃ) যেভাবে মক্কার পৌত্তলিক প্রশাসনকে (তাঁর আমলের *জাহিলিয়াহ্‌*) পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন ঠিক সেভাবে এধরনের সরকারকে উচ্ছেদ করা মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য।

আল-নাসেরের সহিংস সেক্যুলারিজম কুতবকে এমন এক ইসলাম প্রবর্তনের দিকে *ঠেলে* দিয়েছিল যা কুরানের বাণী এবং পয়গম্বরের জীবন, উভয়কেই বিকৃত করেছে। কুতব মুসলিমদের মুহাম্মদের(সঃ) আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে বলেছেন, নিজেদের সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়ার জন্যে বলেছেন {যেমন মুহাম্মদ(সঃ) করেছিলেন মক্কা থেকে মদীনায় *হিজরার* মাধ্যমে} এবং তারপর প্রবল *জিহাদে* যোগ দিতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ(সঃ) এক অনন্যসাধারণ অহিংস নীতি অনুসরণ করে বিজয় অর্জন করেছিলেন; ধর্মীয় ব্যাপারে বল প্রয়োগ এবং নিপীড়নের ঘোরতর বিরোধী কুরান এবং এর দর্শন– বিচ্ছিন্নতা ও বর্জনের শিক্ষা থেকে বহুদূরে– সহিষ্ণু ও গ্রহণের। কুতব জোর দিয়ে বলেছেন যে কেবল ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় এবং প্রকৃত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার *পরেই* কুরান জারিকৃত সহিষ্ণুতার ব্যাপারটি আসতে পরে। মৌলবাদী ধর্মের অন্তস্তলে বিরাজিত গভীর আতঙ্কে থেকেই নয়া নিরাপোস মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। কুতব রক্ষা পাননি। আল-নাসেরের ব্যক্তিগত জেদেই ১৯৬৬-তে তাঁর প্রাণ সংহার করা হয়।

প্রত্যেক সুন্নী মৌলবাদী আন্দোলনের ওপরই কুতবের প্রভাব রয়েছে। অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়ভাবে এটা মুসলিমদের আপন জাতির প্রতি নির্যাতনমূলক নীতিমালা প্রয়োগের কারণে *জাহিলি* শাসক হিসাবে আনোয়ার আল-সাদাতের মত শাসকদের হত্যায় অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৯৪-তে আফগানিস্তানে ক্ষমতা লাভকারী তালিবানরাও তাঁর আদর্শে প্রভাবিত। তাদের দৃষ্টিতে তারা ইসলামের মৌলরূপে প্রত্যাবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ। *উলেমারা* সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন, নারীরা অবগুণ্ঠনের আড়ালে আছে এবং পেশাগত জীবনে অংশ গ্রহণের অনুমোদন নেই তাদের। কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই প্রচারের অনুমোদন পাচ্ছে এবং পাথর ছোঁড়া ও অঙ্গচ্ছেদের মত ইসলামী শাস্তির পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। পশ্চিমের কোনও

কোনও বলয়ে তালিবানদের খাঁটি মুসলিম বলে মনে করা হয়, কিন্তু তাদের শাসনে অত্যাবশ্যকীয় ইসলামী নীতির লংঘন ঘটছে। তালিবানদের অধিকাংশ (*মদ্রাসার* "ছাত্র" এরা) পশতুন গোত্রের সদস্য এবং অ-পশতুনদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে চায় তারা–যারা দেশের উত্তরাংশ থেকে শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ছে। এরকম জাতিগত শত্রোনিজম পয়গম্বর এবং কুরান কর্তৃক নিষিদ্ধ। সংখ্যালঘু গ্রুপগুলোর ওপর তাদের নিষ্ঠুর আচরণও কুরানের নির্দেশের স্পষ্ট পরিপন্থী। নারীদের প্রতি প্রদর্শিত তালিবানদের বৈষম্যও পয়গম্বরের আচরণ এবং প্রথম উম্মাহ্‌র অনুশীলনের সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্য ধর্ম সম্পর্কে তাদের অতি বাছাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তালিবানরা বৈশিষ্ট্যগতভাবে মৌলবাদী, (যা পাকিস্তানের কোনও কোনও *মদ্রাসায়* তাদের সংকীর্ণ শিক্ষার প্রতিফলন দেখায়), ধর্মকে যা বিকৃত করে এবং প্রত্যাশিত পথের বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যায়। সকল প্রধান ধর্মবিশ্বাসের মত মুসলিম মৌলবাদীরা টিকে থাকার সংগ্রামে ধর্মকে নির্যাতন এমনকি সহিংসতার হাতিয়ারে পরিণত করে থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ সুন্নী মৌলবাদীরা এধরনের চরম পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেনি। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে জন্ম নেয়া মৌলবাদী আন্দোলনগুলোর সবক'টাই তাদের আশপাশের জগতকে অপেক্ষাকৃত কম ধ্বংসাত্মক অথচ কার্যকরভাবে বদলে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। ১৯৬৭তে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছয় দিনের যুদ্ধে আরবদের শোচনীয় পরাজয়বরণের পর গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার একটা প্রবণতা দেখা গেছে। আল-নাসেরের মত চরম সেক্যুলারিস্ট শাসকদের পুরনো সেক্যুলার নীতি অকার্যকর বলে মনে হয়েছে। জনগণ মনে করেছে যে ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত না হওয়ার কারণেই ব্যর্থ হয়েছে তারা। তারা লক্ষ্য করেছিল যে সেক্যুলারিজম এবং গণতন্ত্র পশ্চিমে চমৎকারভাবে কাজ করলেও সেগুলো সাধারণ মুসলিমদের কোনও উপকারে আসে না, বরং ইসলামী জগতের সংখ্যালঘু অভিজাত শ্রেণীই লাভবান হয়। মৌলবাদকে "উত্তর-আধুনিক" আন্দোলন হিসাবে দেখা যেতে পারে, যা ঔপনিবেশিকতাবাদের মত আধুনিকতার কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য এবং উদ্ভাবনাকে অস্বীকার করে। সমগ্র ইসলামীবিশ্ব জুড়ে ছাত্র এবং শ্রমিকরা তাদের প্রত্যক্ষ পরিপার্শ্ব পরিবর্তনের কাজ শুরু করে। তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারখানাগুলোয় মসজিদ নির্মাণ করেছে যাতে সেখানে *সালাত* আদায় করতে পারে এবং বান্না-কায়দায় ইসলামী পরিচয় সমৃদ্ধ কল্যাণমূলক সোসায়েটি গঠন করেছে। সেক্যুলারিস্ট সরকারের চেয়ে জনগণের কল্যাণে ইসলামই যে অগ্রসর সেটা প্রদর্শন করেছে। ছাত্ররা যখন কোনও উঠানের ছায়াঢাকা অংশকে– কিংবা কোনও নোটিসবোর্ডকেও– একটা ইসলামী এলাকা হিসাবে ঘোষণা দেয় তখন তারা ধরে নেয় যে সেক্যুলারিস্ট সমাজে উপেক্ষিত এবং অবনমিত ইসলামকে প্রান্তিক পর্যায় থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ক্ষুদ্র হলেও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া গেছে এবং বিশ্বের একটা অংশকে– যত ক্ষুদ্রই হোক– ইসলামের অংশে পরিণত করা গেছে।

তারা ইসরায়েলে ইহুদি মৌলবাদী, যারা অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন করার মাধ্যমে আরবভূমি দখল করে নিয়ে একে জুডাইজমের অন্তর্ভুক্ত করছে ঠিক তাদের মত করেই পবিত্রতার সীমানা সামনে ঠেলে দিচ্ছে।

ইসলামী পোশাকে প্রত্যাবর্তনের পেছনেও একই নীতিমালা কাজ করছে। এটা যখন জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়া হয় (তালিবানরা যেমন করেছে) তখন নির্যাতনমূলক হয়ে দাঁড়ায় এবং রেযা শাহ্ পাহ্লভীর আক্রমণাত্মক কৌশলগুলোর মত তীব্র পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু বহু মুসলিম নারী মনে করে অবগুণ্ঠন হচ্ছে প্রাক-উপনিবেশ আমলে প্রতীকী প্রত্যাবর্তন– যখন তাদের সমাজ প্রকৃত গতিপথ থেকে বিচ্যুত এবং বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু তারা স্রেফ ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয়নি। জরিপে দেখা গেছে পর্দাধারী নারীদের বিপুল অংশ লিঙ্গ প্রসঙ্গের মত বিষয়ে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। কোনও কোনও মহিলার ক্ষেত্রে –যারা গ্রামাঞ্চল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে এবং পরিবারের তারাই মৌলিক সাক্ষরতা অর্জনের গণ্ডি পেরুনো প্রথম সদস্য– ইসলামী পোশাক ধারণ ধারাবাহিকতার অনুভূতি যোগায় এবং আধুনিকতায় উত্তোরণকে অনেক কম যন্ত্রণাময় করে, যা অন্যভাবে কঠিন হত। তারা আধুনিক বিশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তবে সেটা তাদের নিজস্ব কায়দায় এবং ইসলামী প্রেক্ষিতে যা একে পবিত্র অর্থ দেয়। অবগুণ্ঠনকে আধুনিকতার কম ইতিবাচক দিকগুলোর তীব্র সমালোচনা হিসাবেও দেখা যেতে পারে। এটা যৌনতার বিষয়ে পাশ্চাত্যের "সব প্রকাশ করে দেয়া"র অদ্ভুত বাধ্যবাধকতাকে অগ্রাহ্য করে। পশ্চিমে মানুষ প্রায়ই তাদের তামাটে সুগঠিত দেহ বিশেষ অধিকারের প্রতীক হিসাবে প্রদর্শন করে থাকে, তারা বয়সের লক্ষণের উল্টোধারায় চলায় প্রয়াস পায় এবং এই জীবন আঁকড়ে থাকতে চায়। অবগুণ্ঠিত ইসলামী দেহ দেখায় যে তা দুর্জ্ঞেয়মুখী; পোশাকের সমরূপতা শ্রেণী বৈষম্য দূর করে এবং পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিপরীতে গোষ্ঠী বা সমাজের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়।

প্রায় সময়ই মানুষ আধুনিক ধ্যানধারণা ও উদ্দীপনাসমূহকে বোধগম্য করে তোলার কাজে ধর্মের ব্যবহার করে থাকে। যেমন উদাহরণস্বরূপ, ১৭৭৬-এর আমেরিকান বিপ্লবের সময় সকল আমেরিকান ক্যালভিনিস্ট ফাউন্ডিং ফাদারদের সেক্যুলারিস্ট আদর্শ অনুসরণ বা এমনকি বুঝতও না। তারা সংগ্রামকে একটা খ্রিস্টীয় রঙ দিয়েছিল যাতে জনগণ সেক্যুলারিস্টদের পাশাপাশি একটা নতুন পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে লড়তে পারে। শিয়া ও সুন্নী মৌলবাদীদের কেউ কেউও আধুনিক সংস্কৃতির অচেনা সুরকে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে ধর্মকে ব্যবহার করছে, একে আরও সুগম করে তোলার জন্যে অর্থের ও আধ্যাত্মিকতার একটা প্রেক্ষিত দিচ্ছে। আবার, তারা আভাসে জানিয়ে দিচ্ছে যে, পাশ্চাত্য নির্ধারিত শর্তের বাইরেও ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেও আধুনিক হওয়া সম্ভব। ১৯৭৮-৭৯'র ইরানি বিপ্লবকে এই আলোয় দেখা যেতে পারে। ১৯৬০-র দশকে আয়াতোল্লাহ্ রুহোল্লাহ্ খোমিনি

(১৯০২-৮৯) মুহাম্মদ রেযা শাহ্‌র বর্বর এবং অসাংবিধানিক নীতিমালার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে ইরানের জনগণকে রাজপথে বের করে এনেছিলেন। রেযা শাহ্‌কে কারবালায় হুসেইনের মৃত্যুর জন্যে দায়ী উমাইয়াহ্ খলিফা ইয়াযিদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তিনি– শিয়া ইসলামে অন্যায়প্রবণ শাসকের উদাহরণ। এই ধরনের একনায়কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মুসলিমদের দায়িত্ব। জনগণ, যারা হয়ত সোস্যালিস্টদের বিপ্লবের আহ্বানে আলোড়িত হত না, খোমিনির ডাকে সাড়া দিয়েছিল, যা তাদের গভীরতম ট্র্যাডিশনে অনুরণন তুলেছিল। শাহ্‌র সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের শিয়া বিকল্পের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিলেন খোমিনি; তাঁকে যেন বেশী বেশী করে একজন *ইমামের* মত মনে হচ্ছিল। সকল *ইমামের* মত আক্রান্ত হয়েছেন তিনি, কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং অন্যায়কারী শাসকের হাতে নিহত হতে যাচ্ছিলেন প্রায়; কোনও কোনও *ইমামের* মত নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছেন তিনি এবং তাঁকে আপন অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে; আলী এবং হুসেইনের মত সাহসিকতার সঙ্গে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তিনি এবং প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষ নিয়েছেন, সকল *ইমামের* মত সক্রিয় অতীন্দ্রিয়বাদী হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি; হুসেইনের মত, যাঁর পুত্রকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছিল, খোমিনির পুত্র মুস্তাফাকে শাহ্‌র লোকেরা হত্যা করেছিল।

আধা সরকারী পত্রিকা *এত্তেলাত*-এ খোমিনির নামে বানোয়াট অপমানকর আক্রমণ এবং এর প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসা তরুণ *মাদ্রাসা* ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যার পর ১৯৭৮-এ বিপ্লবে সূচিত হলে খোমিনি যেন গোপন ইমামের মত দূর থেকে (তার নির্বাসন স্থান নাজাফ) আন্দোলন পরিচালনা করছেন বলে মনে হয়েছে। সেক্যুলারিস্ট আর বুদ্ধিজীবীরাও *উলেমা*দের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী ছিলেন, কেননা তারা জানতেন যে খোমিনিই তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সমর্থন টানতে পারবেন। একমাত্র ইরানি বিপ্লবই বিংশ শতাব্দীর কোনও আদর্শবাদ অনুপ্রাণিত বিপ্লব (রাশিয়া ও চীনা বিপ্লব উভয়েই কাল মার্কস-এর ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত ছিল)। খোমিনি শিয়া মতবাদের একেবারে ভিন্নতর ব্যাখ্যা খাড়া করেছিলেন: গোপন ইমামের অনুপস্থিতিতে একমাত্র অতীন্দ্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত জুরিস্টই– যিনি পবিত্র আইন জানেন– বৈধভাবে জাতিকে পরিচালিত করতে পারেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী দ্বাদশবাদী শিয়ারা ধর্মীয় পুরহিতদের সরকারে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু বিপ্লবীরা (*উলেমা*দের বেশীসংখ্যক যদি নাও হয়) এই বেলায়েত-ই ফাকিহ্'র (জুরিস্ট-এর ম্যান্ডেট)[১] তত্ত্ব গ্রহণে আগ্রহী ছিল। বিপ্লবের পুরো সময়টায় কারবালার প্রতীক ছিল প্রভাবশালী। মৃতের জন্যে প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং হুসেইনের সম্মানে আশুরার উৎসব শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে রূপ নেয়। কাবরালার মিথ সাধারণ শিয়াদের শাহ্‌র অস্ত্রকে অগ্রাহ্য করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং তারা শয়ে শয়ে প্রাণ দিয়েছে, কেউ কেউ শহীদের শাদা পোশাকে আবৃত ছিল। ধর্ম এমন এক শক্তিশালী শক্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে যা

পাহলভী রাজ্যের পতন ঘটিয়েছে, যাকে কিনা মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু সকল মৌলবাদীর মত খোমিনির দর্শনও ছিল বিকৃতিপ্রবণ। তেহরানে আমেরিকানদের জিম্মি হিসাবে আটক (এবং পরে ইরানি উদাহরণে অনুপ্রাণিত লেবাননের শিয়া চরমপন্থীদের হাতে আমেরিকানদের বন্দীত্ব) বন্দীদের প্রতি আচরণের কুরান নির্দেশিত নিয়মের স্পষ্ট লঙ্ঘন: বন্দীদের সঙ্গে অবশ্যই মর্যাদা ও সম্মানসূচক আচরণ করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি দিতে হবে। আক্রমণকারী পক্ষটি নিজের হাত থেকেই মুক্তিপণের টাকা দিতেও বাধ্য থাকবে। প্রকৃতপক্ষে কুরান রীতিসিদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে কাউকে আটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা নিশ্চিতভাবে বৈরী অবস্থার অনুপস্থিতিতে কাউকে জিম্মি করা অনুমোদন করে না।[১] বিপ্লবের পর খোমিনি তাঁর ভাষায় "অভিব্যক্তির ঐক্যে"র ওপর জোর দিয়ে সবরকম ভিন্নমত দমন করেন। বাকস্বাধীনতার প্রতি উদ্বেগ বিপ্লবের অন্যতম দাবীই কেবল ছিল না, কিন্তু ইসলাম কখনও আদর্শগত সমরূপতার ওপর জোর দেয়নি, জোর দিয়েছে কেবল চর্চার সমরূপতার ওপর। ধর্মীয় বিষয়ে জোরজবরদস্তি কুরানে নিষিদ্ধ এবং খোমিনির আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা– শিক্ষক মোল্লা সদরাও একে ঘৃণা করতেন। ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৮৯তে খোমিনি যখন *দ্য স্যাটানিক ভার্সেস* উপন্যাসে মুহাম্মদের(স:) ব্লাসফেমাস বিবরণ তুলে ধরার অভিযোগে ঔপন্যাসিক সালমান রুশদির বিরুদ্ধে *ফাতওয়াহ্* জারি করেন তখনও তিনি চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে সদরার আন্তরিক অবস্থানের বিরোধিতা করেছেন। আল-আযহার এবং সৌদী আরবের *উলেমাগণ ফাতওয়াহ্*কে অনৈসলামীক ঘোষণা করেন এবং এর পরের মাসে ইসলামী কনফারেন্সে উনচল্লিশটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আটচল্লিশটি দেশ কর্তৃক নিন্দিত হয়।

কিন্তু এটা প্রতীয়মান হয় যে ইসলামী বিপ্লব হয়ত ইরানি জনগণকে তাদের মত করে আধুনিকতায় উত্তোরণে সাহায্য করেছে। পরলোকগমনের কিছুদিন আগে খোমিনি সংসদের কাছে আরও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়াস পান এবং তাঁর স্পষ্ট আশীর্বাদে মজলিসের স্পিকার হাশেম রাফসানজানি বেলায়েত-ই ফাকিহ্‌র এক গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেন। আধুনিক রাষ্ট্রের চাহিদাসমূহ শিয়াদের গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সাহায্য করেছে, কিন্তু এযাত্রায় সেটা এসেছে ইসলামী প্যাকেজ হিসাবে যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে একে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। মে ২৩, ১৯৯৭তে হোজ্জাত ওল-ইসলাম সায়ীদ খাতামি ভূমিধস বিজয় অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। অবিলম্বে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আরও ইতিবাচক সম্পর্কে গড়ে তুলতে আগ্রহী তিনি এবং সেপ্টেম্বর ১৯৯৮তে রুশদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত *ফাতওয়াহ্*র সঙ্গে তাঁর সরকারের সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা দেন যা পরে ইরানের প্রধান ফাকিহ্ আয়াতোল্লাহ আলী খামেনীর অনুমোদন লাভ করে। খাতামির নির্বাচন জনগণের এক বিপুল অংশের

বহুত্ববাদ, ইসলামী আইন-কানুনের কোমল ব্যাখ্যা, অধিকতর গণতন্ত্র এবং নারীদের জন্যে আরও প্রগতিশীল নীতির পক্ষে জোরাল আকাঙ্ক্ষার সঙ্কেতবাহী ছিল। যুদ্ধে এখনও বিজয় অর্জিত হয়নি। খোমিনির বিরোধিতাকারী রক্ষণশীল পুরোহিত, যাদের প্রতি তিনি গুরুত্ব দেননি, এখনও খাতামির বহু সংস্কারকে রুখে দিতে সক্ষম, কিন্তু কুরানের চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত অথচ বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম একটি টেকসই ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণ এখনও ইরানি জনগণের প্রধান অগ্রাধিকার রয়ে গেছে।

সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলিম

ইসলামী মৌলবাদের অপচ্ছায়া গোটা পাশ্চাত্য সমাজে কাঁপুনি ছড়িয়ে দিচ্ছে, যাকে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের একই রকম প্রবল ও সহিংস মৌলবাদের দ্বারা ততটা শঙ্কিত বলে মনে হয় না। এটা নিশ্চিতভাবেই তাদের নিজের দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের প্রতি পাশ্চাত্যের জনগণের আচরণকে প্রভাবিত করেছে। ইউরোপে পাঁচ থেকে ছয় মিলিয়ন মুসলিম বাস করে, আর সাত থেকে আট মিলিয়নের অধিবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। জার্মান ও ফ্রান্সে এখন প্রায় হাজারখানেক মসজিদ আছে, যুক্তরাজ্যে এর সংখ্যা পাঁচ শত। পাশ্চাত্যবাসী মুসলিমদের অর্ধেকেরই জন্ম হয়েছে সেখানে, যাদের বাবা-মা ১৯৫০ ও ১৯৬০-র দশকে অভিবাসী হয়েছিল। তারা তাদের অভিভাবকদের নরম অবস্থান প্রত্যাখ্যান করেছে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বৃহত্তর পরিসর ও স্বীকৃতির সন্ধান করছে। কখনও কখনও ভ্রান্ত পরামর্শে অগ্রসর হয় এরা, যেমন উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০-র দশকে যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের জন্য ডক্টর কলিম সিদ্দিকীর পৃথক পার্লামেন্ট গঠনের আহ্বান। এই প্রকল্প ব্রিটিশ মুসলিমদের খুব নগণ্য সমর্থন লাভ করেছিল, কিন্তু মুসলিমরা সমাজের মূলধারায় নিজেদের একীভূত করতে ইচ্ছুক নয় ভেবে শঙ্কিত বোধ করেছে লোকে। *দ্য স্যাটানিক ভার্সেস*কে নিয়ে সঙ্কটকালেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি ব্যাপক বৈরী আচরণ দেখা গেছে, মুসলিমরা যখন ব্র্যাডফোর্ডে গ্রন্থটি পুড়িয়েছিল। অধিকাংশ ব্রিটিশ মুসলিম হয়ত উপন্যাসটিকে অনুমোদন দেয়নি, কিন্তু রুশদীর মৃত্যু দেখারও ইচ্ছা ছিল না তাদের। ইউরোপীয়দের পক্ষে যেন স্বদেশী মুসলিমদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক নির্মাণ কঠিন ঠেকে। অভিবাসী টার্কিশ শ্রমিকরা জার্মানির বর্ণ-দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে আর *হিজাব* বেছে নেয়া স্কুলছাত্রীদের নিয়ে ফরাসি সংবাদপত্রসমূহে বৈরীভাবাপন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটেনে মুসলিমরা তাদের সন্তানদের জন্যে পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুরোধ তুললে ক্ষোভ দেখা যায়, অথচ ইহুদি, রোমান ক্যাথলিক বা কুয়েকারদের জন্য বিশেষ স্কুলের বেলায় কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করে না। মুসলিমদের যেন পঞ্চম বাহিনী হিসেবে দেখা হয়, ব্রিটিশ সমাজকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে যেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের অবস্থান অনেকটা ভাল। মুসলিম অভিবাসীরা এখানে শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত পর্যায়ের। তারা চিকিৎসা, শিক্ষকতা, প্রকৌশল

পেশায় নিয়োজিত, যেখানে ইউরোপে মুসলিম জনগোষ্ঠী এখনও প্রবলভাবে শ্রমিক শ্রেণীর। আমেরিকান মুসলিমরা মনে করে তারা স্বেচ্ছায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। তারা আমেরিকান হতে চায়। সংমিশ্রণের পরিবেশে ইউরোপের তুলনায় এখানে সে সম্ভাবনা অনেক বেশী। কোনও কোনও মুসলিম, যেমন ম্যালকম এক্স (১৯২৫-৬৫), দ্য নেশন অভ ইসলাম নামে পরিচিত কৃষ্ণাঙ্গ বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের ক্যারিশম্যাটিক নেতা, মানবাধিকার আন্দোলন চলাকালে ব্যাপক মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন; কৃষ্ণাঙ্গ ও মুসলিম শক্তির এক প্রতীকে পরিণত হন তিনি: কিন্তু নেশন অভ ইসলাম একটা হিটারোডক্স পার্টি ছিল। ১৯৩০-এ ডেট্রয়টের এক পেডলার ওয়ালেস ফার্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৩৪-এ ফার্ডের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর, এলিজাহ্ মুহাম্মদের (১৮৯৭-১৯৭৫) নেতৃত্বাধীন এই দল দাবী করে যে ঈশ্বর ফার্ডের দেহ ধারণ করেছেন, শ্বেতাঙ্গরা জন্মগতভাবেই অশুভ এবং মৃত্যুর পরে অন্য কোনও জীবনের অস্তিত্ব নেই– এসবই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মদ্রোহী। দ্য নেশন অভ ইসলাম আফ্রিকান আমেরিকানদের বহু বছর ক্রীতদাস করে রাখার ক্ষতিপূরণ হিসাবে পৃথক রাষ্ট্রের দাবী করেছিল; পাশ্চাত্যের প্রতি প্রবল বৈরীভাবাপন্ন ছিল দলটি। অবশ্য এলিজাহ্ মুহাম্মদের নৈতিক স্খলন আবিষ্কার করে ম্যালকম এক্স দ্য নেশন অভ ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং অনুসারীদের নিয়ে সুন্নী ইসলামে যোগ দেন: এর দুবছর পরে, দল ত্যাগের অপরাধে নিহত হন তিনি। কিন্তু দ্য নেশন অভ ইসলাম আজও ম্যালকম-এক্স প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান মুসলিম মিশনের তুলনায় ঢের বেশী মিডিয়া কাভারেজ পাচ্ছে: আমেরিকান মুসলিম মিশন এখন পুরোপুরি অর্থোডক্স: শিক্ষালাভের জন্যে সদস্যদের আল-আযহারে পাঠাচ্ছে এবং অধিকতর ন্যায়-বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের পাশাপাশি কাজ করার সম্ভাবনার অনুসন্ধান করছে। নেশনের অস্বাভাবিক ও প্রত্যাখ্যানমূলক অবস্থান ইসলামকে উৎপত্তিগতভাবে অসহিষ্ণু এবং গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাস কল্পনা করার পশ্চিমা স্টেরিওটাইপের নিকটবর্তী বলে মনে হতে পারে।

ভারতে ১৯৪৭-এ যেসব মুসলিম পাকিস্তানে অভিবাসী হয়নি তাদের বংশধরগণের সংখ্যা এখন ১১৫ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে: কিন্তু সংখ্যার বিশালত্ব সত্ত্বেও অনেকেই নিজেদের পাশ্চাত্যবাসী ভাই-বোনের চেয়ে বেশী দল-বিচ্ছিন্ন এবং বিপন্নপন্ন বলে মনে করে। ভারতের হিন্দু ও মুসলিম জনগণ এখনও ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের সময়ে সংঘটিত দুঃখজনক সহিংসতার স্মৃতিতে তাড়িত হয়; এবং হিন্দুদের অনেকেই ভারতে মুসলিম অধিকারের পক্ষে দাঁড়ালেও মুসলিমরা সংবাদপত্রের অপপ্রচারের শিকার হয়: তাদের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ মানসিকতার অভিযোগ আনা হয়, মনে মনে পাকিস্তান বা কাশ্মীরের প্রতি আনুগত্য পোষণের অভিযোগ ওঠে: অধিক সন্তান ধরণের জন্যে দোষারোপ করা হয় তাদের, পশ্চাদপদ থাকার জন্যে নিন্দা কুড়োয় তারা। ভারতীয় মুসলিমদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, সহজে ভাল চাকুরি জোগাড় করতে পারে না তারা এবং প্রায়ই শোভন

বসবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়। গৌরব-উজ্জ্বল মোঘুল আমলের একমাত্র চিহ্ন হিসাবে রয়ে গেছে সুবিশাল দালান-কোঠাসমূহ: তাজ মহল, লাল কেল্লা আর জুনেহ্ মসজিদ, যেগুলো আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পদচারণাস্থলে পরিণত হয়েছে, যাদের দাবী: এগুলো আসলে হিন্দুরা নির্মাণ করেছিল আর মুসলিমরা ভারতের মন্দির ধ্বংস করে সেগুলোর জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করেছে। বিজেপির মূল লক্ষ্য ছিল বাবরী মসজিদ–মোঘুল অযোধ্যায় মোঘুল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক নির্মিত মসজিদ–বিজেপি ১৯৯২-র ডিসেম্বরে মাত্র দশ ঘন্টার মধ্যে এটা ভূমিস্মাৎ করে, সংবোদিক আর সেনাবাহিনী নিশ্চল দাঁড়িয়ে তা প্রত্যক্ষ করে মাত্র। ভারতীয় মুসলিমদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়াবহ। তারা আতঙ্কিত বোধ করেছে একথা ভেবে যে এই প্রতীকী ধ্বংস আরও ব্যাপক ঝামেলার লক্ষণ মাত্র এবং অচিরেই তাদের স্মৃতিসমূহ ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার এই শঙ্কা *দ্য স্যাটানিক ভার্সেস*'র প্রবল বিরোধিতার পেছনেও ক্রিয়াশীল ছিল, যাকে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আরও একটি বড় ধরনের হুমকি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতা ভারতীয় ইসলামের অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং সভ্য ঐতিহ্যর পরিপন্থী। আতঙ্ক আর নিপীড়ন আরও একবার ধর্মবিশ্বাসকে বিকৃত করেছে।

আগামীর সম্ভাবনা

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রাক্কালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেমে প্রায় তিরিশ হাজার ইহুদি এবং মুসলিমকে হত্যা করেছিল, প্রাণবন্ত ইসলামী পবিত্র নগরীকে পরিণত করেছিল গন্ধময় চারন্যাল হাউজে। অন্তত পাঁচ মাস ধরে নগরীর আশপাশের উপত্যকা আর খানাখন্দগুলো গলিত লাশে পরিপূর্ণ ছিল, অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে নগরীতে রয়ে যাওয়া ক্রুসেডারদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় তাদের পক্ষে এসব লাশ সরিয়ে ফেলার কোনও উপায় ছিল না। গোটা জেরুজালেম হয়ে উঠেছিল দুর্গন্ধময়, যেখানে অব্রাহামের তিনটি ধর্মই ইসলামী শাসনের অধীনে প্রায় পাঁচ শত বছর অপেক্ষাকৃত সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ভেতর সহাবস্থান করছিল। এটাই ছিল ক্রিশ্চান-পশ্চিম সম্পর্কে মুসলিমদের প্রথম অভিজ্ঞতা। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর নেমে আসা অন্ধকার যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন বেরিয়ে এসেছিল পাশ্চাত্য, আবার উপস্থিত হয়েছিল বিশ্ব পরিমণ্ডলে। মুসলিমরা ক্রুসেডারদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু খুব বেশী দিন তাদের উপস্থিতির কারণে বাধা পড়ে থাকেনি। ১১৮৭-তে সালাদিন ইসলামের পক্ষে জেরুজালেমকে পুনর্দখল করতে সক্ষম হন এবং যদিও ক্রুসেডাররা আরও প্রায় শত বছর নিকটপ্রাচ্যে অবস্থান করেছে, কিন্তু এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইসলামী ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তাদের একটা গুরুত্বহীন তুচ্ছ অধ্যায় বলে মনে হয়েছে। ইসলামী জগতের অধিকাংশ অধিবাসী ক্রুসেডের প্রভাব বলয়ের বাইরে রয়ে গিয়েছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রতি অনাগ্রহী রয়ে গেছে, যা ক্রুসেডীয় সময়ে নাটকীয় সংস্কৃতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের চেয়ে অনেক বেশী পেছনে পড়েছিল।

কিন্তু ইউরোপীয়রা ক্রুসেডের কথা বিস্মৃত হয়নি, তারা দার আল-ইসলামকে অগ্রাহ্যও করতে পারেনি: যা কিনা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা বিশ্ব শাসন করতে যাচ্ছে বলে প্রতিভাত হচ্ছিল। এমনকি ক্রুসেডের সময় থেকেই পশ্চিমা-ক্রিশ্চান জগতের মানুষ ইসলামের এক স্টেরিওটিপিক্যাল এবং বিকৃত ইমেজ সৃষ্টি করে নিয়েছিল যেখানে ইসলামকে সুশীল সভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা হয়। এই সংস্কার ক্রুসেডের অপর শিকার ইহুদিদের সম্পর্কে ইউরোপীয় কল্প কথার সঙ্গে মিশে গেছে এবং ক্রিশ্চানদের আচরণে প্রায়ই তা সুপ্ত উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়: যেমন উদাহরণস্বরূপ, ক্রুসেডের সময় ক্রিশ্চানরাই যেখানে

মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে একাধিক নৃশংস পবিত্র যুদ্ধের সূচনা করেছিল, তখন ইউরোপের শিক্ষিত পণ্ডিত-মনস্করাই ইসলামকে উৎপত্তিগতভাবে সহিংস এবং অসহিষ্ণু ধর্মবিশ্বাস হিসাবে বর্ণনা করেছে যা কিনা কেবল তরবারির সাহায্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলামের কল্পিত গোড়ামিপূর্ণ অসহিষ্ণুতার কিংবদন্তী পাশ্চাত্যের অনাতম বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়েছে।

অবশ্য সহস্রাব্দ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের কেউ কেউ যেন এই পাশ্চাত্য পূর্ব-ধারণার অনুসারী হয়ে ওঠে এবং প্রথমবারের মত পবিত্র সহিংসতাকে অত্যাবশ্যক ইসলামী কর্তব্যে রূপান্তরিত করে। এই মৌলবাদীরা প্রায়শ: পশ্চিমা উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশিককালের পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকে *আল-সালিবিয়াহ:* ক্রুসেড বলে অভিহিত করে থাকে। ঔপনিবেশিক ক্রুসেড অপেক্ষাকৃত কম সহিংস হলেও এর প্রভাব মধ্যযুগীয় পবিত্র যুদ্ধগুলোর চেয়ে অনেক ভয়াবহ। শক্তিশালী মুসলিম বিশ্বকে নির্ভরশীল ব্লকে পরিণত করা হয়েছে এবং এক ত্বরান্বিত আধুনিকীকরণ কর্মসূচির আওতায় মুসলিম সমাজকে স্থানচ্যুত করে ফেলা হয়েছে। আমরা যেমন দেখেছি, সারা বিশ্বে সকল প্রধান ধর্মবিশ্বাসের মানুষ পশ্চিমা আধুনিকতার প্রভাবের অধীনে বিচলিত হয়ে মৌলবাদ নামে অভিহিত যুদ্ধপ্রবণ এবং উপর্যুপরি অসহিষ্ণু ধার্মিকতার জন্ম দিয়েছে। আধুনিক সেক্যুলার সংস্কৃতির ক্ষতিকর প্রভাব হিসাবে বিবেচিত বিষয়াবলীর সংশোধনের প্রয়াস চালাতে গিয়ে মৌলবাদীরা পাল্টা লড়াই করে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারা সহানুভূতি ন্যায়বিচার আর মহানুভবতা যা ইসলামসহ সকল ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য– সেসব মৌলমূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়। মানুষের অন্য যেকোনও কর্মকাণ্ডের মত ধর্মও প্রায়শ অপব্যবহৃত হয়; কিন্তু নির্মলরূপে তা মানুষের মাঝে পবিত্র অলঙ্ঘনীয়তার অনুভূতি জাগাতে সাহায্য করার মাধ্যমে আমাদের প্রজাতির সহিংস প্রবণতা দূর করে থাকে। অতীতে ধর্ম নৃশংসতার জন্ম দিয়েছে; কিন্তু সেক্যুলারিজমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এর সহিংস হওয়ার ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা যেমন দেখেছি, সেক্যুলার আক্রমণ এবং নিপীড়ন প্রায়ই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণার জন্ম দিয়েছে।

১৯৯২-তে আলজিরিয়ায় এটা করুণভাবে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭০-র দশকের ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সময় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (FIS) সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী দল দ্য ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (FLN) স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। FLN ১৯৫৪-তে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় এবং ১৯৬২ তে দেশে একটি সমাজতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজিরিয়দের বিপ্লব ইউরোপ থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামরত আরব ও মুসলিমদের অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। FLN সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সেক্যুলার ও সেক্যুলারিস্ট সরকারেরই অনুরূপ ছিল, যারা পশ্চিমা কায়দায় ইসলামকে ব্যক্তিপর্যায়ে অবনমিত করেছে। অবশ্য ১৯৭০-র দশক নাগাদ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জনগণ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ এইসব সেক্যুলারিস্ট আদর্শবাদের

প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে। FIS-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস মাদানি আধুনিক বিশ্বের উপযোগি একটা ইসলামী রাজনৈতিক আদর্শ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; আলজিয়ার্সের দরিদ্র এলাকার এক মসজিদের ইমাম আলী ইবন হাজ্জ FIS-র অধিকতর চরমপন্থী অংশের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ধীরে ধীরে FIS সরকারের অনুমোদন না নিয়েই নিজস্ব মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছিল; ফ্রান্সের মুসলিম জনগণের মাঝে এটা শেকড় গেড়ে বসে, শ্রমিকরা যেখানে কারখানা আর অফিসে প্রার্থনার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গার বরাদ্দের দাবী তুলে জাঁ-মেরি লে পেনের নেতৃত্বাধীন ডানপন্থীদলের রোষের শিকারে পরিণত হচ্ছিল।

১৯৮০-র দশক নাগাদ অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিপতিত হয় আলজিরিয়া। FLN দেশটিকে গণতান্ত্রিক পথে চালু করে রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, কিন্তু সময়ের প্রবাহে তা হয়ে উঠেছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। পুরনো 'গার্ডে অধিকতর গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যক্রমে অনীহ ছিল। আলজিরিয়ায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটে, তিরিশ মিলিয়ন অধিবাসীর অধিকাংশই ছিল অনূর্ধ্ব তিরিশ বছর বয়স্ক, অনেকেই ছিল বেকারত্বের শিকার, আবাসনের সঙ্কটও ছিল তীব্র। দাঙ্গা-ফ্যাসাদ লেগেই থাকত। অচলাবস্থা আর FLN-র অদক্ষতার কারণে হতাশ তরুণ প্রজন্ম নতুন কিছু চেয়েছিল এবং নজর দিয়েছে ইসলামী দলগুলোর দিকে। ১৯৯০-র জুনে FIS স্থানীয় নির্বাচনে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বিপুল বিজয় অর্জন করে। অধিকাংশ FIS কর্মী ছিল তরুণ, আদর্শবাদী এবং সুশিক্ষিত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোঁড়া আর রক্ষণশীল হিসাবে গণ্য হলেও সরকারে তারা ছিল সৎ এবং দক্ষ। নারীদের জন্যে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ব্যাপারে জোর দিত তারা। কিন্তু FIS পাশ্চাত্য বিরোধী ছিল না। নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ও পশ্চিমা বিনিয়োগে উৎসাহ দানের কথা বলতেন। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনী বিজয়ের পর ১৯৯২তে অনুষ্ঠেয় আইন পরিষদের নির্বাচনেরও নিশ্চিত জয়লাভের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল তাদের।

কিন্তু আলজিরিয়ায় কোনও ইসলামী সরকার আসতে পারেনি। সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থান সংঘটিত করে উদারপন্থী FIS প্রেসিডেন্ট বেনিয়েদিদকে (Benicdid) (যিনি গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যক্রমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন) উৎখাত এবং FIS-কে দমন এবং এর নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। পাকিস্তান বা ইরানে যদি এমন সহিংস এবং অসাংবিধানিক উপায়ে নির্বাচন বানচাল করা হত, শোরগোল পড়ে যেত পশ্চিমে। এধরনের অভ্যুত্থানকে গণতন্ত্রের প্রতি ইসলামের জন্মগত বিরূপতা আর আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে মানিয়ে চলার মৌলিক অযোগ্যতার উদাহরণ হিসাবে দেখা হত কিন্তু যেহেতু অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা ইসলামী সরকারকে বাদ দেয়া গেছে সেকারণে পশ্চিমা সংবাদপত্রে আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়েছে। আলজিরিয়া ইসলামী ভীতি থেকে রক্ষা পেয়েছে; আলজিয়ার্সের বার, ক্যাবারে ডিসকোথেকগুলো বেঁচে গেছে; এবং কোনও রহস্যময় উপায়ে এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ আলজিরিয়াকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করে তুলেছে। ফরাসি সরকার নতুন কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট

লিয়ামিন যেরোয়ালের (Liamine Zeroual) FLN-র প্রতি সমর্থন দেয় এবং FIS-র সঙ্গে পুনরায় আলোচনায় অস্বীকৃতিকে জোরদার করে। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের এই নতুন নজীর দেখে প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল।

পরিণাম দুঃখজনকভাবে অনুমানযোগ্য ছিল। আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষুব্ধ এবং ন্যায়বিচারের জন্যে মরিয়া FIS-র জঙ্গী সদস্যরা গেরিলা সংগঠন দ্য আমর্ড ইসলামিক গ্রুপ (GIA) গঠনের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আলজিয়ার্সের দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে। গণহত্যার একাধিক ঘটনায় কয়েকটি গ্রামের সকল অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, সেক্যুলার ও ধার্মিকরাও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে ইসলামপন্থীরাই এই নৃশংসতার জন্যে পুরোপুরি দায়ী, কিন্তু আস্তে আস্তে নানা প্রশ্ন উচ্চারিত হতে থাকে যার ফলে এসত্য বেরিয়ে আসে যে আলজিরিয়ান সামরিক বাহিনীর কেউ কেউ কেবল এতে মৌন সম্মতিই দেয়নি বরং GIA কে দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ডেও অংশ নিয়েছিল। এখন সেখানে এক ভীতিকর অচলাবস্থা বিরাজ করছে। FLN এবং FIS উভয় পক্ষই সমাধানে আগ্রহী বাস্তববাদী আলোচনায় অনিচ্ছুক কট্টরপন্থীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রথম অভ্যুত্থানের সহিংসতা ধার্মিক-সেক্যুলারিস্টদের মাঝে পুরোদস্তুর সংঘাতের দিকে গড়িয়েছে। জানুয়ারি ১৯৯৫তে রোমান ক্যাথলিক চার্চ দুপক্ষকেই একত্রিত করার লক্ষ্যে রোমে এক সভার আয়োজন করে, কিন্তু যেরোয়ালের সরকার অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। একটা সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়। আরও ইসলামী সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে এবং এক সাংবিধানিক রেফারেন্ডামে সকল ধর্মীয় রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

আলজিরিয়ার দুঃখজনক ঘটনা অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্যে উদাহরণ হতে পারে না। দমন-পীড়ন হতাশ মুসলিম সংখ্যালঘু অংশকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছে যা ইসলামের প্রত্যেকটা মৌল উপাদানের পরিপন্থী। আগ্রাসী সেক্যুলারিজম এমন এক ধার্মিকতার জন্ম দিয়েছে যা প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসের অপমান। এ ঘটনা পাশ্চাত্য যে গণতন্ত্রকে উৎসাহিত করার জন্যে এত উদগ্রীব সেই গণতন্ত্রের ধারণাকে কলুষিত করেছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হলেও যেন এর সীমাবদ্ধতা রয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দল আর গ্রুপের সম্পর্কে অজ্ঞ বলে দেখানো হয়েছে। মধ্যপন্থী FIS কে চরম সহিংস মৌলবাদী দলগুলোর সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে এবং পশ্চিমা মনে সহিংসতা, বেআইনী তৎপরতা আর অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিভূ বলে স্থান পেয়েছে যা এ দফায় FLN-র সেক্যুলারিস্টরাই আসলে প্রকাশ করেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য পছন্দ করুক বা না করুক, স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে FIS-এর প্রাথমিক সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে যে জনগণ কোনও না কোনও ধরনের ইসলামী সরকার দেখতে চায়। এ ঘটনা মিশর, মরক্কো এবং টিউনিসিয়ায় একটা স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করেছে– যেখানে সেক্যুলারিস্ট সরকারগুলো দীর্ঘদিন ধরে তাদের দেশে ক্রমবর্ধমান ধর্মানুরাগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেক্যুলারিজমের প্রভাব ছিল প্রবল, ইসলাম চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল। এখন মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনও সেক্যুলারিস্ট সরকার অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করছে যে যদি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ইসলামী সরকার ক্ষমতায় এসে যেতেও পারে। যেমন উদাহরণস্বরূপ, মিশরে ১৯৫০-র দশকে নাসের-বাদ যেমন জনপ্রিয় ছিল এখন ইসলাম তেমন জনপ্রিয়। ইসলামী পোশাক এখন সর্বত্র দৃশ্যমান; মুবারকের সরকার যেহেতু সেক্যুলারিস্ট, স্পষ্টতই স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এটা। এমনকি সেক্যুলারিস্ট টার্কিতেও সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে যে প্রায় ৭০ শতাংশ জনগণ নিজেদের ধর্মপরায়ণ বলে দাবী করেছে এবং ২০ শতাংশ দৈনিক পাঁচ বার প্রার্থনা করার কথা জানিয়েছে। জর্ডানের জনগণ মুসলিম ব্রাদারহুডমুখী হচ্ছে আর প্যালেস্টাইনে নজর দিচ্ছে মুজাহার দিকে, ওদিকে PLO ১৯৬০-র দশকে তুঙ্গে থাকলেও এখন একে অদ্ভুত, দুর্নীতিগ্রস্ত আর সেকেলে মনে হচ্ছে। মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোয় কয়েক দশকব্যাপী সোভিয়েত নিপীড়নের পর মুসলিমরা আবার তাদের ধর্মকে আবিষ্কার করছে। জনগণ সেক্যুলারিস্ট মতাদর্শগুলোর আশ্রয় নিয়ে দেখেছে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোয় যা চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছে, আপন ভূমিতে ক্রিয়াশীল ছিল তা। মুসলিমরা বর্ধিত হারে চাইছে তাদের সরকার ইসলামী নিয়মকানুনের অনুসারী হোক।

এটা ঠিক কী রূপ নেবে এখনও তা পরিষ্কার নয়। মিশরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শরিয়াহকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে দেখতে চায় বলে মনে হচ্ছে, অন্যদিকে টার্কিতে মাত্র ৩ শতাংশ লোকের এই প্রত্যাশা। কিন্তু এমনকি মিশরেও উলেম্যদের কেউ কেউ কৃষিভিত্তিক আইনবিধি শরিয়াহকে আধুনিকতার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের সমস্যা যে চরম হতে বাধ্য সে ব্যাপারে সচেতন। একেবারে ১৯৩০-র দশকেই রাশিদ রিদা এব্যাপারে সজাগ ছিলেন। কিন্তু কাজটা করা অসম্ভব, একথা বলা যাবে না।

একথা সত্যি নয় যে সকল মুসলিমই একইরকমভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ। আধুনিকীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় বহু চিন্তাবিদ ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রথম সারির প্রভাবশালী মুসলিম চিন্তাবিদদের কেউ কেউ আবার পশ্চিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ইরানের প্রেসিডেন্ট খাতামি এই প্রবণতার একজন নজীর মাত্র। ইরানি বুদ্ধিজীবী আবদোলকরিম সোরোশও তাই, খোমিনির সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে

আসীন ছিলেন তিনি এবং যদিও প্রায়ই অধিকতর রক্ষণশীল মুজতাহিদদের কাছে অপদস্থ হয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতাসীনদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ছিল তাঁর। সোরোশ খোমিনিকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তিনি তাঁর চেয়ে অনেক বেশী এগিয়েছেন। তাঁর মতে ইরানিরা এখন তিনটি পরিচয় বহন করে: প্রাক-ইসলামী, ইসলামী এবং পশ্চিমা, যার সঙ্গে অবশ্যই সমন্বয় সাধন করতে হবে। সোরোশ পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন চিরদিন মানুষের আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন হবে: তবে ইরানিদের তিনি শিয়া ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। ইসলামকে অবশ্যই এর ফিক্‌হকে আধুনিক শিল্পনির্ভর বিশ্বকে ধারণ করার লক্ষ্যে বিকশিত করতে হবে এবং নাগরিক অধিকারের দর্শন সৃষ্টি আর একবিংশ শতাব্দীতে নিজের সম্পদ ধরে রাখার জন্যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটাতে হবে।

সুন্নী চিন্তাবিদগণও অনুরূপ সিদ্ধান্ত পৌছেছেন। অজ্ঞতা থেকে ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের বৈরিতা জন্ম নিয়েছে, একথা বিশ্বাস করেন টিউনিসিয়ার নির্বাসিত রেনেসাঁ পার্টির নেতা রশিদ আল-গানোচি (Rashid al-Ghannouchi)। খ্রিস্ট ধর্মের অশুভ অভিজ্ঞতা এর উদ্ভবের কারণ, যা চিন্তা আর সৃজনশীলতাকে রুদ্ধ করেছিল। নিজেকে তিনি "গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী" বলে বর্ণনা করেন এবং ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে কোনও অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করেননি; কিন্তু পশ্চিমের সেক্যুলারিজমকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেননা মানুষকে এভাবে বিভক্ত আর টুকরো করা যায় না। তাওহীদের মুসলিম আদর্শ দেহ এবং আত্মা, বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতা, নারী ও পুরুষ, নৈতিকতা ও অর্থনীতি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বৈততা অস্বীকার করে। মুসলিমরা আধুনিকতা চায়, কিন্তু সেটা আমেরিকা, ব্রিটেইন বা ফ্রান্স কর্তৃক চাপিয়ে আধুনিকতা দেয়া নয়। মুসলিমরা পশ্চিমের দক্ষ ও চমৎকার প্রযুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল; রক্তপাত ছাড়াই পশ্চিমে সরকার পরিবর্তনের উপায় দেখে বিমোহিত হয় তারা। কিন্তু মুসলিমরা যখন পশ্চিমা সমাজের দিকে চোখ ফেরায়, কোনও আলো দেখতে পায় না, হৃদয় আর আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র চোখে পড়ে না। তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ও নৈতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে চায় এবং একই সময়ে পাশ্চাত্য-সভ্যতার সেরা কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করতে চায়। আল-আযহারের ডিগ্রিধারী এবং মুসলিম ব্রাদার কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সুন্নাহ্ অ্যান্ড শরিয়াহ্‌র বর্তমান পরিচালক ইউসুফ আবদাল্লাহ্ আল-ক্বারাদাওয়ি অনুরূপ চিন্তার অংশীদার। তিনি মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মুসলিম বিশ্বে সম্প্রতি আবির্ভূত গোঁড়ামি মানুষকে অপরাপর মানুষের অন্তর্দৃষ্টি আর দর্শন থেকে বঞ্চিত করার ভেতর দিয়ে হীনতর করবে। পয়গম্বর মুহাম্মদ(সঃ) বলেছিলেন তিনি ধর্মীয় জীবনে চরমপন্থা পরিহারকারী "মধ্যপন্থা" আনার লক্ষ্যে এসেছেন এবং আল-ক্বারাদাওয়ি মনে করেন যে ইসলামী বিশ্বের কোথাও কোথাও চলমান চরমপন্থা মুসলিম চেতনার দূরবর্তী এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। ইসলাম শান্তির ধর্ম,

হুদাইবিয়াহ্য় কুরাইশদের সঙ্গে এক অজনপ্রিয় সন্ধিতে উপনীত হয়ে পয়গম্বর যেমন দেখিয়েছেন। এ এমন এক কৃতিত্ব কুরান যাকে "মহাবিজয়"[৩] বলেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পাশ্চাত্যকে অবশ্যই মুসলিমদের তাদের ধর্ম অনুসরণ করে জীবন যাপনের অধিকার এবং যদি চায় তাদের রাজনীতিতে ইসলামী আদর্শ যোগ করার অধিকার মেনে নিতে হবে। তাদের বুঝতে হবে জীবনযাপনের নানান উপায় আছে। বৈচিত্র্য গোটা বিশ্বকেই লাভবান করে। ঈশ্বর মানুষকে বেছে নেয়ার অধিকার এবং ক্ষমতা দিয়েছেন এবং কেউ কেউ ইসলামী রাষ্ট্রসহ ধর্মীয় জীবনের পক্ষে মত দিতে পারে, অন্যরা যেখানে সেক্যুলার আদর্শের পক্ষপাতি।

"মুসলিমরা ধার্মিক হলে, পশ্চিমের জন্যে ভাল," যুক্তি দেখিয়েছেন ক্বারাদাওয়ি, "তারা তাদের ধর্ম মেনে চলুক, আর নীতিবান হওয়ার প্রয়াস পাক।"[৪] একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। বহু পশ্চিমাবাসী তাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতিতে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে। তারা অবশ্যই প্রাক-আধুনিক ধর্মীয় জীবন ধারায় বা প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। কিন্তু একটা উপলব্ধি ক্রমশ বেড়ে উঠছে যে, সর্বোত্তম অবস্থায় ধর্ম মানুষকে শুভ মূল্যবোধ বিকাশে সাহায্য করেছিল। শত শত বছর ধরে ইসলাম মুসলিম চেতনার সম্মুখ সারিতে সামাজিক ন্যায়-বিচার, সাম্য, সহিষ্ণুতা আর বাস্তব সহমর্মিতার ধারণাকে স্থান দিয়ে এসেছে। মুসলিমরা সবসময় এইসব আদর্শ অনুসরণ করতে পারেনি এবং বারবার এগুলোকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহে ধারণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এগুলো অর্জনের সংগ্রাম শত শত বছর ধরে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মুখ্য বিষয় রয়ে গেছে। পশ্চিমা জনগণকে অবশ্যই বুঝতে হবে, তাদের স্বার্থেও ইসলামের স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী থাকা প্রয়োজন। ইসলামের চরম ধরণগুলোর জন্যে পাশ্চাত্য পুরোপুরি দায়ী নয়, যা এমন এক সহিংসতার বিকাশ ঘটিয়েছে যার ফলে ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য নিশ্চিতভাবেই এই পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে; মৌলবাদী দর্শনের মূলে নিহিত ভীতি ও হতাশা প্রশমিত করার জন্যে তার উচিত তৃতীয় খ্রিস্টীয় সহস্রাব্দে ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলা।

পরিশিষ্ট

উপসংহার

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ উনিশজন মুসলিম চরমপন্থী চারটি যাত্রীবাহী জেট বিমান হাইজ্যাক করে নিউ ইয়র্ক শহরের ওঅর্ল্ড টেড সেন্টারে দুটি এবং ওয়াশিংটনস্থ পেন্টাগনে একটি বিমান চালিয়ে দেয়, এতে তিন হাজারেরও বেশী মানুষ প্রাণ হারায়। চতুর্থ বিমানটি বিধ্বস্ত হয় পেনসিলভেনিয়ায়। ছিনতাইকারীরা ছিল ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী, যাঁর জঙ্গী ইসলাম সায়ীদ কুতবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হামলার এই ভয়াবহতা আধুনিকতার বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের যুদ্ধকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এ বইটি যখন প্রথম ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, আমি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম যে মুসলিমরা যদি তাদের ধর্মকে আক্রান্ত বলে ভাবতে থাকে তাহলে মৌলবাদী সহিংসতা আরও চরম আকার নিয়ে নতুন রূপ নিতে পারে। দুর্দশাগ্রস্ত বিমানে ওঠার আগে ছিনতাইকারীদের কেউ কেউ ঘনঘন নাইটক্লাবে যাতায়াত করত, অ্যালকোহলে আসক্ত ছিল তারা, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। তারা সাধারণ মুসলিম মৌলবাদীদের একেবারেই বিপরীত, যারা কঠোরভাবে অর্থোডক্স জীবন যাপন করে, এবং নাইট ক্লাবকে প্রকৃত বিশ্বাসের চিরন্তন শত্রু *জাহিলিয়াহ্‌র* প্রতীক বলে মনে করে।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সেপ্টেম্বরের এই প্রলয়কাণ্ডে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে এবং যুক্তি দেখিয়েছে যে এই ধরনের নৃশংসতা ইসলামের অধিকাংশ পবিত্র ধারণার পরিপন্থী। কুরান সব রকম আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের নিন্দা করে এবং শিক্ষা দেয় যে আত্মরক্ষার লড়াইই একমাত্র ন্যায় যুদ্ধ। কিন্তু ওসামা বিন লাদেন এবং তার অনুসারীরা দাবী করেছে যে ইসলাম *আক্রান্ত*। তিনি সৌদী আরবের পবিত্র ভূমিতে আমেরিকান বাহিনীর উপস্থিতি, আমেরিকান ও ব্রিটিশ ফাইটার প্লেন থেকে ইরাকে অবিরাম বোমা বর্ষণ: ইরাকে আমেরিকার নেতৃত্বে আরোপিত অবরোধ, যার ফলে হাজার হাজার বেসামরিক নারী এবং শিশু প্রাণ হারিয়েছে– ইসরায়েলের হাতে শত শত প্যালেস্টাইনির মৃত্যু, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রধান মিত্র এবং সৌদী আরবের রাজ পরিবারের মত যেসব সরকারকে বিন লাদেন দুর্নীতিবাজ ও নিপীড়ক বলে মনে করেন যেসব সরকারের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন; ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। অবশ্য আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির আলোকে এগুলোর কোনওটাই এধরনের মারাত্মক

আক্রমণকে যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করতে পারে না, কুরান বা শরিয়াহ্য় যার কোনও বিধান নেই। ইসলামী আইন কোনও দেশে মুসলিমরা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করার অনুমোদন পেলে সেখানে যুদ্ধ ঘোষণা নিষিদ্ধ করেছে এবং জোরালভাবে নিরীহ বেসামরিক লোকের হত্যাকাণ্ডও নিষিদ্ধ করেছে। সব মৌলবাদীদের দর্শনের পেছনে ক্রিয়াশীল আতঙ্ক ও ক্রোধ সবসময়ই মৌলবাদীরা যে ট্র্যাডিশনকে রক্ষা করতে চায় তাকেই বিকৃত করতে বসে, সেপ্টেম্বর ১১-এর ঘটনার চেয়ে আর কোথাও তা এত স্পষ্ট নয়। ধর্মের এমন নিদারুণ অপব্যবহার খুব কমই দেখা গেছে।

হামলার পরপরই পশ্চিমা দেশগুলোর মুসলিমদের বিরুদ্ধে তীব্র পাল্টা ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়। পথঘাটে আক্রান্ত হয় মুসলিমরা, ওরিয়েন্টাল চেহারার লোকদের জন্যে বিমানে আরোহন নিষিদ্ধ করা হয়, মহিলারা *হিজাব* পরে ঘর থেকে বেরুনোর সাহস হারিয়ে ফেলে আর "স্যান্ড নিগার"দের দেশে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়ে দেয়ালে দেয়ালে গ্র্যাফিটি দেখা যায়। ব্যাপকভাবে মনে করা হয়ে যে ইসলাম ধর্মে এমন কিছু আছে যা মুসলিমদের নিষ্ঠুর ও সহিংস হতে বাধ্য করে এবং মিডিয়া বেশ ঘনঘন এই ধারণাকে উৎসাহিত করে থাকে। এ ধরনের প্রবণতার বিপদ বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু. বুশ দ্রুত ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ইসলাম এক মহান শান্তির ধর্ম এবং বিন লাদেন ও হাইজ্যকারদের ধর্মবিশ্বাসের সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের শোকানুষ্ঠানে একজন মুসলিমকে পাশে রাখতে ভোলেননি তিনি এবং আমেরিকান মুসলিমদের প্রতি সমর্থন দেখানোর জন্যে বিভিন্ন মসজিদ সফর করেছেন। সম্পূর্ণ নতুন এবং দারুণ আশাব্যাঞ্জক ব্যাপার ছিল এটা। সালমান রুশদী সঙ্কট বা সাদ্দাম হুসেইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত ডেজার্ট স্টর্ম অভিযানের সময় তেমন কিছু ঘটেনি। আমেরিকানরা বইয়ের দোকানে ভীড় জমাচ্ছে, ইসলাম সম্পর্কে যতটা পারছে পড়ছে, এটা দেখাও প্রীতিকর; মুসলিম ধর্মবিশ্বাসকে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছে তারা, যদিও এই সন্ত্রাসী হামলার আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়েছিল।

ইসলাম সম্পর্কে ন্যায় উপলব্ধি এবং জ্ঞান আহরণ পশ্চিমা জনগণের জন্যে আর কখনও এতটা জরুরি হয়ে ওঠেনি। সেপ্টেম্বর ১১-এ পৃথিবী বদলে গেছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে সুবিধাপ্রাপ্ত পশ্চিমা দেশের বাসিন্দা হিসাবে আমরা আর এটা মনে করতে পারব না যে বাকি পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহে আমাদের কিছু আসে যায় না। আজ গাযা, ইরাক বা আফগানিস্তানে যা ঘটছে আগামীকাল নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন বা লন্ডনে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। অচিরেই ছোট ছোট দলগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে যা অতীতে কেবল শক্তিশালী জাতি রাষ্টের পক্ষে সম্ভব ছিল। এখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে লড়াইতে পা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে নির্ভুল তথ্য উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের বিকৃত রূপ নির্মাণ, একে গণতন্ত্র ও জন্মগতভাবে শুভ মূল্যবোধের প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা এবং মধ্যযুগীয় ক্রুসেডারদের গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে বিপর্যয়কর। এটা

কেবল বিশ্বে আমাদের সহযাত্রী ১.২ বিলিয়ন মুসলিমকেই ক্ষিপ্ত করে তুলবে না, বরং তা সত্যের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং অন্যের পবিত্র অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাকেও লঙ্ঘন করবে যা ইসলাম ও পশ্চিমা সমাজ উভয়ই সর্বোত্তম অবস্থায় বৈশিষ্ট্যায়িত করে।

(দ্বিতীয় সংস্করণ হতে গৃহীত–অনুবাদক)

ইসলামের ইতিহাসে প্রধান ব্যক্তিবর্গ

আব্বাস (প্রথম), **শাহ** (১৫৮৮-১৬২৯): ইরানে সাফাভীয় সাম্রাজ্যের স্বর্ণসময়ের অধিপতি. ইসফাহানে এক দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং ইরানিদের দ্বাদশবাদী অর্থোডক্সি শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিদেশ থেকে শিয়া *উলেমাদের* আমদানি করেন।

আব্দ আল-মালিক: উমাঈয়াহ্ খলিফাহ্ (৬৮৫-৭০৫), এক গৃহযুদ্ধ অবসানের পর উমাঈয়াহ্ ক্ষমতা পুনর্বহাল করেন: ৬৯১-তে তাঁর উদ্যোগে ডোম অভ দ্য রক-এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

আব্দ আল-ওয়াহ্হাব, মুহাম্মদ ইবন (১৭০৩-৯২): একজন সুন্নী সংস্কারক যিনি ইসলামের মৌল বিষয়ে ফিরে যাবার লক্ষ্যে প্রবল প্রয়াস পেয়েছিলেন। বর্তমানে সৌদি আরব ইসলামের ওয়াহ্হাবিবাদ ধরণ অনুসৃত হচ্ছে।

আব্দু, মুহাম্মদ (১৮৪৯-১৯০৫): মুসলিমদের নতুন পাশ্চাত্য আদর্শ অনুধাবনে সক্ষম করে তোলা এবং দেশকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন এই মিশরীয় সংস্কারক।

আবদুলফাযল আল্লামি (১৫৪১-১৬০২): সুফি ঐতিহাসিক এবং মোঘুল সম্রাট আকবরের জীবনীকার।

আবদুলহামিদ: **অটোমান সুলতান** (১৮৩৯-৬১): একচ্ছত্র শাসন পরিবর্তনকারী গুলহান (Gulhane) ডিক্রি জারী করেন যার ফলে সরকার অটোমান প্রজাদের সঙ্গে চুক্তির সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে।

আবু বকর: প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম: পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুহাম্মদের(স:) পরলোকগমনের পর তিনি প্রথম খলিফাহ্ হন (৬৩২-৩৪)।

আবু আল-হাকাম (কুরানে **আবু জাহ্ল**. মিথ্যার পিতা নামেও আখ্যায়িত): মক্কায় মুহাম্মদের(স:) বিরোধিতাকারীদের নেতৃত্ব দেন তিনি।

আবু হানিফাহ্ (৬৯৯-৭৬৭): *ফিকহ্*'র অন্যতম পুরোধা, জুরেসপ্রুডেন্সের হানাফি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

আবু আল-কাসিম মুহাম্মদ: **গোপন ইমাম** নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন শিয়াদের দ্বাদশ ইমাম, যিনি প্রাণরক্ষার জন্যে ৮৭৪-এ আত্মগোপন করেন বলে বর্ণিত

আছে: ৯৩৪-এ তার "ঊর্ধ্বারোহণে"র (Occaltation) কথা ঘোষিত হয়: বলা হয়, ঈশ্বর অলৌকিকভাবে *ইমামকে* আড়াল করেছেন বলে তাঁর পক্ষে আর শিয়াদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব নয়। শেষ বিচারের অল্পদিন আগে মাহ্দি হিসাবে ঈশ্বরের শত্রুদের ধ্বংস করে ন্যায়বিচার ও শান্তির এক স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটাতে ফিরে আসবেন তিনি।

আবু সুফিয়ান: আবু আল-হাকামের মৃত্যুর পর পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) বিরোধিতাকারীদের নেতৃত্ব দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন উপলব্ধি করেন যে মুহাম্মদ (স:) অপ্রতিরোধ্য, ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার উমাঈয়াহ্ পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি এবং তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াহ্ প্রথম উমাঈয়াহ্ খলিফা হন।

আহ্মাদ ইবন হানবাল (৭৮০-৮৩৩): *হাদিস* সংগ্রাহক, আইনবিদ এবং *আহল আল-হাদিসের* নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর চেতনা ইসলামী জুরেসপ্রুডেন্সের হানবালি মতবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আহ্মাদ ইবন ইদরিস (১৭৮০-১৮৩৬): মরোক্কো, উত্তর আফ্রিকা ও ইয়েমেনে সক্রিয় নব্য সুফি সংস্কারক, যিনি *উলেমাদের* পাশ কাটিয়ে ইসলামের অনুরণন সরাসরি মানুষের কাছে পৌছানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আহ্মাদ খান, স্যার সাইয়ীদ (১৮১৭-৯৮): একজন ভারতীয় সংস্কারক যিনি পাশ্চাত্যের উদারপন্থার সঙ্গে ইসলামের সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি ইউরোপীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করার জন্যে ভারতীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আহ্মাদ সিরহিন্দি (মৃত্যু:১৬২৫): মোঘুল সম্রাট আকবরের বহুত্ব মতবাদের বিরোধিতাকারী সুফি সংস্কারক।

আয়েশা: পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) প্রিয়তমা স্ত্রী, যাঁর হাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আবু বকরের কন্যা তিনি এবং প্রথম *ফিৎনাহ্র* সময় মদীনার আলী বিন আবি তালিব বিরোধীদের নেতৃত্ব দেন।

আকবর: ভারতের মোঘুল সম্রাট (১৫৬০-১৬০৫)। হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার নীতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, তাঁর আমলে মোঘুল সাম্রাজ্য ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখর প্রত্যক্ষ করে।

আলী ইবন আবি তালিব: পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) চাচাত ভাই, রক্ষী, এবং মেয়ে-জামাই; তাঁর নিকটতম পুরুষ আত্মীয়। ৬৫৬-তে চতুর্থ খলিফাহ্ হন তিনি কিন্তু ৬৬১-তে জনৈক *খারেজি* চরমপন্থীর হাতে নিহত হন। শিয়ারা বিশ্বাস করে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত ছিল তাঁরই এবং তারা তাঁকে ইসলামী সমাজের প্রথম ইমাম হিসাবে শ্রদ্ধা করে। ইরাকের নাজাফে তাঁর সমাধি রয়েছে যা শিয়া তীর্থযাত্রীদের অন্যতম প্রধান স্থান।

আলী আল-হাদি: দশম শিয়া ইমাম। ৮৪৮-এ খলিফাহ্ আল-মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক সাম্রারায় তলব পান এবং সেখানে গৃহবন্দী হন। ৮৬৮-তে আসকারি দুর্গে পরলোকগমন করেন তিনি।

আলী আল-রিদা: অষ্টম শিয়া ইমাম। খলিফাহ্ আল-মামুন তাঁর সাম্রাজ্যের অসন্তুষ্ট শিয়াদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ৮১৮-তে তাঁকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন, কিন্তু সেটা ছিল অজনপ্রিয় পদক্ষেপ এবং আল-রিদা পরবর্তী বছরেই মারা যান, সম্ভবত: খুন।

আলী যায়েন আল-আবিদিন (মৃত্যু:৭১৪): চতুর্থ শিয়া ইমাম, অতীন্দ্রিয়বাদী, যিনি মদীনায় অবসর জীবনযাপন করেছেন এবং সক্রিয় রাজনীতি হতে বিরত ছিলেন।

আকা মুহাম্মদ খান (মৃত্যু : ১৭৯৭) : ইরানে কাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

আউরেঙজেব: মোঘুল সম্রাট (১৬৫৮-১৭০৭) যিনি আকবরের সহিষ্ণু নীতিমালা পাল্টে দেন এবং হিন্দু ও শিখ বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলেন।

বায়বরস, রুকন আদ-দিন (মৃত্যু:১২৭৭): মামলুক সুলতান, যিনি উত্তর প্যালেস্টাইনের আইন জালুটে মঙ্গোল হোর্ডদের পরাজিত করেন এবং সিরিয় উপকূলীয় এলাকার অধিকাংশ অবশিষ্ট ক্রুসেডার অবস্থানগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেন।

বান্না, হাসান আল- (১৯০৬-৪৯): মিশরীয় সংস্কারক এবং সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৯-এ মিশরের সেক্যুলারিস্ট সরকারের হাতে প্রাণ হারান।

ভুট্টো, যুলফাকির আলী: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (১৯৭১-৭৭), যিনি ইসলাম পন্থীদের ছাড় দেন কিন্তু অধিকতর ধার্মিক জিয়া আল-হক কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন।

বিসতামি, আবু ইয়াযিদ আল- (মৃত্যু:৮৭৪): "মাতাল সুফি"দের ("drunken Sufis") অন্যতম পুরোধা, যিনি ঈশ্বরের বিলীন (*ফানাহ্*) হওয়ার মতবাদ প্রচার করেছেন এবং এক দীর্ঘ অতীন্দ্রিয়বাদী অনুশীলনের পর আপন সত্তার গভীরতম প্রদেশে অলৌকিকের সন্ধান পেয়েছেন।

বুখারি, আল-(মৃত্যু: ৮৭০): *আহাদিসের* বিশ্বস্ত সংকলনের রচয়িতা।

চেলেবি, আবু আল-সাদ খোলা (১৪৯০-১৫৭৪): অটোমান শরিয়াহ্ ভিত্তিক রাষ্ট্রের আইনগত নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

ফারাবি, আবু নাসর আল-(মৃত্যু: ৯৫০) : ফায়লাসুফদের ভেতর সর্বাধিক যুক্তিবাদী, আবার সক্রিয় (Practising) সুফিও ছিলেন তিনি। আলেপ্পোর হামদানীয় রাজ দরবারে বাদ্যযন্ত্রী হিসাবেও কাজ করেছেন।

গানোউচি, রশিদ আল -(১৯৪১): নির্ধাচিত রেনেসাঁ পার্টির টিউনিসীয় নেতা নিজেকে যিনি "গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী" বলে বর্ণনা করেছেন।

গাযযালি, আবু হামিদ মুহাম্মদ (মৃত্যু:১১১১): বাগদাদের ধর্মতাত্ত্বিক, যিনি সুন্নী ইসলামের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি দিয়েছেন এবং সুফিবাদকে ধার্মিকতার মূলধারায় নিয়ে এসেছেন।

হ্যাগার (হাজেরা): বাইবেলে তিনি অব্রাহামের স্ত্রী এবং অব্রাহামের পুত্র ইশমায়েলের (আরবীতে ইসমায়েল) মাতা, ইসমায়েল আরব জাতির পিতায় পরিণত হন। এ কারণে হ্যাগার ইসলামের অন্যতম মাতৃস্থানীয় নারী হিসাবে শ্রদ্ধেয় এবং মক্কায় হজ্জ তীর্থযাত্রায় বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

হাক, যিয়া উল-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (প্রেসিডেন্ট–অনুবাদক) (১৯৭১-৭৭), যিনি অধিকতর ইসলামী সরকার পরিচালনা করেছেন, যদিও তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি হতে ধর্মকে আলাদা রেখেছিল।

হাসান ইবন আলী (মৃত্যু:৬৬৯): আলী ইবন আবি তালিবের ছেলে এবং পয়গম্বর মুহাম্মদদের(স:) দৌহিত্র। শিয়াহ্‌রা তাঁকে দ্বিতীয় ইমাম হিসাবে শ্রদ্ধা করে। পিতার হত্যাকাণ্ডের পর শিয়াহ্‌রা তাঁকে খলিফাহ্ ঘোষণা করে, কিন্তু হাসান রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণে সম্মত হন এবং মদীনায় নিরিবিলি এবং কিছুটা বিলাসী জীবন যাপন করেন।

হাসান আল-আশারি (মৃত্যু:৯৩৫):মুতাযিলা এবং *আহল-আল-হাদিসের* সমন্বয়কারী দার্শনিক। তার অ্যাটোমিস্টিক দর্শন সুন্নী ইসলামের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের অন্যতম প্রধান অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়।

হাসান আল-আসকারি (মৃত্যু:৮৭৪): একাদশ শিয়াহ্ ইমাম, যিনি সামারার আসকারি দুর্গে আব্বাসীয় খলিফাহ্‌দের বন্দী হিসাবে বসবাস ও পরলোকগমন করেন। অধিকাংশ ইমামের মত তাঁকেও আব্বাসীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে বলে বিশ্বাস রয়েছে।

হাসান আল-বাসরি (মৃত্যু:৭২৮): বাসরাহ্‌র যাজক এবং ধর্মীয় সংস্কারের নেতা, উমঈয়াহ্ খেলাফতের তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি।

গোপন ইমাম: **আবু আল-কাসিম মুহাম্মদ** দেখুন।

হুসেইন ইবন আলী: আলী ইবন আবি তালিবের দ্বিতীয় পুত্র এবং পয়গম্বর মুহাম্মদের (স:) দৌহিত্র। শিয়াহ্‌রা তাঁকে তৃতীয় ইমাম হিসাবে শ্রদ্ধা করে। খলিফাহ্ ইয়াযিদের হাতে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটির স্মরণে মুহ্‌ররম মাসে বার্ষিকী শোক প্রকাশ করা হয়।

ইবন হাযাম (৯৯৪-১০৬৪): স্পেনের কবি এবং কর্ডোভা রাজদরবারের ধর্মীয় চিন্তা-বিদ।

ইবন ইসহাক, মুহাম্মদ (মৃত্যু:৭৬৭): পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) প্রথম উল্লেখযোগ্য জীবনীর রচয়িতা, যা সযত্নে বাছাই করা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে রচিত।

ইবন খালদুন, আব্দ আল-রহমান (১৩৩২-১৪০৬): *আল-মাকাদ্দিমাহ্* (*অ্যান ইনট্রোডাকশন টু হিস্ট্রি*)-র রচয়িতা। একজন ফায়লাসুফ, তিনি ইতিহাস পর্যালোচনায় দর্শনের নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন এবং ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল সর্বজনীন আইনের সন্ধান করেছেন।

ইবন রুশদ, আবু আল-ওয়ালিদ আহমাদ (১১২৬-৯৮): কর্ডোভা, স্পেনের একজন ফায়লাসুফ ও কাজি, পশ্চিমে আভেরোয়েস নামে পরিচিত, যেখানে মুসলিম বিশ্বের তুলনায় তাঁর যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাব অনেক বেশী।

ইবন সিনা, আবু আলি (৯৮০১০৩৭): পশ্চিমে আভিসেনা নামে পরিচিত, যিনি ফালসাফাহ্‌র অ্যাপোজী তুলে ধরেছেন, যাঁকে ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয়বাদী অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

ইবন তাঈমিয়াহ্ (১২৬৩-১৩২৮): একজন সংস্কারক যিনি সুফিবাদের প্রভাবের বিপরীতে কুরান ও *সুন্নাহ্‌র* মৌলনীতিমালায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। দামাসকাসে কারারুদ্ধ অবস্থায় পরলোকগমন করেন তিনি।

ইবন আল-যুবায়ের, আবদাল্লাহ্ (মৃত্যু: ৬৯২): দ্বিতীয় *ফিৎনাহ্‌র* সময় উমাইয়াহ্‌দের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ।

ইকবাল, মুহাম্মদ (১৮৭৬-১৯৩৮): ভারতীয় কবি ও দার্শনিক, ইসলাম পশ্চিমা আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে সক্ষম প্রমাণের লক্ষ্যে তিনি এর যৌক্তিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইসমায়েল: বাইবেলে ইশমায়েল নামে পরিচিত পয়গম্বর, অব্রাহামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঈশ্বরের নির্দেশে যিনি মা হ্যাগারসহ নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষা পান। মুসলিম ট্র্যাডিশন অনুযায়ী হ্যাগার (হাজেরা) ও ইসমায়েল মক্কায় বসবাস করেছেন, অব্রাহাম তাঁদের দেখতে আসেন। অব্রাহাম ও ইসমায়েল কাবাহ্ পুনর্নির্মাণ করেন (আদিতে যা আদি পয়গম্বর এবং মানবজাতির পিতা অ্যাডাম নির্মাণ করেছিলেন)।

ইসমায়েল ইবন জাফর: পিতা জাফর আস-সাদিক কর্তৃক শিয়াহ্‌দের সপ্তম ইমাম মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। শিয়াহ্‌দের কেউ কেউ (ইসমায়েলি বা সপ্তবাদী নামে পরিচিত) বিশ্বাস করে যে, তিনি আলী ইবন আবি তালিবের সর্বশেষ সরাসরি বংশধর, ইমামতি করার উত্তরাধিকারী হবার জন্যে জাফর আস-সাদিকের কনিষ্ঠ পুত্র মুসা আল-কাজিমের ইমামতি স্বীকার করে না, যিনি দ্বাদশবাদী শিয়াহ্‌দের কাছে সপ্তম ইমাম হিসাবে শ্রদ্ধেয়।

ইসমায়েল পাশা: মিশরের গভর্নর হন তিনি এবং খেদিভ (মহান রাজপুত্র) খেতাবে ভূষিত হন। তাঁর উচ্চাভিলাষী আধুনিকীকরণ কর্মসূচী দেশকে দেউলিয়া করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ দখলদারীর দিকে ঠেলে দেয়।

ইসমায়েল, শাহ্ (১৪৮৭-১৫২৪): ইরানের প্রথম সাফাফীয় শাহ্, যিনি দেশে দ্বাদশবাদী শিয়াহ্‌দের আমদানি করেন।

জাফর আস-সাদিক (মৃত্যু:৭৬৫): ষষ্ঠ শিয়াহ্ ইমাম, যিনি ইমামতির মতবাদ প্রবর্তন করেন এবং অনুসারীদের রাজনীতি হতে সরে গিয়ে কুরানের অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যানে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

জামাল আল-দিন, "আল-আফগানি" (১৮৩৯-৯৭): ইরানি সংস্কারক, যিনি ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ এড়ানোর লক্ষ্যে সকল

পর্যায়ের মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামকে আধুনিক করে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জিন্নাহ্, মুহাম্মদ আলী (১৮৭৬-১৯৪৮): দেশ বিভাগের সময় ভারতে মুসলিম লীগের নেতা, যে কারণে পাকিস্তানের স্থপতি হিসাবে প্রশংসিত হন।

জুনায়েদ (বাগদাদের) (মৃত্যু:৯১০): প্রথম "সোবার সুফি", যিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে বর্ধিত আত্মনিয়ন্ত্রণে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা বিরাজ করে এবং "মাতাল সুফি"দের বুনো মাতামাতি এমন এক তুচ্ছ পর্যায় প্রকৃত অতীন্দ্রিয়বাদীর যা অতিক্রম করে যাওয়া উচিত।

খাদিজা: পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) প্রথম স্ত্রী এবং তাঁর সকল জীবিত সন্তানের মাতা। তিনি প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীও ছিলেন এবং *হিজরার* আগে মক্কার কুরাইশদের চালানো মুসলিমদের উপর নির্যাতনকালে পরলোকগমন করেন (৬১৬-১৯), সম্ভবত খাদ্যাভাবে ভোগার পরিণাম।

খান, মুহাম্মদ আইয়ুব: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (প্রেসিডেন্ট-অনুবাদক) (১৯৫৮-৬৯), যিনি শক্তিশালী সেক্যুলারাইজিং নীতি অনুসরণ করেছেন যা শেষ পর্যন্ত তাঁর পতন ডেকে আনে।

খাতামি, হোজ্জাত ওল-ইসলাম সাইয়ীদ: ইরানের প্রেসিডেন্ট (১৯৯৭-)। তিনি ইরানে ইসলামী আইনের আরও উদার ব্যাখ্যা দেখতে চান, পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নও তাঁর ইচ্ছা।

খোমিনি আয়াতোল্লাহ্ রুহোল্লাহ্ (১৯০২-৮৯): পাহ্লভী শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামী অভ্যুত্থানের আধ্যাত্মিক পরামর্শক এবং ইরানের সর্বোচ্চ ফাকিহ্ (১৯৭৯-৮৯)।

কিন্দি, ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল- (মৃত্যু:৮৭০): প্রথম প্রধান ফায়লাসুফ যিনি বাগদাদে মুতাযিলাদের সঙ্গে কাজ করেছেন আবার গ্রিক সাধুদের কাছ থেকেও জ্ঞান সন্ধান করেছেন।

কিরমানি, আকা খান (১৮৫৩-৯৬): ইরানের সেক্যুলারিস্ট সংস্কারক।

মাহদি, খলিফাহ্-আল-: আব্বাসীয় খলিফাহ্ (৭৭৫-৮৫), যিনি অধিকতর ধার্মিক মুসলিমদের ধর্মানুরাগের স্বীকৃতি দিয়েছেন, *ফিকহ্*র চর্চা উৎসাহিত করেছেন এবং ধার্মিকদের নিজের শাসনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করেছেন।

মাহমুদ, দ্বিতীয়: অটোমান সুলতান (১৮০৮-৩৯), যিনি আধুনিকীকরণের টানযিমাট সংস্কার সূচিত করেছিলেন।

মজলিসি, মুহাম্মদ বাকির (মৃত্যু: ১৭০০) একজন *আলিম* যিনি দ্বাদশবাদী শিয়াহ্ মতবাদ ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হবার পর এক অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় রূপ দেখিয়েছিলেন ফালসাফাদের শিক্ষা দমন আর সুফিদের ওপর নির্যাতন চালানোর মাধ্যমে।

ম্যালকম এক্স (১৯২৫-৬৫): কৃষ্ণাঙ্গ বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ নেশন অভ ইসলাম এর ক্যারিশম্যাটিক নেতা, নাগরিক অধিকার আন্দোলন কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

ব্যাপক পরিচিতি পান। ১৯৬৩তে তিনি হেটারোডক্স নেশন অভ ইসলাম ত্যাগ করে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সুন্নী ইসলামের মূলধারায় যোগ দেন এবং পরিণামে দু'বছর পর আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

মালিক ইবন আনাস (মৃত্যু: ৭৯৫): ইসলামী জুরেসপ্রুডেন্সের মালিকি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

মামুন, খলিফাহ্ আল-আব্বাসীয় খলিফাহ্ (৮১৩-৩৩) যাঁর শাসনামলে আব্বাসীয়দের পতন সূচিত হয়।

মনসুর, খলিফাহ্ আল-আব্বাসীয় খলিফাহ্ (৭৫৪-৭৫) শিয়া ভিন্নমতাবলম্বীদের কঠোর হাতে দমন করেন এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী নতুন নগরী বাগদাদে সরিয়ে নেন।

মনসুর, হুসেইন আল- (**আল হাল্লাজ**, উল কারডার নামেও পরিচিত): অন্যতম সুবিখ্যাত "ড্রাঙ্কেন সুফি" যিনি মোহাবিষ্ট অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মিলনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে "*আনা আল-হাক্ক*!" ("আমিই সত্য!") বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন বলে কথিত আছে। ধর্মোদ্রোহের অপরাধে ৯২২-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাঁকে।

মাওদুদি, আবুল আলা (১৯০৩-৭৯): পাকিস্তানি মৌলবাদী আদর্শবাদী, সুন্নী বিশ্বে যাঁর ধারণার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

মেহ্মেদ (দ্বিতীয়): অটোমান সুলতান (১৪৫১-৬১) ১৪৫৩তে বাইযানটাইন কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করেছিলেন বলে যিনি "দ্য কনকোয়েরার" নামেও পরিচিত।

মির দিমাদ (মৃত্যু: ১৬৩১): ইসফাহানে অতীন্দ্রিয়বাদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং মোল্লাহ্ সদরার শিক্ষক।

মুয়াবিয়াহ্ ইবন আবি সুফিয়ান: ৬৬১ থেকে ৬৮০ পর্যন্ত শাসনকারী প্রথম উমাইয়াহ্ খলিফা যিনি প্রথম *ফিৎনাহ্*র পরবর্তী উন্মাতাল পরিস্থিতির পর মুসলিম সমাজে শক্তিশালী কার্যকর সরকার উপহার দিয়েছিলেন।

মুদ্দারিস, আয়াতোল্লাহ্ হাসান (মৃত্যু: ১৯৩৭): একজন ইরানি পুরোহিত, যিনি মজলিসে রেযা শাহ্কে আক্রমণ করেন এবং শাসকদলের হাতে প্রাণ হারান।

মুহাম্মদ ইবন আবদাল্লাহ্ (স:) (৫৭০-৬৩২): পয়গম্বর, যিনি মুসলিমদের কুরান উপহার দেন, একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরবে একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মুহাম্মদ আলী, পাশা (১৭৬৯-১৮৪৯): অটোমান সেনাবাহিনীর একজন আলবেনিয় কর্মকর্তা যিনি মিশরকে কার্যত: ইস্তাম্বুলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন। দেশে উল্লখযোগ্য আধুনীকরণেও সফল হয়েছিলেন তিনি।

মুহাম্মদ ইবন আলী আল-সানুসি (মৃত্যু: ১৮৩২): সানুসিয়াহ্ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নব্য-সুফি সংস্কারক, যা লিবিয়ায় আজও প্রভাবশালী।

মুহাম্মদ আল-বাকির (মৃত্যুঃ ৭৩৫)ঃ পঞ্চম শিয়া ইমাম। মদীনায় অবসর জীবনযাপন করেন তিনি। বলা হয় কুরান পাঠের এক নিগূঢ় পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন যা দ্বাদশবাদী শিয়াহ্ মতবাদের বৈশিষ্ট্য।

মুহাম্মদ, খওয়ারাযমশাহ্: খওয়ারাযমে এক রাজবংশের (১২০০-২০) শাসক, যিনি ইরানে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু মঙ্গোলদের রোষ টেনে আনেন ও প্রথম মঙ্গোল আক্রমণের পথ খুলে দেন।

মুহাম্মদ রেযা পাহ্লভী, শাহ্: ইরানের দ্বিতীয় পাহ্লভী শাহ্ (১৯৪৪-৭৯), যাঁর আক্রমণাত্মক আধুনিকীকরণ ও সেক্যুলারকরণের নীতিমালা ইসলামী বিপ্লবের জন্ম দেয়।

মুলকুম খান, মির্যা (১৮৩৩-১৯০৮)ঃ ইরানি সেক্যুলারিস্ট সংস্কারক।

মোল্লা সদরা (মৃত্যুঃ ১৬৪০)ঃ শিয়া অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক যাঁর রচনাবলী বিশেষ করে ইরানের বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী ও আধুনিকতাবাদীদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল।

মুরাদ (প্রথম): অটোমান সুলতান (১৩৬০-৮৯)। কসোভো রণক্ষেত্রে যিনি সারবীয়দের পরাস্ত করেছিলেন।

মুসলিম (মৃত্যুঃ ৮৭৮)ঃ একটি বিশ্বস্ত *হাদিস* সংকলনের সংগ্রাহক।

মুস্তাফা কেমাল, আতাতুর্ক নামেও পরিচিত (১৮৮১-১৯৩৮)ঃ আধুনিক, সেক্যুলার টার্কির প্রতিষ্ঠাতা।

মুতাওয়াক্কিল, খলিফাহ্ আল-: আব্বাসীয় খলিফাহ্ (৮৪৭-৬১)। সামারায় আসকারি দুর্গে শিয়া *ইমামদের* আটকের জন্যে দায়ী।

নাদির খান (মৃত্যুঃ ১৭৪৮)ঃ সাফাভীয় রাজবংশের পতনের পর সাময়িকভাবে শিয়া ইরানের সামরিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

নাইনি, শেখ মুহাম্মদ হুসেইন (১৮৫০-১৯৩৬)ঃ ইরানি *মুজতাহিদ* যাঁর *অ্যাডমোনিশন টু দ্য নেশন* শিরোনামের নিবন্ধ সাংবিধানিক শাসনের ধারণার প্রতি জোরাল সমর্থন দিয়েছিল।

নাসির, খলিফাহ্ আল-: অন্যতম শেষ আব্বাসীয় খলিফাহ্ যিনি বাগদাদের শাসনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

নাসের, জামাল আবদ আল-: মিশরের প্রেসিডেন্ট(১৯৫২-৭০), চরম জাতীয়তাবাদী, সেক্যুলারিস্ট এবং সোস্যালিস্ট সরকারের নেতৃত্ব দেন।

নিযামুলমুলক: তীক্ষ্ণধী পারসীয় উযির যিনি ১০৬৩ থেকে ১০৯২ পর্যন্ত সেলজুক সাম্রাজ্য শাসন করেন।

কুতব, সাইয়ীদ (১৯০৬-৬৬)ঃ নাসের প্রশাসনের হাতে নিহত মুসলিম ব্রাদার, সুন্নী মৌলবাদের ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রশিদ, খলিফাহ্ হারূন আল-: আব্বাসীয় খলিফাহ্ (৭৮৬-৮০৯) যাঁর শাসনামলে খেলাফত ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিল, তিনি এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক জাগরণের নেতৃত্ব দেন।

রেযা খান: ইরানের শাহ্ (১৯২১-৪১) এবং পাহলভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সরকার আক্রমণাত্মক ধরনের সেক্যুলারিস্ট ও জাতীয়তাবাদী ছিল।

রিদা, মুহাম্মদ রশিদ (১৮৬৫-১৯৩৫): কায়রোয় সালাফিয়াহ্ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ণাঙ্গ আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবক্তা।

রুমি, জালাল আল-দিন (১২০৭-৭৫): প্রবল প্রভাবশালী সুফি নেতা যাঁর বিশাল সংখ্যক অনুসারী ছিল এবং যিনি মাওলানি, বা প্রায়শ "ঘূর্ণায়মান দরবেশ (Whirling Dervishs)" নামে পরিচিত ধারার প্রতিষ্ঠা করেন।

সালাহ্ আদ-দিন, ইউসুফ ইবন আইয়ুব (মৃত্যু: ১১৯৩): সিরিয়া ও মিশরব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের সুলতানের পদে আসীন হওয়া কুর্দিশ সেনাপতি, ফাতিমীয় খেলাফতকে পরাজিত করার পর মিশরকে সুন্নী ইসলামে ফিরিয়ে আনেন, ক্রুসেডারাদের জেরুজালেম থেকে রিতাড়ন করেন। সালাহ্ আদ-দিন (পাশ্চাত্যে সালাদিন নাম পরিচিত) আইয়ুবীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

সেলিম (প্রথম): অটোমান সুলতান (১৫১২-২০), যিনি মামলুকদের কাছ থেকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর অধিকার করেন।

সেলিম (তৃতীয়): অটোমান সুলতান (১৭৮৯-১৮০৭)। সাম্রাজ্যের পাশ্চাত্য ঘেঁষা সংস্কারের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

শাফি, মুহাম্মদ ইদরিস আল-: (মৃত্যু: ৮২০): ইসলামী আইনের নীতিমালা *(উসুল)* প্রণয়নের মাধ্যমে *ফিকহ্*র বিপ্লবী রূপ দিয়েছেন এবং জুরেসপ্রুডেন্সের শাফী মতবাদের প্রবর্তক।

শাহ্ জিহান: মোঘুল সম্রাট (১৬২৭-৫৮), যাঁর শাসনামল মোঘুলদের পরিমার্জনা ও অনন্যতা প্রত্যক্ষ করেছে: তাজ মহলের নির্মাতা।

শাহ ওয়ালি-উল্লাহ্ (১৭০৩-৬২) : ভারতের একজন সুফি সংস্কারক যিনি ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে হুমকি হিসাবে বিবেচনাকারীদের অন্যতম।

সিনান পাশা (মৃত্যু: ১৫৭৮): ইসতাম্বুলের সুলেমানিয়া মসজিদ ও এডিরনের সেলিমিয়া মসজিদের স্থপতি।

সোরোশ, আবদোলকরিম (১৯৪৫-): নেতৃস্থানীয় ইরানি বুদ্ধিজীবী যিনি শিয়া মতবাদের অধিকতর উদার ব্যাখ্যার কথা বললেও পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম বিরোধী।

সুহ্‌রাওয়ার্দি, ইয়াহিয়া (মৃত্যু: ১১৯১): সুফি দার্শনিক, প্রাক-ইসলামী ইরানি অতীন্দ্রিয়বাদের ভিত্তিতে আলোকন (*ইশরাক*) মতবাদ প্রবর্তন করেন। *আলেপ্পোতে* কথিত ধর্মদ্রোহীতার দায়ে আয়ুবীয় শাসকগণ তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

সুলেইমান (প্রথম): অটোমান সুলতান (১৫২০-৬৬), ইসলামী বিশ্বে **আল-কানুনি** অর্থাৎ আইনদাতা নামে খ্যাত, এবং পাশ্চাত্যে 'দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট' নামে পরিচিত। সাম্রাজ্যের সুস্পষ্ট রীতিনীতি প্রণয়ন করেন। তাঁর শাসনামলে সাম্রাজ্য ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করে।

তাবারি, আবু জাফর (মৃত্যু: ৯২৩): শরিয়াহ'র পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক, সর্বজনীন ইতিহাস রচনা করেছিলেন, ঈশ্বরের উপাসনাকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাফল্য ও ব্যর্থতার অনুসন্ধান করেন, মুসলিম *উম্মাহ*র প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন সেখানে।

তাহ্‌তাওয়ি, রিফাহ্ আল-(১৮০১-৭৩): প্রকাশিত দিনপঞ্জীতে ইউরোপীয় সমাজের আবেগময় প্রশংসা তুলে ধরেছেন এই মিশরীয় *আলিম*, ইউরোপীয় গ্রন্থাদির আরবী অনুবাদ করেন তিনি এবং মিশরে আধুনিকীকরণের ধারণা উৎসাহিত করেন।

উমর (দ্বিতীয়): একজন উমাইয়াহ্ খলিফাহ্ (৭১৭-২০), যিনি ধর্মীয় আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী শাসনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রথম খলিফাহ্ যিনি প্রজাদের ইসলাম ধর্মগ্রহণে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

উমর ইবন আল-খাত্তাব: পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর। পয়গম্বরের পরলোকগমনের পর দ্বিতীয় খলিফাহ্ হন (৬৩৪-৪৪) এবং প্রথম আরব বিজয়াভিযানের পরিকল্পনা করেন, নির্মাণ করেন গ্যারিসন শহরগুলো। জনৈক পারসিয়ান যুদ্ধবন্দীর হাতে প্রাণ হারান তিনি।

উসমান ইবন আফফান: মুহাম্মদের(স:) ধর্মগ্রহণকারীদের অন্যতম এবং তাঁর মেয়ে জামাই। তৃতীয় খলিফাহ্ (৬৪৪-৫৬) হয়েছিলেন তিনি কিন্তু পূর্বসূরীদের তুলনায় কম সমর্থ শাসক ছিলেন। তাঁর অনুসৃত নীতিমালা তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ জন্ম দেয় এবং বিদ্রোহের উস্কানি সৃষ্টি হয় এবং সেই সময় মদীনায় নিহত হন তিনি। তাঁর হত্যাকাণ্ডের ফলে প্রথম *ফিৎনাহ্* যুদ্ধ সূচিত হয়েছিল।

ওয়ালিদ (প্রথম), খলিফাহ্ আল-উমাইয়াহ্ খলিফা (৭০৫-১৭), যিনি উমাইয়াহ্দের ক্ষমতা ও সাফল্যের শীর্ষ সময়ে শাসন করেছিলেন।

ওয়াসান ইবন আতা (মৃত্যু: ৭৪৮): যৌক্তিক ধর্মতত্ত্ব মুতাযিলা মতবাদের প্রবর্তক।

ইয়াসিন, শেখ আহ্‌মাদ (১৯৩৬-) ইসরায়েল অধিকৃত গাযায় কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান মুজ্জামাহ্‌র (ইসলামী কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠাতা। সন্ত্রাসী গ্রুপ HAMAS এই আন্দোলনের দলছুট অংশ।

ইয়াযিদ (প্রথম): উমাইয়াহ্ খলিফাহ্ (৬৮০-৮৩), কারবালায় হুসেইন ইবন আলীর হত্যাকাণ্ডের জন্যে প্রধানত তাঁকে দায়ী করা হয়।

যায়েদ ইবন আলী (মৃত্যু: ৭৪০): পঞ্চম শিয়া ইমামের ভাই; রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন এবং পঞ্চম ইমাম হয়ত তাঁর নেতৃত্বের দাবী রুখতেই নিজস্ব নীরবতার দর্শন গড়ে তোলেন। এরপর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ও দ্বাদশবাদীদের রাজনীতি হতে বিরত থাকার নীতিকে বর্জনকারী শিয়ারা অনেক সময় যায়েদীয় নামে পরিচিত হয়ে থাকে।

(ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসৃত হয়েছে)

আরবী শব্দার্থ

আহাদিস (এক বচনে, *হাদিস*): সংবাদ, প্রতিবেদন। পয়গম্বর মুহাম্মদের(সঃ) শিক্ষা ও আচরণ সম্পর্কিত দালিলিক বিবরণ, যেগুলো কুরানে নেই, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ও পারিবারিক সদস্যগণ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে নথিবদ্ধ করে গেছেন।

আহল আল-হাদিস : হাদিসপন্থীগণ। উমাইয়াহ্ আমলে আবির্ভূত চিন্তাধারা যা জুরিস্টদের **ইজতিহাদ** প্রয়োগের অনুমতি দেয় না, বরং **আহাদিসের** ওপর নির্ভর করে সকল বিধি-বিধান প্রয়াগের উপর জোর দেয়।

আহল আল-কিতাব: ঐশীগ্রন্থধারী জাতি। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের অনুসারী জাতি, যেমন ক্রিশ্চান বা ইহুদি বোঝাতে কুরানের পরিভাষা। যেহেতু পয়গম্বর(সঃ) এবং অধিকাংশ প্রাথমিক মুসলিমরা নিরক্ষর ছিলেন এবং তাঁদের কাছে গ্রন্থ থাকলেও খুব অল্পই ছিল, এমন মত প্রকাশ করা হয় যে, এর অনুবাদ হওয়া উচিত: "পূর্বের প্রত্যাদেশের অনুসারীগণ।"

আলম আল-মিথাল: নিখাদ ইমেজের জগৎ। মানব-মনের একটা জগৎ যা মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদীদের দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতার উৎস এবং সৃজনশীল কল্পনার আধার।

আলিম: **উলেমা** দেখুন।

আমির: নেতা।

আনসার: ৬২২-এ মক্কা ত্যাগে বাধ্য হওয়া পয়গম্বর(সঃ) ও প্রথম মুসলিমদের আশ্রয়দানের মাধ্যমে "সাহায্যকারী"তে পরিণত মদীনার মুসলিমগণ। তারা প্রথম মুসলিম সমাজ নির্মাণের প্রকল্পে সহায়তা দিয়েছে।

বাতিন: অস্তিত্ব ও ঐশীগ্রন্থের "গোপন" মাত্রা, যা ইন্দ্রীয় বা যৌক্তিক চিন্তায় উপলব্ধি করা যায় না, বরং অতীন্দ্রিয়বাদের ধ্যানী স্বজ্ঞামূলক অনুশীলনে অনুভব করা যায়।

দার আল-ইসলাম: ইসলামের ঘর। মুসলিম শাসনাধীন এলাকা।

জিক্‌র: চৈতন্যের বিকল্প অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মন্ত্রের মত ঈশ্বরের নামসমূহ উচ্চারণের মাধ্যমে ঈশ্বরের "স্মরণ"। সুফি ভক্তি।

জিম্মি: ইসলামী সাম্রাজ্যে "নিরাপত্তাপ্রাপ্ত প্রজা" ("Protected Subject") যারা কুরানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ধর্মের অনুসারী। **আহল আল-কিতাব**, ইহুদি, ক্রিশ্চান, যারোস্ট্রিয়, হিন্দু, বুদ্ধ এবং শিখরা এর অন্তর্ভুক্ত। *জিম্মিদের* পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হত এবং তারা তাদের নিজস্ব সামাজিক রীতি অনুযায়ী সমাজ গঠন করতে পারত, তবে ইসলামের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হত তাদের।

ফাকিহ: জুরিস্ট। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ।

ফাতওয়াহ: ইসলামী আইন বিষয়ে ধর্মীয় পণ্ডিতের আনুষ্ঠানিক আইনি মতবাদ বা সিদ্ধান্ত।

ফিকহ: ইসলামী জুরেসপ্রুডেন্স। পবিত্র মুসলিম আইনের পূর্ণ পাঠ ও প্রয়োগ।

ফিৎনাহ: প্ররোচনা। বিচার। নির্দিষ্টভাবে, শব্দটি *রাশিদুন* ও প্রাথমিক উমাইয়াহ আমলে মুসলিম সমাজকে বিভক্তকারী গৃহযুদ্ধ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফুতুওয়াহ: দ্বাদশ শতাব্দীর পরে গঠিত শহরে তরুণদের একটা দল, যারা শিক্ষাগ্রহণ আর আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **সুফি** আদর্শ ও আচরণ প্রবলভাবে প্রভাবিত নেতার প্রতি শপথগ্রহণ পূর্বক সমর্থন প্রদান করত।

ঘাযু: মূলত "হামলা"- প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা লুণ্ঠিত মালের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করত। পরবর্তীকালে একজন **গাযি** যোদ্ধা ইসলামের জন্যে পবিত্র যুদ্ধের দ্বারা প্রায়ই **দার আল-ইসলামের** সীমান্তে সেনাদলের উপস্থিতি বোঝাতে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

ঘুলাট (বিশেষণ, **ঘুলুউ**): চরম অনুমান। প্রাথমিক শিয়া মুসলিমদের অনুসৃত, যা মতবাদের কিছু কিছু বিষয়ে বাড়তি জোর দিয়েছে।

হাদিস: **আহাদিস** দেখুন।

হজ্জ: মক্কায় তীর্থযাত্রা।

হিজরাহ: পয়গম্বর মুহাম্মদ(স:) ও প্রথম মুসলিমদের সমাজের ৬২২-এ মক্কা হতে মদীনায় "অভিবাসন"।

ইজমাহ: আইনগত সিদ্ধান্তের বৈধতাদানকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর "ঐকমত্য"।

ইজতিহাদ: সমসাময়িক পরিস্থিতিতে **শরিয়াহ্** প্রয়োগের লক্ষ্যে কোনও জুরিস্ট কর্তৃক প্রযুক্ত "স্বাধীন যুক্তি"। চতুর্দশ শতাব্দীতে **সুন্নী মুসলিমরা** ঘোষণা দেয় যে "*ইজতিহাদের* দ্বার" রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং পণ্ডিতদের অবশ্যই যুক্তিভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টির বদলে অতীত কর্তৃপক্ষের আইনগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হবে।

ইলম: কোনটা ন্যায় এবং মুসলিমদের কেমন আচরণ করা উচিত সে জ্ঞান।

ইমাম: মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতা। **শিয়া মুসলিমরা** কন্যা ফাতিমাহ এবং তাঁর স্বামী আলী ইবন আবি তালিবের মাধ্যমে পয়গম্বরের উত্তরপুরুষ বোঝাতে এটা ব্যবহার করে, শিয়ারা তাদের মুসলিম সমাজের প্রকৃত নেতা বলে মনে করে।

ইরফান: মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদী ঐতিহ্য।

ইসলাম: ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি "আত্মসমর্পণ"।

জাহিলিয়াহ্ (বিশেষণ **জাহিলি**): অজ্ঞতার কাল। মূলত: আরবের প্রাক-ইসলামী যুগ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানে মুসলিম মৌলবাদীরা প্রায়শ এমনকি মোটামুটি মুসলিম সমাজসহ যেকোনও সমাজ বোঝাতে প্রয়োগ করে যা, তাদের দৃষ্টিতে, ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কাছে নতি স্বীকারে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

জিহাদ: সংগ্রাম, প্রয়াস। কুরানে ব্যবহৃত শব্দটির প্রাথমিক অর্থ, যা ইসলামী সমাজ বা ব্যক্তি মুসলিমের অন্তর্গত বাজে অভ্যাস সংস্কারের অভ্যন্তরীণ প্রয়াস বোঝায়। শব্দটি ধর্মের জন্যে সূচিত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জিযিয়াহ্: পোল কর, সামরিক নিরাপত্তার বিনিময়ে **জিম্মিদের** দিতে হত।

কাবাহ্: পবিত্র নগরী মক্কাস্থ চৌকো আকৃতির উপাসনাগৃহ যা মুহাম্মদ(স:) ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করেন এবং ইসলামী বিশ্বের পবিত্রতম স্থানে পরিণত করেন।

কালাম: ইসলামী অনুমানভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নমালার আলোচনা। মুসলিম স্কলাস্টিক থিওলজি বর্ণনায়ও শব্দটি প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খানকাহ্: ভবন, যেখানে **জিকর** এর মত **সুফি** কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সুফি শিক্ষক বসবাস করেন এবং অনুসারীদের নির্দেশনা দেন।

মাযহাব ("নির্বাচিত পথ"): ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্সের চারটি বৈধ মতবাদের একটি।

মাদ্রাসাহ্: মুসলিমদের উচ্চ শিক্ষার কলেজ, যেখানে **উলেমাগণ ফিকহ্** বা **কালামের** মত শাস্ত্র পাঠ করে থাকেন।

মাওয়ালি (ক্লায়েন্ট): প্রাথমিক অনারব ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে দেয়া নাম, যাদের মুসলিম হওয়ার পর যেকোনও গোত্রের নামমাত্র ক্লায়েন্টে পরিণত হতে হয়েছিল।

মুজতাহিদ: ইজতিহাদ প্রয়োগের অধিকার অর্জনকারী জুরিস্ট, বিশেষ করে শিয়া জগতে।

পির: **সুফি** শিক্ষক, যিনি অনুসারীদের অতীন্দ্রিয় পথে নির্দেশনা দিতে পারেন।

কাজি: শরিয়াহ্ প্রয়োগকারী বিচারক।

কিবলাহ্: প্রার্থনার সময় মুসলিমরা "যেদিকে" ফেরে। একেবারে গোড়ার দিকে *কিবলাহ্* ছিল জেরুজালেম, পরে মুহাম্মদ(স:) তা মক্কার দিকে পরিবর্তন করেন।

রাশিদুন: চারজন "সঠিকপথে পরিচালিত" খলিফাহ্, যারা পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) সহচর ও প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিলেন: আবু বকর, উমর ইবন আল-খাত্তাব, উসমান ইবন আফফান এবং আলী ইবন আবি তালিব।

সালাত: মুসলিমরা দিনে পাঁচবার যে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করে।

শাহাদাহ্: বিশ্বাসের মুসলিম ঘোষণা: "আমি ঘোষণা করছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর নেই এবং মুহাম্মদ(স:) তাঁর পয়গম্বর।"

শরিয়াহ্: "জলাধারে যাবার পথ।" **কুরান, সুন্নাহ এবং আহাদিস** থেকে সংগৃহীত ইসলামী পবিত্র আইন।

শিয়া মুসলিম: শিয়াহ-ই-আলী বা আলীর পক্ষাবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত, এরা বিশ্বাস করে যে **রাশিদুনদের** স্থলে পয়গম্বরের নিকটতম পুরুষ আত্মীয় আলী ইবন আবি তালিবেরই শাসন করা উচিত ছিল, বেশ কয়েকজন **ইমামকে** মানে তারা, যারা আলী এবং পয়গম্বরের কন্যা ফাতিমাহ্‌র প্রত্যক্ষ পুরুষ বংশধর। সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে এদের মতপার্থক্য সম্পূর্ণই রাজনৈতিক।

সুফি, সুফিবাদ: **সুন্নী ইসলামের** অতীন্দ্রিয়বাদী ঐতিহ্য।

সুন্নাহ্: রীতি। পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে সহচর ও পরিবার কর্তৃক নথিভুক্ত ইসলামের আদর্শ নিয়ম হিসাবে বিবেচিত পয়গম্বর মুহাম্মদের(স:) অভ্যাস ও ধর্মীয় আচরণ। এভাবে এগুলো ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাতে মুসলিমরা ঈশ্বরের প্রতি পয়গম্বরের নিখুঁত আত্মসমর্পণের (*ইসলাম*) আদর্শরূপের কাছাকাছি যেতে পারে

সুন্নী ইসলাম: চার ***রাশিদুনকে*** শ্রদ্ধাকারী ও চলতি ইসলামী ব্যবস্থাকে বৈধতা দানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়।

তরিকাহ্: কোনও একটি ভ্রাতৃসংঘ বা মতবাদ যারা **সুফি** "পথ" অনুসরণ করে এবং যাদের নিজস্ব বিশেষ **জিকর** ও শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ রয়েছেন।

তাওহীদ: একীকরণ। স্বর্গীয় একত্ব, মুসলিমরা তাদের রীতিনীতি ও অগ্রাধিকার সমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যার অনুকৃতি আনতে চায়।

উলেমা (একবচনে, ***আলিম***): শিক্ষিত জন, ইসলামের আইনগত ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের অভিভাবক।

উম্মাহ্: মুসলিম সমাজ।

উমরাহ্: **কাবাহ্‌র** চারদিকে আনুষ্ঠানিক প্রদক্ষিণ।

যাকাত: বিশুদ্ধতা। আয় ও মূলধনের উপর নির্ধারিত কর (সাধারণত ২.৫ শতাংশ) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা সকল মুসলিমকে প্রতিবছর দরিদ্রদের সহযোগিতার জন্যে অবশ্যই প্রদান করতে হয়।

(ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসৃত হয়েছে–অনুবাদক।)

তথ্যসূত্র

১. সূচনা (পৃষ্ঠা: ৩৫-৬৬)

১. জালাল আল-দিন সুয়ূতি, *আল-ইফকান ফি উলুম আল আকরাম*, মাক্সিম রডিনসনের *মোহাম্মেদ* (অনু: অ্যান কার্টার, লন্ডন, ১৯৭১), ৭৪।

২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সিরাত রাসুল আল্লাহ* (অনু ও সম্পা এ. গিয়োম, *দ্য লাইফ অভ মুহাম্মদ*, লন্ডন, ১৯৫৫), ১৫৮।

৩. কুরান, ২৫:৩, ২৯:১৭, ৪৪:৪৭, ৬৯:৪৪। কুরানের সকল উদ্ধৃতি মুহাম্মদ আসাদ (অনু) *দ্য মেসেজ অভ দ্য কুরান*, জিব্রালটার, ১৯৮০ হতে গৃহীত। (অনুবাদের সুবিধার্থে আমি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর "কোরান শরীফ: সরল বঙ্গানুবাদ" হতে উদ্ধৃতি দিয়েছি- অনুবাদক)।

৪. কুরান ৮০:১১।

৫. কুরান ২:১২৯-৩২: ৬১:৬।

৬. কুরান ২:২৫৬।

৭. কুরান ২৯:৪৬।

৮. কুরান ২৫:৪-৭।

৯. কুরান ৭৪:১-৫, ৮-১০, ৮৮:২১-২।

১০. মুহাম্মদেও (স:) উপপত্নী মারিয়াম, যিনি ক্রিশ্চান ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী নন, পয়গম্বরকে একজন পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছিলেন, ছেলেটি তাঁকে অসীম শোকে ভাসিয়ে শিশু অবস্থায় মারা যায়।

১১. কুরান ৩৩:২৮-৯।

১২. কুরান ৩৩:৩৫।

১৩. কুরান ৪:৩।

১৪. জেনেসিস ১৬: ১৮:১৮-২০।

১৫. ডি. সিডারস্কি, *লেস অরিজিনস ড্যানস লেজেন্ডেস মুসলমানস ড্যানস লে কোরান এট ড্যানস লেস ভাইস ডেস প্রোফেটেস* (প্যারিস, ১৯৩৩)।

১৬. কুরান ২: ১২৯-৩২: ৩:৫৮-৬২: ২:৩৯।

১৭. কুরান ৬:১৫৯, ১৬১-২।

১৮. কুরান ৮:১৬-১৭।

১৯. কুরান ২:১৯৪, ২৫২: ৫:৬৫: ২২:৪০-৪২।

২. বিকাশ (পৃষ্ঠা: ৬৭-১০০)

১. কুরান ৪৯:১২।
২. কুরান ৯:১০৬-৭।
৩. প্রাথমিক শিয়াহদের সম্পর্কে খুব বেশী জানা নেই। আমরা নিশ্চিত করে জানি না যে সত্যিই আলীর পুরুষ বংশধরগণ অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়া শিয়াহদের দ্বারা শ্রদ্ধেয় ছিলেন নাকি বংশধারা লুপ্ত হয়ে যাবার পর এবং যখন "দ্বাদশবাদী শিয়া" ("Twelver") মতবাদ সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে তখন ইতিহাসকে পেছনে আদি *ইমামদের* প্রতি প্রক্ষেপ করা হয়েছে।
৪. কুরান ২:২৩৪; ৮:২:২৩:৫৭-৬১।
৫. "সপ্তবাদী" ("Sevener") বা ইসমায়েলি শিয়াবাদের উদ্ভব অস্পষ্ট। ইসমায়েলি অবস্থানের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যে দ্বাদশবাদী শিয়াবাদ-এর থিওলজি গড়ে ওঠার পর ইমাম ইসমায়েলের প্রতি গোত্রীয় আনুগত্যের কাহিনী গড়ে উঠতে পারে। সাধারণত রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় সপ্তবাদীরা "যায়দীয়" হয়ে থাকতে পারে, অর্থাৎ যেসব শিয়া পঞ্চম ইমামের ভাই যায়েদ ইবন আলীর পথ অনুসরণ করত এবং বিশ্বাস করত যে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলিমদের কর্তব্য।

৩. তুঙ্গ অবস্থা (পৃষ্ঠা:১০১-১৩০)

১. কায়রোর ইসমায়েলি রাজবংশকে প্রায়শ "ফাতিমীয়" রাজবংশ বলে অভিহিত করা হয়, কারণ দ্বাদশবাদীদের মত ইসমায়েলিরা আলী ও পয়গম্বরের কন্যা ফাতিমাহ্‌র প্রত্যক্ষ বংশধর *ইমামদের* শ্রদ্ধা করত।
২. কুরান ২:১০৯। (বাংলা অনুবাদে ১১৫– অনুবাদক)।
৩. *আল-মুকাদ্দিমাহ্*, ইউসেফ এম. চৌউয়েরি, *ইসলামিক ফাউন্ডেমেন্টালিজম* (লন্ডন ১৯৯০) ১৮-এ উদ্ধৃত

৫. প্রতিরুদ্ধ ইসলাম (পৃষ্ঠা:১৫৫-১৯৬)

১. বেলায়েত-ই ফাকিহ'র তত্ত্ব আগে জুরিস্টগণ আলোচনা করেছেন, কিন্তু স্বল্প পরিচিত এবং বেশীরভাগ সময়ই বিদ্রোহী এমনকি ধর্ম বিরোধী বলেও বিবেচিত হয়েছে। খোমিনি একে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মূল বিষয়ে পরিণত করেন এবং পরে তা ইরানে তাঁর শাসনের ভিত্তিতে পরিণত হয়।
২. কুরান ২:১৭৮; ৮:৬৮; ২৪:৩৪; ৪৭:৫।
৩. কুরান ৪৮:১
৪. জয়েস এম. *ডেভিন, বিটুইন জিহাদ অ্যান্ড সালাম : প্রোফাইলস ইন ইসলাম* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৭) ২৩১